সিনেমা

ছায়ার মায়ার বিচিত্র রহস্য

শ্রীনরেন্দ্র দেব

১৩৪১
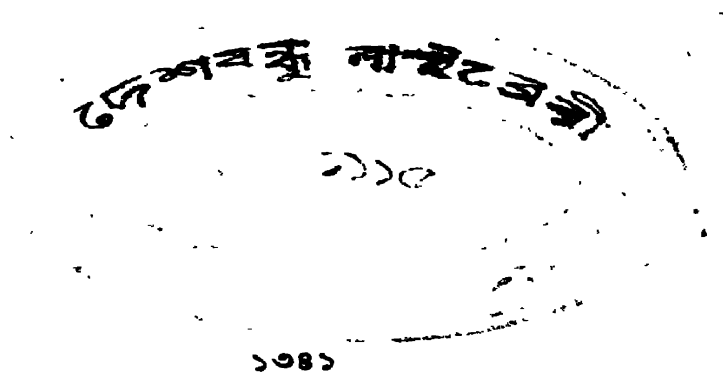
গুরুদাস-চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

তিন টাকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

নিবেদন

ভূতপূর্ব্ব 'আর্য্য ফিল্মস' ও 'সিনেমা লাইব্রেরী' প্রতিষ্ঠাতা, প্রমোদ-জগতে সর্ব্ব পরিচিত, অদম্যকর্ম্মী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হরেন ঘোষের উৎসাহে ও আগ্রহে বাঙ্‌লা ভাষায় 'সিনেমা' সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রণয়নে প্রবৃত্ত হই। শ্রীযুক্ত হরেণ ঘোষ সিনেমা সংক্রান্ত বহু মূল্যবান গ্রন্থ সংগ্রহ ক'রে দিয়ে প্রভূত সাহায্য ক'রেছেন। প্রসিদ্ধ প্রেমিক কবি ও 'ছৈবিক' বন্ধু শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসুও অসংখ্য পুস্তক এবং পরামর্শ দানে উপকৃত করেছেন। এ গ্রন্থখানি তাই তাঁকেই উৎসর্গ ক'রে দিলুম। পীঠ ও পটের সুসমালোচক 'চন্দ্রশেখর' ইতি খ্যাত বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মন্মথেন্দ্র নাথ ভঞ্জ, সাহিত্যিক বন্ধু শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র ঘোষাল, ও নিউ থিয়েটার্স সম্প্রদায়ের ছায়া-চিত্র বিশারদ সুবন্ধু শ্রীযুক্ত সুবোধগাঙ্গুলী এরাও সকলে একাধিক পুস্তক ও পরামর্শ দানে আমাকে সাহায্য করেছেন। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায় সুহৃদ্ ভ্রাতৃদ্বয় এই গ্রন্থের ছবির ছাঁচ (Block) গুলি দিয়ে অশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ ক'রেছেন। সিনেমা সংক্রান্ত যাবতীয় বিশেষার্থ বাচক শব্দের বাঙ্‌লা পরিভাষা প্রণয়নে প্রসিদ্ধ চিত্র-পরিচালক, শিল্পীবন্ধু শ্রীযুক্ত চারুরায় ও শ্রদ্ধেয় মনীষী শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয় বহুবিধ উপদেশ ও সাহায্য দানে উপকৃত করেছেন। এঁদের সকলের ঋণ অপরিশোধনীয়।

৫ হিন্দুস্থান পার্ক
বালিগঞ্জ

শ্রীনরেন্দ্র দেব

এই গ্রন্থ রচনায় নিম্নোক্ত পুস্তকাবলী ও পত্র-পত্রিকার সাহায্য গৃহীত হ'য়েছে

The Film Till Now. by Paul Rotha

Cinematographic Annul. 1931-32

Behind the Motion Picture Screen. by Austin C. Lescarboura

Anatomy of Motion Picture Art. by Erilc Elliot.

Film Technqiue, by Pudovkin. Translated by Ivor Montagu.

The Art of Moving Picture, by Vachell Lindsay

Behind the Screen, by Samuel Goldwyn.

Writing for the Screen, by Arrar Jacksons

Practical Hints on Acting for the Cinema, by Agnes Platt.

Photo Play Ideas, Published by Universal Scenario Co, Hollywood.

The Art of Make-up, Published by George W. Luft Co. N. York.

The Truth About Voice, by Prof. E. Feuchtinger.

Times: Spceial Film Supplement.

Picture Show

Motion Piclure

Sereenland

Photo Play

Picture goer

Silver Sereen

Picture Play

The Cinema

Film Weekly

বিষয়-বিবৃতি

ভূমিকা—

গোড়ার কথা ৬

ফিল্‌ম্ ব্যবসায়ে আমেরিকা ও য়ুরোপ

চলচ্চিত্রের বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক দিক ২২

চলচ্চিত্রে শিল্পকলার দিক ২৯

চলচ্চিত্রে দৃশ্যরচন রীতি ৩৭

চলচ্চিত্রের প্রসিদ্ধ অভিনেতৃগণ

বাম হইতে ডাইনে—পিছন সারিতে,—ডোরোথী গিশ, সীনা ওয়েন, ও নরমা টালমাজ। মধ্যের সারিতে—ববি হ্যারণ, হ্যারি এট্‌কিন্, সার হার্ব্বার্ট ট্রী, ওয়েনম্যুব এবং উইল্‌ফ্রেড লুকাস। উপবিষ্ট সারিতে,—ডগলাস্ ফেয়ারব্যাঙ্কস্, বেসী লভ, কনষ্টান্স টাল্‌মাজ, কনষ্টান্স কোলিয়ার, লিলিয়ান গীশ, ফে টিন্‌চার এবং ডি. উল্‌ফ্ হাপ্পে। ১

মেরীপিকফোড, ডগলাস্ ফেয়ারব্যাঙ্কস্, চার্লিচ্যাপলিন এবং হেনরী ওয়ালথল

'সালোমে'র ভূমিকায় নাজিমোভা—ছায়ালোকের প্রথম

ভূমিকা

ছায়ার মায়া মানুষকে তার সৃষ্টির দিন থেকেই আকর্ষণ ক'রছে! নিজের বা অন্যের ছায়া প্রথম যেদিন তার চোখে পড়ে, এবং তার রহস্য সে জানতে পারে,—সেদিন যে রকম আনন্দ ও বিস্ময়ে সে অভিভূত হ'য়ে পড়েছিল, আজও ছায়ার মায়া তাকে তেমনিই মুগ্ধ ও পুলকিত করে তোলে!

প্রদীপের আলোয় গৃহপ্রাচীরে প্রতিফলিত ছায়া নিয়ে প্রথম মানব-শিশু যে খেলা সুরু ক'রেছিল, আজকের এই বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত ও সভ্য যুগে নির্ব্বাক্ ও সবাক্ চলচ্চিত্র যে তারই সুপরিণত সংস্করণ এ কথা বলাই বাহুল্য। এই চলচ্চিত্রের ক্রমোন্নতির ইতিহাস ঠিক আরব্যোপন্যাসের মতই চিত্তাকর্ষক। যে রকম দ্রুতগতিতে এই সজীব ছবির শিল্প আজ এগিয়ে চলেছে তা যথার্থ-ই বিস্ময়কর! প্রকৃতপক্ষে ধ'রতে গেলে সবে এই আঠারো বৎসর মাত্র চলচ্চিত্র পৃথিবীতে একটা প্রধান প্রমোদ ব'লে গণ্য হ'য়েছে! তার আগে রাস্তার ধারে মাঠের উপর ছেঁড়া ময়লা তাঁবুর মধ্যে বা এঁদোপড়া গলির ভিতর ভাঙা পোড়ো বাড়ীর উঠানে জলে-ভেজা পর্দ্দার উপরে যে সব সজীব ছবি দেখানো হ'তো, কয়লার গ্যাসের আলোতে তার সঘন স্পন্দন বা অশ্রান্ত কাঁপুনি চোখকে পীড়া দিত!

আজ সব ইন্দ্রভবন তুল্য মনোরম প্রাসাদে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা ও আরামের মধ্যে যে সমস্ত সুন্দর ও সুসম্পূর্ণ ছবি প্রতিদিন একাধিকবার অসংখ্য দর্শককে দেখানো হচ্ছে, বিশবছর আগে অনেকে তা' কল্পনাতেও আনতে পারেনি।

চলচ্চিত্রের প্রথম যুগে যখন রেলগাড়ী চলা, ঘোড়দৌড় এবং জাহাজ চলা দেখানোই খুব একটা বাহাদুরী বলে গণ্য হ'তো, সেদিন কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি যে এই ছবিই অবিলম্বে নাট্যশালার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে উঠবে। ১৮৯৬ সালে প্রসিদ্ধ ওলিম্পিয়া রঙ্গমঞ্চের প্রমোদ-সচিব সার্ অগাষ্টাস্ হ্যারিস্ সর্ব্বপ্রথম তাঁর নাট্যশালায় রবার্ট পলের উদ্ভাবিত "থিয়েটার গ্রাফ্" যন্ত্রের সাহায্যে চলচ্চিত্র দেখাবার ব্যবস্থা ক'রেছিলেন। কিন্তু পল্‌কে তিনি বলেছিলেন যে "এ তোমার বড় জোর এক মাস চ'লতে পারে, তাও কেবলমাত্র একটা সম্পূর্ণ নূতন ব্যাপার ব'লে। এই নূতনের মোহটুকু কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকেও পাত্‌তাড়ি গুটোতে হবে।" পল্ নিজেও এর উপর খুব বেশী আস্থাবান ছিলেন না। তিনি হ্যারিসের কাছে স্বীকার ক'রেছিলেন যে, তাঁর 'থিয়েটারগ্রাফ্' যে কোনোও দিন প্রমোদশালার অঙ্গ হ'য়ে উঠবে, এ দুরাশা তিনিও কখনো করেন না।

অথচ, এমনিই মজা যে, কিছু দিন পরে লণ্ডনের এই "ওলিম্পিয়া" রঙ্গমঞ্চই বিলাতের সর্ব্বপ্রথম ছবিঘর হ'য়ে উঠেছিল, যেখানে নাট্যাভিনয়ের পরিবর্ত্তে দর্শকদের কেবলমাত্র চলচ্চিত্র দেখিয়েই খুশী করা হ'তো! হিসাব মতো ধরতে গেলে, চলচ্চিত্রের ইতিহাসে প্রথম ছবির ভাষায় গল্পকে জীবন্ত ক'রে তোলেন ওই রবার্ট পল। তাঁর "The Soldier's Courtship" বা "সৈনিকের পূর্ব্বরাগ" ছবিখানিই প্রথম চিত্রনাট্য। আল্‌হাম্‌ব্রা থিয়েটারের ছাদের উপর পলই সর্ব্বপ্রথম এই ছবিখানির প্রযোজন করেন এবং আল্‌হাম্‌ব্রা থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চেই সে ছবিখানি সর্ব্বপ্রথম দেখানো হ'য়েছিল। আজ এ কথা শুনে হয়ত' অনেকের কাছেই আশ্চর্য্য বলে মনে হবে যে, এই রবার্ট পলের ছবিই সেদিন আমেরিকার ছবিঘরেরও একমাত্র সম্বল ছিল। পৃথিবীর সকল দেশের ছবির বাজার আজ যেমন মার্কিনেরা দখল ক'রে ব'সেছে, সেদিন রবার্ট পলই ছিল এই চিত্র-রাজ্যের এক মাত্র অধীশ্বর! কিন্তু ১৯১৪ সালে য়ুরোপে যখন কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধ সুরু হ'লো, তখন য়ুরোপ ছবিঘর ছেড়ে রণস্থলে এসে দাঁড়ালো এবং সেই অবকাশে আমেরিকা ধীরে ধীরে ছবির রাজ্যে তার একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার ক'রে ফেললে।

তখনকার দিনে যাঁরা রঙ্গালয়ের প্রধান অভিনেতা ও অভিনেত্রী ছিলেন, তাঁরা ক্যামেরার সামনে অভিনয় ক'রতে, ঘৃণাবোধ ক'রতেন। পটে নামাটা তাঁদের কাছে ছিল অত্যন্ত অবজ্ঞেয় ব্যাপার। অভাবের তাড়নায় বা অতিরিক্ত অর্থলোভে যাঁরা ছবির কাজে যোগ দিতেন তাঁরা ছবিতে নামার লজ্জাটুকু এড়াবার জন্য নিজেদের আসল নাম গোপন ক'রে বেনামীতে অবতীর্ণ হ'তেন। ছবিওয়ালারাও সেজন্য কিছুমাত্র আপত্তি ক'রতো না, কারণ "ষ্টার" বলে ছবির আকাশে ত[illegible] দেখা দেয়নি বলে, ছবির অভিনেতা অভিনেত্রীর নামের কোনো মূল্যই ছিল না সেকালে!

তাই, যে অভিনেতা একখানি ছবিতে নায়কের ভূমিকায় নেমেছিলেন, অন্য ছবিতে তিনিই হয়ত আবার সামান্য একটি ভৃত্য সেজেও নামতেন! একজন লোকই অনেক সময় একাধিক ভূমিকাও গ্রহণ করতেন এই ছবির কাজে। সে যুগে শ্রীমতী মেরী পিক্‌ফোর্ড এবং নর্মা [illegible]লমাজ তাঁদের তরুণ বয়সে একই ছবিতে বালিকা ও বৃদ্ধা উভয় ভূমিকাতেই প্রয়োজনমত অভিনয় ক'রেছেন। সেই সময় অর্থের প্রলোভনে যাঁরা ছবিতে অভিনেতা অভিনেত্রীর কাজ নিয়েছিলেন, তাঁরা নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই এ কাজ ক'রতেন। চলচ্চিত্রে নামার ফলে যে তাঁদের ভবিষ্যৎ কতখানি উজ্জ্বল হ'য়ে উঠতে পারে, তার কোনো ধারণাই তাঁদের ছিল না সেদিন। এমন কি শ্রীযুক্ত ডেভিড্ ওয়ার্ক গ্রিফিথ্, যিনি আজ চিত্রজগতের প্রথম প্রতিভাবান প্রয়োগ-শিল্পী বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, তিনিও সেদিন এই চলচ্চিত্রের সম্বন্ধে খুব বেশী আস্থাবান ছিলেন না। রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে তিনি যেদিন চিত্রলোকে এলেন সেদিনও এর উপর তাঁর কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না; অথচ, চলচ্চিত্রের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি যদি কারুর দ্বারা হয়ে থাকে, সজীব ছবির মর্য্যাদা ও আদর যদি কেউ বাড়িয়ে থাকে, তবে সে এই চিত্র-জগতের প্রথম প্রতিভাবান প্রয়োগ-শিল্পী ডি, ডব্লিউ, গ্রিফিথ্! কোনো এক সময়ে গ্রিফিথের পত্নী ও তিনি দু'জনে ব'সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা

ধ'রে ভেবেচেন, আর অনেক তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনা করেছেন এই নিয়ে যে,—গ্রিফিথ্ ছবির কাজ ছেড়ে দিয়ে সপ্তাহে চল্লিশ ডলার বা ১২০৲ টাকা বেতনে একটি নাট্য সম্প্রদায়ে চাক্‌রি নেবেন কি না? সে সময় সপত্নী গ্রিফিথ্ ছবির কাজে সপ্তাহে পাঁচ ডলার বা পনেরো টাকা মাত্র উপার্জ্জন ক'রতেন, তাও, ক্যামেরার সামনে যে দিন নামতেন কেবল সেইদিনই বেতন পেতেন। কাজ না থাকলে কিছুই পেতেন না। গ্রিফিথ্ ছবির জন্য রাত্রে বসে গল্প লিখতেন। এই অতিরিক্ত কাজের জন্য তিনি যা পেতেন, তার সঙ্গে তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর দৈনিক উপার্জ্জন পাঁচ ডলার যোগ দিলেও সপ্তাহে চল্লিশ ডলার আয় হ'ত না।

গ্রিফিথ্ সেদিন তাঁর স্ত্রীকে সংশয়-আকুলকণ্ঠে বলেছিলেন—"ওগো দেখো, এই ছবির ব্যাপারটা যদি টিঁকে যায়, আর এটা যদি সত্যিই শেষ পর্য্যন্ত একটা কিছু হয়ে দাঁড়ায়—এমনতর ভরসা আমাদের কেউ যদি দিতে পারে,—তাহ'লে আমরা আরও কিছুদিন এটা নিয়ে পড়ে থাকতে রাজি আছি।"

অত বড় যে প্রয়োগ-শিল্পী গ্রিফিথ্, চলচ্চিত্র সম্বন্ধে তাঁর ধারণাও এই রকম ছিল একদিন। শ্রীমতী গ্রিফিথ্ তাঁদের অল্প আয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন ব'লে এবং তাঁর স্বামী একদিন প্রয়োগকর্ত্তার আসন অধিকার করবেনই, এই রকম একটা দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর মনে ছিল ব'লেই গ্রিফিথকে তিনি ছবি ছেড়ে রঙ্গমঞ্চে ফিরে যেতে দেন নি। শ্রীমতী গ্রিফিথ্ এজন্য পৃথিবীর সমস্ত চিত্র-প্রিয়দের সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদের পাত্রী। তিনি যদি গ্রিফিথ্‌কে চিত্রলোকে না ধ'রে রাখতেন, তাহ'লে চলচ্ছবির ইতিহাস আজ হয়ত' অন্য রকম হ'তো।

ইতিহাসের এই ব্যাপারটা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করবার মতো যে, যাঁরাই এর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একান্ত সন্দিহান ছিলেন, তাঁরাই এর বিরাট ভবিষ্যৎ গড়ে তুলেছেন। মেরী পিক্‌ফোর্ড, যিনি আজ বিশ্বের প্রেয়সী (World's sweet-heart) ব'লে পরিগণিতা, গ্রিফিথ্ই তাঁকে প্রথমে ছবিতে নিয়েছিলেন,—সপ্তাহে মাত্র ২৫ ডলার বেতনে! মেরী তাইতেই সন্তুষ্ট ছিল এবং কখনো ভাবেনি যে, তার ভবিষ্যৎ এর চেয়েও বেশী কিছু ভাল হ'তে পারে।

গ্রিফিথ প্রথম যখন 'দু' রীল' ছবি তুলবেন ঠিক করেছিলেন, তখন সবাই তাঁকে ব'লেছিল …পাগল! কারণ সে সময় এক রীল ফিল্ম্ অর্থাৎ হাজার ফুটের বেশী ছবি কোনো ছবিঘরের কর্ত্তারা নিতো না। তাই গ্রিফিথ্ দু' হাজার ফুটের একখানা ছবি ক'রছে শুনে সবাই ভেবেছিল গ্রিফিথের মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে! কিন্তু গ্রিফিথ্ কারুর কথা না শুনে হাজার হাজার ক'রে দু' রীলে টেনিসনের অমর প্রেমগাথা "এনক্ আর্ডেন" ছবিতে রূপান্তরিত ক'রলেন! ছবিঘরের মালিকরা এই দু'রীল ছবি নিতে চাইলে না। শেষে তাদের সঙ্গে গ্রিফিথের এই সর্ত্তে রফা হ'লো যে,—এক সপ্তাহকে দু' ভাগ ক'রে নিয়ে প্রথম তিন দিন এক রীল দেখানো হবে, তার পরের তিন দিন আর এক রীল দেখানো হবে। কিন্তু, প্রথম রীল দেখেই দর্শকেরা সেইদিনই দ্বিতীয় রীল দেখবার জন্য এমন আগ্রহে উন্মত্ত হ'য়ে চীৎকার সুরু

করলে যে, কর্তৃপক্ষ বাধ্য হ'য়ে এক দিনেই একসঙ্গে দু'রীল ছবি দেখাতে বাধ্য হলেন। এই ঘটনা গ্রিফিথ্‌কে আরও বড় ছবি তুলতে সাহস দিলে। হাজার ফুটের মধ্যে গল্প শেষ ক'রতে হচ্ছিল ব'লে তাঁর হাত-পা যেন বাঁধা ছিল, প্রাণখুলে তিনি একখানা ভালো ছবিতে হাত দিতে সাহস করতেন না। এবার তাঁর ভয় ভেঙ্গে গেলো। তিনি আস্তে আস্তে ছবির রীল বাড়াতে স্থরু করে দিলেন।

আজকের দিনে যে কোনো চলচ্চিত্রের ষ্টুডিওতেই একখানি বড় ছবির ছ'সাত হাজার ফুট অর্থাৎ ছ' সাত রীল স্রেফ্‌ কেটেকুটে বাদই দেওয়া হ'চ্ছে! এবং বড় বড় নাটক বা উপন্যাস দেখানো হ'চ্ছে বারো-চৌদ্দ রীল পর্য্যন্ত! কিন্তু, সেদিন এ সম্ভাবনা কেউ কল্পনাও ক'রতে পারে নি! ছবিতে যারা নায়ক নায়িকা সাজে, তাদের যে দর্শকেরা ভালোবাসে এবং তাদের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে চায়, তাদের নামধামের সঙ্গে তারা যে পরিচিত হ'তে ইচ্ছা ক'রে, এ ধারণাও সেদিন কারুর মাথায় আসেনি। নায়ক নায়িকার ছবির যে একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে, এ কথাটাও কারুর একবার মনেও হয়নি। Florence Turnerএর মত সুদক্ষা অভিনেত্রীও সে যুগে সাধারণের কাছে পরিচিত হ'য়ে ছিলেন শুধু একজন অনামিকা চিত্র-নটী রূপে! কিন্তু,—এ ক্ষেত্রেও শেষে দর্শকেরা ছবিওয়ালাদের বাধ্য করেছিলেন তাদের নায়ক নায়িকাদের পরিচয় প্রকাশ করতে। চলচ্চিত্রের ব্যবসায়ে যে সব মহাজনের টাকা খাটছিল, তারা যেই বুঝতে পারলে যে, দর্শকদের প্রিয় অভিনেতা অভিনেত্রীদের পরিচয় চিত্র-সম্পর্কে গোপন না রেখে যদি প্রকাশ ক'রে লিখে, ছবিখানি প্রচারের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, তাহ'লে দর্শকের ভীড় বেশী হ'তে পারে এবং অর্থাগমের সম্ভাবনাও প্রচুর,—তখন থেকে তারা নায়ক নায়িকা এবং অন্যান্য প্রধান ভূমিকার অভিনেতৃবর্গের নাম প্রচার করতে স্থরু ক'রে দিল। এই থেকেই ক্রমে "ষ্টার" সৃষ্ট হ'য়েছে! শ্রীমতী গ্রিফিথ্‌ তাঁর "When the Movies were young" গ্রন্থে লিখেছেন যে, একদিন সকালে তিনি দেখলেন যে তাঁর স্বামী যেন অত্যন্ত চিন্তাকাতর হ'য়ে পড়েছেন। স্বামীকে তাঁর এই একান্ত কাতর হ'য়ে পড়ার কারণ কি জিজ্ঞাসা করায় গ্রিফিথ্‌ বললে—"শুনবে? মেরী পিক্‌ফোর্ডের নামে আজ সকালে পঁচিশজন ভক্তের পঁচিশখানা চিঠি এসেছে!" তিনি স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন "মেরীকে এ কথা বলেছো কি?" গ্রিফিথ্‌ গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন—"না, আমি ইচ্ছা করি না যে মাইনে বাড়িয়ে দেবার জন্য সে এসে আমাকে বিরক্ত করুক্‌।"

কিন্তু, আজকের দিনে চিত্রলোকের কোনো প্রধান নট নটী যদি প্রতিদিন মাত্র পঁচিশখানি পত্র পায়, তাহ'লে প্রমাণ হ'য়ে যায় যে, জনসাধারণের কাছে আর তিনি প্রিয় নন! দর্শকের মনের উপর আর তিনি প্রভাব বিস্তার করতে পারেন না! কারণ, আজকাল চিত্রলোকের নামজাদা প্রত্যেক নট নটীর প্রতিদিন গাড়ী করে বস্তা-বোঝাই চিঠি আসে!

রঙ্গজগতে একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হয়ত কুড়ি তিরিশ চল্লিশ বচ্ছর, এমন কি আজীবনই তাঁর সিংহাসন অধিকার ক'রে থাকতে পারেন, কিন্তু চিত্রজগতের গতি অতি বিচিত্র! এখানে যিনি যত বড় শিল্পী ও যত বড় রূপদক্ষ অভিনেতাই হোন না কেন—বড় জোর সাত আট বছরের বেশী তিনি আর সাধারণের কাছে আমোল পান না। অবশ্য দু' একজন চিত্র-

নট বা নটী এমন আছেন যাঁরা সাত আট বছর কেন, দশ বিশ বছর ধ'রে দর্শকদের মনোরঞ্জন ক'রেছেন ; কিন্তু তাঁদের সংখ্যা খুবই কম !

সজীব চিত্রের সজীবতা ও নবীনতা চির অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য শুধু যে নিত্য নূতন ছবি ও নব নব নট নটীরই অভ্যুদয় হ'চ্ছে এই ছায়ালোকে তাই নয়, নানাদিক দিয়ে এর বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক উন্নতিও দ্রুত সাধিত হ'চ্ছে ! ছবির রীল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এর রং রূপ সাজ সরঞ্জাম দৃশ্য ঘটনা আবহ গল্প এবং গল্প বলার ধরণও ক্রমাগত বদ্‌লে যাচ্ছে ! ছবিতে এখন বর্ণবিন্যাস হয়েছে, রূপ আজ আকার ধারণ করতে যাচ্ছে এবং কথা কইতে সুরু ক'রেছে ।

গোড়ার কথা

চলচ্চিত্রের উদ্ভাবনা তার উন্নতি পরিণতি ও ব্যাপ্তি সম্বন্ধে আলোচনা কর'তে গেলে তিনটি দিক থেকে এর বিচার করা দরকার। প্রথম ব্যবসায়ের দিক, দ্বিতীয়—বৈজ্ঞানিক দিক, তৃতীয়—সৌন্দর্য্যের দিক।

প্রথম ব্যবসায়ের দিক বললুম এই জন্য যে, এই ব্যবসা লাভজনক হতে পারে বোঝা গেছলো বলেই এর আজ এতখানি উন্নতি সম্ভব হয়েছে। যদিও চলচ্চিত্রের জন্ম ও শৈশব-কালের ইতিহাস কেবল ব্যর্থতা ও বিফলতার করুণকাহিনী, তবু, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যবসায়ীদের চক্ষে এর উজ্জ্বলভবিষ্যৎ স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিল।

প্রকৃতপক্ষে ধরতে গেলে এডিসনই ১৮৮৭ সালে সর্ব্ব-প্রথম চলচ্চিত্রের চাকা ঘুরিয়ে দেখিয়েছিলেন যে এর দ্বারা কিছু কাজ হলেও হ'তে পারে। 'ফনোগ্রাফ্' যন্ত্রটি সুসম্পূর্ণ ক'রে তোলবার পরই তাঁর খেয়াল হ'য়েছিল যে শব্দকে শুধু শ্রবণেন্দ্রিয়ের সীমার মধ্যে আবদ্ধ না রেখে তাকে সঙ্গে সঙ্গে দর্শনেন্দ্রিয়েরও গোচর করা যেতে পারে এমন কোনো যন্ত্র উদ্ভাবন করা যায় কিনা! অথচ, আজ এমনি রহস্য যে, সেই শব্দকে সচিত্র করে তোলবার উদ্দেশ্যে এডিসনের উদ্ভাবিত চলচ্চিত্রেরই চরম লক্ষ্য হয়েছে—ঠিক তার বিপরীত! অর্থাৎ—নীরব চলচ্ছবিকে কোনোরকমে সরব ক'রে তোলবার চেষ্টা।

এডিসনের প্রথম প্রচেষ্টা হয়েছিল একটি চোঙা বা (Cylinder) বেলনের গায়ে অনুবীক্ষণে লক্ষ্যগোচর হয় এমন সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছবির পাক জড়ানো চিত্রাধার প্রস্তুত করা। ঠিক যেমন ভাবে গোড়ায় ফনোগ্রাফের রেকর্ড তৈরী হ'ত সেই রকম। কিছুদিন পরে 'কলোডিয়ন' থেকে ফিতের মত ফিল্ম্ তৈরী হ'লো এবং 'সেলুলয়েড্' থেকেও ফিল্ম্ তৈরীর চেষ্টা চ'লতে লাগলো। শেষে, ১৮৮৯ সালে নাইট্রেট্ সেলুলোজ অবলম্বনে ইষ্ট্‌ম্যান যে কোডাক্ ফিল্ম্ তৈরী করলেন এডিসন তারই সাহায্যে প্রথম চলচ্চিত্র দেখালেন। তার নাম হয়েছিল তখন 'কাইনেটোস্কোপ্'! এই কাইনেটোস্কোপকেই বর্ত্তমানের সমুন্নত সিনেমা যন্ত্রের জন্মদাতা বলা চলে!

এডিসনের পরীক্ষাগারে কাইনেটোস্কোপের উন্নতির চেষ্টা চলছিল, ক্রমে কাইনেটোস্-কোপের ছিদ্রপথে উঁকি মেরে একজন লোকের পক্ষে একসঙ্গে পঞ্চাশফুট পর্য্যন্ত ছবি দেখা সম্ভব হ'য়ে উঠলো। সে ছবি চলচ্চিত্র বটে, কিন্তু বড্ড বেশী কাঁপ্‌ত: মাঝে মাঝে থেমেও

'সালোমে'র ভূমিকায় থেডাবারা—প্রথম যুগে ৮

মে ম্যারে—চলচ্চিত্রাকাশের প্রথম "ষ্টার" ৫

নর্মা টালমাজ্ ও গিলবার্ট রোলাণ্ড্ — "দি ইনংগার" নাট্যচিত্রে ৬

বিখ্যাত প্রযোজক ডি, ডাব্লিউ গ্রিফিথ্ একটি সামরিক দৃশ্যের ছবি তুলছেন
একজন সেনানায়ক তাঁর সঙ্গে থেকে তাঁকে সাহায্য করছেন। ৭

ডি, ডব্লিউ, গ্রিফিথ্, চার্লি চ্যাপ্লিন্, মেরী পিকফোর্ড্ এবং
ডগ্লাস্ ফেয়ারব্যাঙ্ক্স্। ৮

যেতো। শোনা যায় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে প্রথম ছবি হ'চ্ছে—একজন লোক খুব হাঁচ্‌ছে : সে লোকটির নাম ফ্রেড্‌ অট্‌। তিনি এডিসনের বিজ্ঞানশালার একজন কর্ম্মী। প্রথম চলচ্চিত্র অভিনেতা হিসাবে ফ্রেড্‌ অটের নাম চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাকবে।

১৮৯৪ খৃঃ অব্দে এডিসনের উদ্ভাবিত কাইনেটোস্‌কোপ্‌ নিউ ইয়র্কের বাজারে পণ্য সামগ্রীর মত বিক্রয় হ'তে স্বরু হ'য়েছিল। বহু শত কাইনেটোস্‌কোপ্‌ সৌখীন লোকেরা কিনেছিল। এডিসনের ঐ যন্ত্রে তখন শুধু 'বক্সীং ম্যাচ', নাচের ছবি এবং রংতামাসার চিত্র প্রভৃতি দেখানো হ'ত। কারণ, জীবন্ত বা সজীব ছবি দেখাবার পক্ষে এই সব বিষয় গুলিই ছিল তখন সবিশেষ প্রশস্ত! কিন্তু মুস্কিল বাধলো ঐ এক একবারে শুধু এক এক জন মাত্র লোক ছিদ্র-পথে চোখ দিয়ে সজীব ছবি দেখবার সুযোগ পাচ্ছে ব'লে! কাজেকাজেই চেষ্টা চলতে লাগলো কেমন করে এই চলচ্চিত্র ম্যাজিকলণ্ঠনের ছবির মতো পর্দ্দার উপর ফেলে একই সময়ে একসঙ্গে বহুলোকের দৃষ্টিগোচর করা যায়! এডিসন কিন্তু এ প্রস্তাবটাকে মোটেই আমোল দিলেন না, কারণ, তাঁর মনে হ'লো এরকম করলে কাইনেটোস্‌কোপ্‌ আর বেশী বিক্রয় হবেনা। এই ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়ে তিনি আমেরিকার বাইরে তাঁর যন্ত্রের 'পেটেণ্ট্‌' পর্য্যন্ত নেননি! ওদিকে য়ুরোপে এই নিয়ে একাধিক লোক পরীক্ষা ক'রছিল যে কেমন ক'রে ম্যাজিকলণ্ঠনের মত এই চলচ্ছবিও পর্দ্দায় ফেলে একসঙ্গে অনেক লোককে দেখানো যায়! বর্ষকাল পরে—অর্থাৎ ১৮৯৫ খৃঃ অব্দে উড্‌ভিল ল্যাথাম নামে একজন লোক সর্ব্বপ্রথমে নিউ ইয়র্কের জনসাধারণকে ম্যাজিকলণ্ঠনের মতো এই চলচ্ছবি পর্দ্দার উপর ফেলে দেখিয়ে বিস্মিত ক'রে দিয়েছিলেন। কিন্তু, তাঁর সে ব্যবস্থার মধ্যে এত বেশী গলদ ছিল যে সেটা সাফল্য অর্জ্জন ক'রতে পারেনি।

এই সময়ে লণ্ডনে রবার্ট পল এবং প্যারিসে ল্যুমীয়েন্ ব্রাদার্স এডিসনের কাইনেটোস-কোপকে বায়োস্কোপে পরিণত করে তোলেবার চেষ্টা করছিল। পরের বছরেই ওলিম্পিয়া এবং এ্যলহামব্রা থিয়েটারে পল তাঁর চলচ্চিত্র দেখাতে পেরেছিলেন। আজকাল যে যন্ত্রের সাহায্যে চলচ্ছবি পর্দ্দার উপর গিয়ে পড়ছে, তার জনক হ'চ্ছে টমাস আরমাট্‌। ১৮৯৫ খৃঃ অব্দে সেপ্টেম্বর মাসে জর্জ্জিয়ার আটালাণ্টা শহরে যে প্রদর্শনী হয়েছিল সেইখানে প্রথম টমাস্‌ আরমাটের 'ভাইটাস্‌কোপ্‌' যন্ত্র জনসাধারণকে দেখানো হয়। তারপর নিউইয়র্কের বিখ্যাত রঙ্গমঞ্চ ব্রড্‌ওয়েতে দেখান হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সাফল্য গৌরব অর্জ্জন করে। অনতিবিলম্বে আরও একাধিক চলচ্চিত্র প্রদর্শক যন্ত্র আমেরিকার বাজারে দেখা দেয় এবং তার পেটেণ্ট-রাইট্‌ বা উদ্ভাবন-স্বত্ব নিয়ে অনেকগুলি মামলা মকর্দ্দমাও রুজু হয়। এইসব মামলার নিষ্পত্তি হ'তে বহুবৎসর লেগেছিল, কাজেই চলচ্চিত্রের উন্নতিও দীর্ঘকালের জন্য বাধাগ্রস্ত হ'য়েছিল। য়ুরোপেও চলচ্চিত্রের উন্নতি ও বিস্তার বিষম বাধা পেয়েছিল, কারণ, ১৮৯৭ খৃঃঅব্দে প্যারিসের একটা মেলায় আগুন লেগে প্রায় ১৮০ জন সম্ভ্রান্ত লোক মারা গেছলো। আর, সে আগুন লাগার কারণ চলচ্চিত্র যন্ত্রেরই দোষ! উত্তর-য়ুরোপ এই ভীষণ দুর্ঘটনার পর থেকে সুদীর্ঘকাল আর এই বিপদসঙ্কুল সীনেমা যন্ত্রের কাছেও ঘেঁসেনি।

এডিসনের আমলের সেই পঞ্চাশ ফুট ফিল্‌ম ক্রমে বাড়াতে বাড়াতে ১৮৯৭ সালে

এগারোহাজার ফুটে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। প্রথম দীর্ঘ ছবি ব'লতে আমেরিকার শ্রীযুক্ত এনক্ রেকটারের প্রদর্শিত করবেট্-বনাম-ফিট্‌জিমন্‌সের মুষ্টিযুদ্ধের ছবিখানিই উল্লেখ করতে হবে। এই সময়ই ওবেরামার্গোর প্রসিদ্ধ "প্যাশন প্লে" চলচ্চিত্রে তোলা হ'য়েছিল। রিচার্ড হলাম্যান এই ছবিখানি গ্র্যাণ্ড সেণ্ট্রাল প্যালেসের ছাদের উপর তুলেছিলেন, কিন্তু ছবির বিজ্ঞাপনে লেখা হ'য়েছিল এখানি ওবেরামার্গোর আসল যে "প্যাশন প্লে" তারই খাঁটি ছবি! এ ছবিখানি দৈর্ঘ্যে তিন হাজার ফুটের বেশী হয়নি বটে, কিন্তু ধরতে গেলে এইখানিই প্রথম চলচ্চিত্র যা একটি গল্পকে ছবিতে রূপান্তরিত করে দেখিয়েছিল। তবে একথাও ঠিক যে এ ছবি শুধুই গল্পের চিত্র সংস্করণ মাত্র—গল্প নয় মোটে! এবং এ ছবির টাইটেল্, সাব্‌টাইলে্‌' প্রভৃতিও ছিল না।

এই সময় আলোক-চিত্রের কিছু উন্নতি হ'তে দেখা গিয়েছিল। 'ফেড ইন' বা ক্রমশঃ মিলিয়ে যাওয়া ছবি প্রভৃতি আলোকচিত্র-কৌশল যা আধুনিক ছবিতে খুব বেশীরকম দেখতে পাওয়া যায় তা প্রথম আমদানী করেন প্যারিসের ফরাসী আলোক চিত্রকর জর্জ্জ মেলিজ। তারপর, চলচ্চিত্রে, 'ম্যাজিক্' 'ভোজবাজী' প্রভৃতি অদ্ভুত ও বিস্ময়কর ব্যাপারও দেখানো সম্ভব হ'য়ে উঠেছিল। চলচ্চিত্রের জন্য বিশেষ ভাবে ষ্টুডিও নির্ম্মাণ ১৮৯৬ খৃঃঅব্দে মেলিজই প্রথম করেছিলেন। তার ষ্টুডিওতে তোলা অন্যান্য ছবির মধ্যে জুলস্ ভার্নের "চাঁদে বেড়িয়ে আসা" (Trip to the moon) ছবিখানি বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য, কারণ ১৯৩০ সালে ফিল্ম সোসাইটি এই ছবিখানি এবং মেলিজের তোলা প্যারিসে প্রদর্শিত আরও অন্যান্য ছবি পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন।

ছবি তোলার দিক থেকে এই সব ছোট খাটো উন্নতি সে সময় সম্ভব হ'লেও প্রকৃত চলচ্ছবি তৈরি হয়েছিল বলা যায় ১৯০৩ সালে। এডুইন এস পোর্টারের 'দি গ্রেট ট্রেণ রবারী' (ভীষণ রেল ডাকাতি!) নামে চমকপ্রদ ও উত্তেজনা মূলক বইখানি চিত্রে রূপান্তরিত হবার পর বোঝা গেল যে কেবল মাত্র ছবির দ্বারা গল্প বলা যায়! অথচ এই ছবিখানির দৈর্ঘ্য আটশো ফুটের বেশী নয়। এই ছবিতে নায়িকার অংশ নিয়ে নেমেছিলেন শ্রীমতী মে ম্যরে!

এক হিসাবে ধরতে গেলে চিত্রজগতের প্রথম 'ষ্টার' শ্রীমতী মে ম্যরে! এই ছবিখানি আশাতীত সাফল্য লাভ করায় অবিলম্বে এই ধরণের আরও অসংখ্য ছবি যেমন—'দি গ্রেটব্যঙ্ক্ রবারি, 'ট্র্যাপড্ বাঙ্গি ব্লাড্ হাউণ্ডস্', 'লিঞ্চিং এ্যাট ক্রিপল্ কীক্' প্রভৃতি তৈরি হ'য়ে গেলো। তারপর কয়েক বৎসরের মধ্যেই এক 'রীল' বা হাজার ফুটের ফিল্মে অসংখ্য মেলো-ড্রামা রূপান্তরিত হ'তে লাগলো।

ছবিতে গল্প বলার কায়দাটা মানুষ মাত্রেরই কাছে খুব একটা বিস্ময়ের বস্তু বলে মনে হ'তেই ছবি দেখবার জন্য একটা আগ্রহ ও উৎসাহ জেগে উঠলো সকলের। ইতিপূর্ব্বে শহরের রঙ্গালয় ভাড়া নিয়ে ছবিওয়ালারা দর্শকদের চলচ্চিত্র দেখাতেন, এতদিনে তাঁদের খেয়াল হ'লো—কেবল মাত্র চলচ্ছবি দেখাবার মতোই একাধিক রঙ্গালয় তৈরী হওয়া প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে একাধিক 'ছবিঘর'ও নির্ম্মাণ হ'য়ে গেল। প্রথম ছবিঘর তৈরী করেন

স্পিট্‌সবার্গের হ্যারি ডেভিস্। এই 'ছবিঘর' গুলিকে 'নিকেলোডিয়ন' বলে উল্লেখ করা হ'তো। কারণ, সেখানে পাঁচ সেণ্টেরও আসন বিক্রয় হ'ত। এদেশে যেমন চার আনায় একটি নিকেল সিকি পাওয়া যায়, সে দেশে তেমনি পাঁচসেণ্ট মূল্যের নিকেল মুদ্রার প্রচলন আছে। প্রবেশিকার মূল্য এই একটি নিকেল মুদ্রা মাত্র হওয়ায় এই সব ছবিঘরগুলির নাম 'নিকেলোডিয়ন্'! হ্যারি ডেভিস্ একটি নাট্যমঞ্চের মালিক। ১৯০৫ সালে তিনি তাঁর নূতন 'ছবিঘর' তৈরি করে প্রথম ছবি দেখান "দি গ্রেট্ ট্রেন রবারি!" সেদিন এই ছবিরই এমন একটা বিরাট আকর্ষণ ছিল যে আজকের দিনে তা কল্পনাও করা যায়না! ১৯২৯ সালে যখন প্রথম সবাক্ চিত্র দেখানো সুরু হ'লো তখন "সিংঙিংঙ্ ফুল" ছবির যে রকম প্রচণ্ড আকর্ষণ দেখা গেছল, সে যুগে এই আটশো ফুটের 'ট্রেন্‌রবারি', ছবিখানির আকর্ষণ তার চেয়ে কোনো অংশে' কম ছিলনা!

হ্যারি ডেভিসের 'ছবিঘর' খুব চ'লছে এবং লাভবান হ'চ্ছে দেখে তখন চারিদিকে অসংখ্য 'ছবিঘর' তৈরী হ'য়ে উঠলো। বিশেষ ক'রে যে সব অঞ্চলে মজুর ও কারিগরদের বাস সেই অঞ্চলের 'ছবিঘরে' লোক একেবারে ভেঙে পড়তো! আজকের দিনে যাঁরা খুব বড় বড় প্রোডিউসার বলে পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিচিত, তাঁদের মধ্যে অনেকেই,—যেমন 'জুকর' (Zukor) কার্ল লেমেল্ (carl Laemmle) ফক্স্ (Fox) মার্কাস লো (Marcus Loew) এঁরা সকলেই প্রথমে 'ছবিঘর' করে বহু অর্থ উপার্জ্জন ক'রেছিলেন।

য়ুরোপে তখন অধিকাংশ প্রদেশেই চলচ্চিত্র দেখানো হ'তো মিউজিক্ বা কন্সার্ট হলে, নাট্যমঞ্চে, রঙ্গালয়ে এমন কি বক্তৃতা হল্ ও ইস্কুল বাড়ীতেও! ১৯০৩ থেকে ১৯০৯ সাল পর্য্যন্ত 'হেল্‌স ট্যুর্‌স' নামে একটা দল নানাদেশ ঘুরে শহরে শহরে ও গ্রামে গ্রামে দেশভ্রমণের ছবি বা নানাদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়ে বেড়াতো। রেলগাড়ীর কাম্‌রার মত তৈরী একটি ঘরে তারা এই সব ছবি দেখাত অতি অল্পসংখ্যক দর্শককে। ছবির স্থান বিশেষের প্রয়োজন বুঝে দর্শকদের মনে একটা অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করবার উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে সমস্ত গাড়ীখানাই দোলানো হ'তো। এই চেষ্টাকেই বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ 'ছবিঘর' গুলিতে চিত্রোপযোগী পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও আবেষ্টন সৃষ্টি করবার প্রথম সূত্রপাত বলা যেতে পারে।

এইসব পাঁচসেণ্টের 'নিকেলোডিয়ন্' ছবিঘর এবং 'মিউজিক হল', থিয়েটারের প্রেক্ষাগার, হে'লস্‌ট্যুরস্ প্রভৃতি থেকে ক্রমে উচ্চ অঙ্গের চলচ্চিত্রাগার নির্ম্মিত হ'তে সুরু হলো। সঙ্গে সঙ্গে ভালো ভালো ছবির চাহিদাও বাড়লো। তখন ছবি তোলার জন্য বিশেষ বিশেষ কোম্পানী গড়ে উঠলো, তারা মাইনে করা অভিনেতা ও অভিনেত্রী রেখে তাদের দিয়ে খুব উৎকৃষ্ট ও চিত্তাকর্ষক গল্পের ছবি তৈরী করা সুরু করে দিলে। ক্রমে এক 'রীল' ছবি থেকে একাধিক রীলের বড় বড় ছবি তোলা হ'তে লাগলো। এই ছবি তোলার বাহাদুরী দেখিয়ে অনেকেই বিশ্ববিখ্যাত হ'য়ে পড়লেন। পূর্ব্বেই বলেছি ডেভিড্ ওয়ার্ক্ গ্রিফীথ্ আগে রঙ্গালয়ের একজন সামান্য অভিনেতা ছিলেন। ১৯০৮ সালে নিউইয়র্কের আমেরিকান্ বায়োগ্রাফ কোম্পানী তাঁকে ছবির অভিনেতা ও চিত্রনাট্য রচয়িতা হিসাবে নিয়োগ করেন।

সেদিন তাঁরাও জানতেন না যে চলচ্চিত্রজগতে ইনি এমন একটা কিছু কীর্ত্তি করবেন যাতে তাঁর নাম চির-দিনের জন্য অমর হ'য়ে থাকবে।

১৯১১ সাল থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে চলচ্চিত্র আশ্চর্য্যরকম দ্রুত উন্নতিলাভ ক'রেছিল। এই সময়ে য়ুরোপ থেকে খুব চমকপ্রদ ছবি আসতে সুরু হয়েছিল। আমেরিকার ছবি-ওয়ালাদের মনে সেই সব চিত্রের প্রভাব অত্যন্ত বেশী রকম কাজ করেছিল। ইংল্যাণ্ডের 'হেপ্‌ওয়ার্থ ফিল্‌ম কোম্পানী, 'ব্রিটিশ্‌ এণ্ড কলোনীয়াল্‌ কাইনেমেটোগ্রাফ কোম্পানী' ও 'লণ্ডন ফিল্‌ম্‌ কোম্পানী' প্রভৃতির তোলা ছবি তখন পৃথিবীর সব দেশে বিশেষভাবে আদৃত হচ্ছিল। ফ্রান্স এই সময় খুব জাঁক-জমক ওয়ালা বড় বড় ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর চলচ্চিত্র তুলছিল। লুইস্‌ মার্কাষ্টনের "কুইন্‌ এলিজাবেথ্‌" ছবিখানি ফ্রান্সের বিজয়গৌরব হ'য়ে উঠেছিল। এই ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় ভূবন-বিদিতা শ্রেষ্ঠতমা অভিনেত্রী শ্রীমতী সারা বার্ণহার্ট্‌ অবতীর্ণা হয়েছিলেন।

এই ছবি যেখানে যেখানে প্রদর্শিত হ'য়েছিল সেইখানেই এ ছবি নিয়ে একটা যেন মাতামাতি হয়েছিল। দেখতে দেখতে চারিদিকে এ ছবির সাড়া পড়ে গেলো! ১৯১২ সালে নিউ ইয়র্কের ছবিঘরের মালিক এডলফ্‌ জুকর (Adolf zukor), এডুইন এস, পোর্টার (Edwin S. porter) ডানিয়েল্‌ ফ্রোম্যান (Daniel Frohman) প্রভৃতি একত্রে মিলিত হ'য়ে আমেরিকার দর্শকদের জন্য এই ছবিখানি কিনে নিয়েছিলেন। ইটালি থেকেও এই সময় অতি চমৎকার সব উৎকৃষ্ট ছবি আমদানি হ'তে সুরু হ'য়েছিল। ইটালির এইসব বড় বড় ছবি 'ফিচার্‌ ফিল্‌ম' বলে বিখ্যাত হয়ে পড়লো। হোমারের 'ওডিসি,' 'দি ফল্‌ অফ্‌ ট্রয়' 'ফাউষ্ট্‌,' 'দি থ্রী মাস্কেটিয়ার' 'দি স্যাক্‌ অফ রোম' প্রভৃতি একাধিক ইতালীয় ছবিই এই শ্রেণীর। কিন্তু, ইতালীর সকল ছবির মধ্যে 'ক্যো-ভেডিস্‌' ছবিখানিকে তখনকার দিনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা যেতে পারে। ১৯১৩ সালে এই ছবিখানি আট রীলে আটহাজার ফুটে শেষ হ'য়েছিল। জর্জ্জ ক্লেইন্‌ এই ছবিখানি আমেরিকার দর্শকদের জন্য কিনে নিয়েছিলেন। ক্যো-ভেডিস্‌ দেখবার পর আমেরিকার চিত্রাধ্যক্ষ ও চিত্র প্রযোজকদের চোখে যেন ধাঁধাঁ লেগে গেছলো! কারণ, আমেরিকায় তখনও অত্যন্ত সব থেলো ছবি—যেমন 'লাইফ্‌ অফ্‌ বাফেলো বিল্‌' প্রভৃতি দেখানো হচ্ছিল এবং আমেরিকার দর্শকেরাও তাই মুগ্ধ হ'য়ে দেখছিল। কিন্তু, 'ক্যো-ভেডিস্‌' ছবিখানি এসে তাদের সব ওলোট্‌-পালট করে দিয়েছিল। ১৯১৪ সালের শেষাশেষি গ্রিফিথের্‌ বিরাট কীর্ত্তি "বার্থ অফ্‌ এ নেশান" (Birth of a Nation) ছবিখানি সাধারণকে দেখানো হয়েছিল। এ ছবিখানিকে 'ক্যো-ভেডিসের' পাল্টা জবাব বলা চলে।

১৯১৪ সালের পর "বার্থ অফ এ নেশান্‌" ছাড়া আরও একাধিক শ্রেষ্ঠ ছবিও আমেরিকায় তৈরি হ'য়েছিল। যেমন 'ইন্‌টলারেন্স' 'দি টেন্‌ কম্যাণ্ড মেণ্টেস্‌' 'রবিণহুড্‌' 'বেন্‌হুর', 'নোয়াস্‌' আর্ক', 'মেট্রপলিস্‌' প্রভৃতি।

১৯১৪ সালে য়ুরোপে যে বিরাট যুদ্ধ বাধে তার ফলে সেখানকার চলচ্চিত্র-শিল্প একেবারে বন্ধ হ'য়ে যায়। এই সুযোগে আমেরিকা অগ্রসর হবার পথ পেয়ে চলচ্চিত্র-জগৎ অধিকার

আর্ণেষ্ট লুবীশ্ ও পোলা নেগ্রী। "নিষিদ্ধ স্বর্গ" চিত্রনাট্য গড়া হ'চ্ছে। ৯

নিতা নাল্‌দি—"দশআজ্ঞা"র দৃশ্যে ১০

"বেন্‌হুরে"র ভূমিকায় র‍্যামন্ নোভ্যারো ১১

মিঃ এবং মিসেস নেক্স।

শার্লট নেক্স একজন

চিত্রশিল্পী ১৮

চার্লি চ্যাপ্‌লিন্‌ ও ভিক্টর্‌ সাস্ট্রম

এডল্‌ফ্‌ জুকর ও রুডলফ্‌ ভ্যালান্টিনো ১৬

ক'রে নিয়েছে এবং আজও সে অধিকার অপ্রতিহত প্রভাবে সে অক্ষুণ্ণ রেখেছে। অবশ্য এ অধিকার অর্জ্জন ও বিস্তার ক'রতে এবং চলচ্চিত্র-ক্ষেত্রে একছত্র হ'য়ে থাকবার যোগ্যতা লাভ ক'রতে আমেরিকাকে নিতান্ত কম সাধনা ক'রতে হয়নি। সুযোগ অনেকেই এক আধবার পায়; কিন্তু ক'জন তা' গ্রহণ ক'রে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার ক'রতে পারে! আমেরিকা যে এ সুযোগ নিতে পেরেছিল সে কেবল তার নিজের ব্যবসায়-বুদ্ধির গুণে। তার সাফল্য এবং কৃতকার্য্যতা মার্কিনের অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায়েরই ফল! কারণ, পথ পেলেও আমেরিকার পক্ষে সে পথ ছিল সেদিন দুরধিগম্য! তার অগ্রসরের ব্যাপারটা নিতান্ত সহজ নয়। ধনীরা এ ব্যবসায়ে প্রথমটা টাকা ফেলতে রাজি হয়নি। গোড়ার দিকে বহু অর্থ নষ্ট হ'য়েছে, সাঙ্ঘাতিক বিপদ ও দায়িত্ব মাথায় তুলে নিতে হয়েছে, এবং উদ্ভট সব ব্যাপার ঘ'টে যাওয়ায় বহু অশান্তিও ভোগ ক'রতে হ'য়েছে; তবুও কিন্তু আমেরিকা কিছুতে সঙ্কল্পচ্যুত হয়নি। শেষে,—ধনীরা যখন নিশ্চয় ক'রে বুঝতে পারলে যে, এই চলচ্চিত্রের ব্যবসায় একদিন প্রচুর লাভজনক কারবার হ'য়ে উঠতে পারে, তখন তারা আর কার্পণ্য করেনি।

অর্থাভাব দূর হ'তেই অনতিবিলম্বে আমেরিকা চলচ্চিত্র ব্যবসায়ে সকলদিক দিয়েই উন্নতিলাভ ক'রতে সুরু করেছিল। ১৯১৪ সাল থেকে ১৯১৮ সাল পর্য্যন্ত ক্রমেই তাদের ছবির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯১৮ সালে যুদ্ধ থেমে যাবার পর য়ুরোপ পিছন ফিরে দেখলে যে তাদের পরিত্যক্ত চলচ্চিত্র-ক্ষেত্র আমেরিকা এসে সম্পূর্ণ অধিকার ক'রে বসে আছে! ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মেনী, ইতালী, এমন কি সুদূর প্রাচ্যদেশেও আমেরিকা তার একাধিপত্য বিস্তার করে বসেছিল।

ইংল্যাণ্ডের বাজারে আমেরিকার ছবির সবচেয়ে বেশী আদর হয়েছিল। কারণ, রণক্লান্ত জনসাধারণের অবসাদ-গ্রস্ত মনে আমেরিকার হাল্‌কা ধরণের ও চটুল ভাবের ছবিগুলি খুব বেশী রকম আনন্দদায়ক ও উপভোগ্য ব'লে বোধ হ'ত। তা' ছাড়া, সে সময় বাজারে আর কোনও দেশের চলচ্ছবির আমদানিও ছিলনা। ব্রিটিশ সিনেমাওয়ালারা দেখলে যে আমেরিকার ছবি দেখিয়ে তারা যে পরিমাণ লাভবান হয়, নিজেরা ছবি তুলে দেখালে তা' হয়না। কেউ কেউ ছবি তোলার কাজও সুরু করলে বটে, কিন্তু সে কোনো ছবিঘরে দেখাবার যোগ্য হ'লনা। অর্থ ও অভিজ্ঞতা এই দু'টো প্রধান জিনিসের অভাবে ইংল্যাণ্ডের চলচ্চিত্র শিল্প উন্নতিলাভ ক'রতে পারলেনা। আমেরিকা এদিকে ছবির পর ছবি তুলে যেতে লাগ্‌লো এবং যাতে জনসাধারণের চিত্ত আকৃষ্ট হ'তে পারে, একান্ত নির্ব্বোধ ও নীরেট লোকেরাও দেখে বুঝতে পারে এবং খুশী হয় এমন সব খেলো ও নিম্নশ্রেণীর ছবিই তৈরী ক'রতে আরম্ভ করলে। সমগ্র য়ুরোপ দেখতে দেখ্‌তে আমেরিকার ছবিতে ছেয়ে গেলো, কারণ সে সব ছবির প্রধান আকর্ষণ হ'চ্ছে যৌন-লালসার বীভৎস লীলা!

আগে ছবিঘরের মালিকরা একখানা দু'খানা ক'রে ছবি ভাড়া নিয়ে দেখাতো, ক্রমে আমেরিকা কায়দা ক'রে তাদের প্রত্যেককে একেবারে এক বছরের দেখাবার মত সমস্ত ছবি একসঙ্গে ভাড়া ক'রে রাখতে বাধ্য করলে। অনেকস্থলে যে ফিল্‌ম্ তখনো পর্য্যন্ত তৈরী

হয়নি তা'ও অগ্রিম ভাড়া হ'য়ে যেতে সুরু হ'ল। এমনি করে বিদেশের ছবির বাজার আমেরিকা তার মুঠোর মধ্যে ক'রে নিলে। 'ষ্টার' তৈরির হুজুগ, কদর্য্য বিজ্ঞাপন ছাপা, বেছে বেছে ছবির সব লাগসই গোছের নাম রাখা, প্রভৃতি চিত্র প্রচারের জন্য যা কিছু করা দরকার, য়ুরোপের প্রত্যেক শহরে আমেরিকা তারই ব্যবস্থা ক'রলে। সে সব শহরের অধিবাসীরা আর জানতেও পারলেনা যে আমেরিক্যান ছবি ছাড়া আরও অন্য দেশের ছবিও আছে এবং সে ছবি আমেরিকার ছবির নামে ছেলেখেলার চেয়ে ঢের ভালো! তারা সে সব ছবি দেখার সুযোগ ত' পায়ই না কখনো, এমন কি সে সব ছবির বিজ্ঞাপন পর্য্যন্ত তাদের চোখে পড়েনা।

আমেরিকান্‌রা তাদের 'স্যুপার ফিল্‌ম' অর্থাৎ বড় বড় ছবির সঙ্গে মাঝারি ও তৃতীয় শ্রেণীর ছবিও অনেকগুলি ক'রে খরিদ্দারদের গছিয়ে দেয়। যদি কেউ এমন কোনো একখানি ছবি নিতে চায়, যা দেখবার জন্য তার ছবিঘরে দর্শকের ভিড় হবেই, তাহ'লে সেই সঙ্গে তাকে নিরেশ ছবিও দু'একখানা নিতে বাধ্য করা হয়। প্রতিযোগিতা বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ছবিঘরের মালিকরা ছবি তৈরি হবার আগেই তা ভাড়া ক'রে রাখতে আরম্ভ ক'রলে। সে ছবি কী রকম হবে সেটা তারা অনুমান ক'রে নিতো—সে ছবি কে 'ডাইরেক্ট' করবে এবং সে ছবিতে কোন্ কোন্ 'ষ্টার্' নামবে—অর্থাৎ প্রধান প্রধান ভূমিকায় কোন্ কোন্ অভিনেতা ও অভিনেত্রী অভিনয় করবে জেনে, আর ছবির গল্পটি কোন্ ধরণের হবে শুনে! যেমন—রেমণ্ড্ হ্যাটন্ আর ওয়ালেশ বীরি যদি একখানি ছবিতে খুব ভালো অভিনয় ক'রে থাকেন অমনি সেই ধরণের পাঁচখানা ছবির অর্ডার আসে। তার ফলে আমেরিকা ফরমাজী ছবি তৈরি ক'রতে সুরু করলে; কাজেকাজেই তাদের 'ডাইরেক্টর্' অর্থাৎ পরিচালক এবং প্রযোজক বা প্রয়োগকর্ত্তারা এবং যাঁরা "ষ্টার" বা নায়ক নায়িকা তাঁরা আর স্বাধীনভাবে কিছু ক'রতে পারতেননা।

এডলফ মেঞ্জোর পরিপাটি সুন্দর সামাজিক চিত্রের, এমিল্ জানিংসের "ওয়ে অফ অল ফ্লেশ" ধরণের একটু ভারি ছবির, ক্লারা বো'র হাস্যরসপ্রধান ছবির অনুকরণ এবং রঙ্গালয়ে অভিনীত যত প্রাচীন ও আধুনিক জনপ্রিয় নাটকের ফিল্‌মে রূপান্তর হ'তে সুরু হ'লো। এমনিতর' বিধিবদ্ধ সব নিয়মের মধ্যে কাজ ক'রে অভিনেতা অভিনেত্রী এবং প্রয়োগকর্ত্তারা একেবারে নিতান্ত কলকব্জার সামিল হয়ে পড়েন। এতে তাদের মেজাজ খারাপ হ'য়ে যায় এবং ব্যক্তিত্বও নষ্ট হয়। তাঁরা আর মৌলিক কিছু সৃষ্টি ক'রতে পারেন না। ঘুরে ফিরে নিজেদেরই ছবির অনুকরণ করেন মাত্র!

এ সব দোষ সত্ত্বেও আমেরিক্যান ফিল্‌মই সবচেয়ে লোক-প্রিয় হয়ে উঠেছিল। নূতন ছবি সর্ব্বপ্রথম কোনো নামজাদা বড় রঙ্গালয়ে দেখবার জন্য অনেক টাকা দিয়ে শহরের শ্রেষ্ঠ রঙ্গালয় ভাড়া করাই ছিল সে কালের আমেরিক্যান চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ীদের একটা মস্ত চাল। কারণ, লণ্ডন, বার্লিন, প্যারিস্ বা নিউইয়র্কের মত শহরের একটা প্রধান রঙ্গমঞ্চে যে ছবি প্রথম প্রদর্শিত হ'তো, তার অনেকখানি মর্য্যাদা বেড়ে যেতো। ইংল্যাণ্ডের প্রাদেশিক রঙ্গালয় সমূহে সেই ছবিরই কদর হ'তো সব চেয়ে বেশী, যা' লণ্ডনে প্রথম খুব সমাদৃত হতো!

প্রথম রাত্রিতে প্রদর্শিত হবার পর সংবাদপত্র সমূহে সেই নূতন ছবির যে বিবরণ ও বর্ণনা প্রকাশ হ'তো, মফঃস্বলের 'ছবিঘর'ওয়ালারা সেই সব মতামতের উপর নির্ভর করেই কোন্ ছবি নেওয়া হবে—বা হবে না স্থির ক'রে ফেল্‌তো। কাজে কাজেই প্রত্যেক নূতন ছবি প্রথমে কোনো বড় রঙ্গালয়ে দেখানোটাই একটা যেন অপরিহার্য্য প্রথা হ'য়ে উঠেছিল। তাই বহু আমেরিক্যান ফিল্‌ম মার্কিণ মুলুকে প্রদর্শিত হবার অনেক আগেই লণ্ডনের বড় বড় রঙ্গালয়গুলিতে দেখানো হতো। ক্রমে অন্যান্য প্রধান প্রধান শহরের শ্রেষ্ঠ রঙ্গালয়গুলিতেও নূতন ছবি প্রথম দেখাবার বন্দোবস্ত হ'তে লাগলো। প্রতিযোগিতা বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এক একটি কোম্পানী অনেকগুলি ক'রে ছবিঘর নিজেদের দখলের মধ্যে নিয়ে রাখতে সুরু করলে, যা'তে, কোনো একখানি নূতন ছবি নিয়ে এসে তারা কেবলমাত্র তাদের নিজেদের এলাকাভুক্ত 'ছবিঘর'-গুলিতে দেখিয়ে লাভবান হ'তে পারে। আজকাল প্রায় প্রত্যেক বড় বড় চলচ্চিত্র-প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলির নিজেদের অনেকগুলি করে 'ছবিঘর' হাতে আছে। যারা সব ছোট ছোট ছবিওয়ালা, তারা এই বড়োদের মুখাপেক্ষী হ'য়েই তবে তাদের ছবি চালাতে পারে।

চলচ্চিত্র প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলির নিজেদের দখলের মধ্যে একাধিক 'ছবিঘর' থাকায় তাদের অনেক রকম সুবিধা হ'য়েছে। একই খরচে তারা সমস্ত 'ছবিঘর' গুলির একত্রে বিজ্ঞাপন দিতে পারে। প্রত্যেক ছবিখানি পরের পর তাদের সমস্ত 'ছবিঘর' গুলিতে দেখিয়ে প্রচুর লাভবান হয়। মেট্রো-গোল্‌ড্‌ইন্ মেয়ার্, প্যারামাউণ্ট্, (এ'রা ফেমাস্-প্লেয়ার্স ল্যাসকীর ছবি চালাবারও কর্ত্তা) ফক্স্, প্রভিন্সিয়াল্ সীনেমা থিয়েটার কোম্পানী (এদের হাতে প্রায় ১২০টি ছবিঘর আছে) গ্যমণ্ট্, ইউনিভার্সাল্, প্রভৃতি বড় বড় ছবিওয়ালারা সবাই এই পন্থা অবলম্বন করেছেন।

যুদ্ধের পর একটু প্রকৃতিস্থ হ'তেই য়ুরোপ চলচ্চিত্রজগতে তার হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করবার জন্য আমেরিকার এই একচ্ছত্র আধিপত্য ভাঙবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছে, কিন্তু কৃতকার্য্য হ'তে পারেনি। চিত্র হিসাবে হয়ত' জার্ম্মান বা ফরাসী ছবি হোলিউডের অর্থাৎ আমেরিক্যান ছবির চেয়ে অনেক অংশেই শ্রেষ্ঠ হ'য়েছে, কিন্তু যে সুযোগ, সুবিধা, অর্থবল এবং শৃঙ্খলার জোরে আমেরিকা আজ চিত্রজগৎ অধিকার ক'রে বসেছে, দীর্ঘকাল ধ'রে কঠোর চেষ্টা ক'রেও য়ুরোপ সে পর্ব্বতপ্রমাণ দুর্ভেদ্য বাধা অতিক্রম ক'রে আজও মাথা তুলতে পারেনি। ইংল্যাণ্ড্, জার্ম্মানী বা ফ্রান্স্ যে ছবি তৈরী ক'রছে, আমেরিকার 'ছবিঘর' গুলিতে যদি সে ছবি দেখাবার ব্যবস্থা ক'রতে না পারা যায়, তাহ'লে তারা কিছুতেই লাভবান হ'তে পারে না। কিন্তু আজকের দিনে তা' আর হবার উপায় নেই। আমেরিকা চায়না, যে য়ুরোপ এই ব্যবসায়ে তার প্রতিযোগিতা ক'রতে সমর্থ হোক্! নিজের স্বার্থহানি কে করে? তাই ব্রিটিশ বা জার্ম্মান্ অথবা ফরাসী ছবি দেখাবার জন্য সে একটুও আগ্রহ প্রকাশ করে না।

য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধ অবসানের পর জার্ম্মানীই সর্ব্বপ্রথম বিরাটভাবে এই চিত্রশিল্প-ব্যবসায় ফেঁদে ব'সেছিল। সোভিয়েট্ রাশিয়াও চলচ্চিত্র শিল্প গ'ড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিল,

কিন্তু রাশিয়ার বাইরে তার আত্মপ্রকাশ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি ব'লে তার পরিচয় অল্পলোকেই জানে।

জার্ম্মানী যখন নূতন ক'রে চলচ্চিত্র প্রস্তুতে হাত দিলে তখন খুব উচ্চশ্রেণীর ছবিই সে বাজারে বার ক'রেছিল; কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে জনসাধারণে তার মর্ম্মগ্রহণ ক'রতে পারলে না! আমেরিকার খেলো ছবির বাইরের চাকচিক্য দেখে তারা এমন মুগ্ধ হ'য়ে পড়েছিল যে, জার্ম্মানীর ছবির রসগ্রহণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হ'ল না। কাজেই জার্ম্মান্ চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ীরা এ কাজে লাভবান হ'তে পারলে না। জার্ম্মানীর আর্থিক অবস্থাও সে সময়ে খুব ভালো ছিল না, সুতরাং ক্ষতিস্বীকার ক'রেও আবার নূতন ছবি তৈরী করবার সাহস ও উৎসাহ দু'য়েরই অভাব হ'ল তাদের। ফিল্ম-শিল্পকে সাফল্যমণ্ডিত ক'রে তুলতে হ'লে যে পরিমাণ মূলধন থাকা একান্ত প্রয়োজন, জার্ম্মান কোম্পানীদের কারুরই ভাণ্ডারে সে টাকা ছিল না। তারা তখন নিরুপায় হ'য়ে গভর্মেণ্টের শরণাপন্ন হ'লো। জার্ম্মান গভর্মেণ্ট দেশের এই নবজাত শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য মুক্তহস্তে অগ্রসর হ'লো। কিন্তু সরকারী সাহায্য, ব্যাঙ্ক থেকে অগ্রিম দাদন, এমন কি শেষটা আমেরিক্যান কোম্পানীদের কাছে টাকা ধার করেও জার্ম্মানীর চলচ্চিত্র শিল্প আজও নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারলে না। কিন্তু, ছবি যা' তারা বার ক'রেছিল আমেরিক্যানরা তা' দেখে তাদের নিজেদের ছবির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শঙ্কিত হ'য়ে উঠেছিল! আমেরিকার সৌভাগ্যবশতঃ জার্ম্মানছবি কলাহিসাবে শ্রেষ্ঠ হ'লেও ব্যবসায়ের দিক দিয়ে লাভজনক হ'য়ে উঠতে পারলেনা। কূট-ব্যবসায়বুদ্ধি-সম্পন্ন আমেরিকা এই সুযোগে জার্ম্মান ছবির পশ্চাতে যে সব মাথা ছিল, একে একে তাদের হোলিউডে টেনে নিয়ে গেল। জার্ম্মানীর ডাইরেক্টার, শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীবর্গ এবং চলচ্চিত্র-কলা-বিদ্‌দের নিয়ে এসে সে নিজের কাজে লাগিয়ে দিলে।

সুইডেন্ এবং ফ্রান্স্ সম্বন্ধেও ঠিক ঐ কথাই বলা চলে। কিছুকাল ধ'রে সুইডেন খুব উচ্চশ্রেণীর ভালো ছবি তৈরী করবার চেষ্টা ক'রেছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ব্যবসায়ের দিক দিয়ে তারাও লাভবান হ'তে পারেনি। তাদেরও শক্তিশালী ও প্রতিভাবান ডাইরেক্টার এবং অভিনেতৃবর্গ অবশেষে একে একে সব হোলিউডে গিয়েই হাজির হ'য়েছিল। ফ্রান্স্ মাঝে মাঝে একএকখানা অসম্ভব রকম ভালো ছবি তৈরী করে ফেলছিল বটে, কিন্তু, বরাবর সে ধারা বজায় রাখতে পারেনি; কাজেকাজেই তারাও চলচ্চিত্র-জগতে আশানুরূপ প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারলেনা। ইংল্যাণ্ডের অবস্থাও অনেকটা তাই। সেখানকার যে ক'জন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা অভিনেত্রী ছিল, আমেরিক্যান ছবিওয়ালারা তাদের গ্রাস ক'রে নিলে। ফলে ইংল্যাণ্ড আর ভালো ছবি তৈরী ক'রেই উঠতে পারলেনা।

য়ুরোপের যে চারটি বড় বড় দেশ চলচ্চিত্র শিল্পে আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রতে সাহস ও যোগ্যতা দেখিয়েছিল, আমেরিকা তাদের আসল মাথা-ওয়ালা লোকগুলিকে টেনে নিয়ে তাদের জব্দ ক'রে ফেললে। কিন্তু, এই চারদেশের চিত্ররথেরা হলিউডে গিয়ে তাঁদের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব, বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকতা হারিয়ে ক্রমে আমেরিক্যান্ ছবিকলের চাকা হ'য়ে উঠেছিলেন। নিজেদের দেশে থাকতে তাঁরা যে ধরণের সব উচ্চশ্রেণীর ছবি তৈরি ক'রতে

"বিড়াল-পন্থা" চিত্রে নায়িকার ভূমিকায়—
শ্রীমতী লিল ডাগোভার ১৫

ক্লারা বো ১৭

“ডুবারী”, নাট্যচিত্রে শ্রেষ্ঠ ভূমিকায় শ্রীমতী থেডা বারা ১৬

'সানরাইজ' বা অরুণোদয় নাট্যচিত্রের একটি দৃশ্য ১৮

পেরেছিলেন, আমেরিকায় গিয়ে তাঁরা সে-রকম ছবি আর একখানিও প্রস্তুত ক'রতে পারেননি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মার্ণো (Murnau) লুবীশ্ (Lubitsch) লেনী (Leni) ড্যুপণ্ট্ (Dupont) সীস্ট্রোম (Seastrom) প্রভৃতি ডাইরেক্টারদের কথা বলা যেতে পারে। মার্ণো আমেরিকায় গিয়ে "ভূতচতুষ্টয়" (Four Devils) এবং "অরুণোদয়" (Sunrise) শীর্ষক যে দু'খানি ছবি তুলে বিশ্ব-বিখ্যাত হ'য়ে পড়েছেন, সে ছবি "বিড়ালতপস্বী" (Tartuffe) এবং "অন্তিম হাস্য" (The Last Laugh) শীর্ষক আগের তোলা ছবি দু'খানির তুলনায় কিছুই নয় বলা চলে। লুবীশের 'দেশভক্ত' (Patriot) অপেক্ষা তাঁর আগের তোলা 'ড্যুবারী' (Dubarry) নাটকীয় ঐশ্বর্য্যে অনেক শ্রেষ্ঠ! লেনীর আগের তোলা "মোমের ছাঁচ" (Waxworks) তাঁর পরে তোলা "যে লোক হাসে" (The man who Laughs) ছবির চেয়ে অনেক ভালো। অভিনেতৃদের বিষয়ও দেখা যায় ঠিক্ এই ব্যাপারই ঘটেছে। 'ফাউষ্ট্' (Faust) ছবিতে এমিল্ জানিংস্ (Emil Jannings) যে উচ্চ অঙ্গের অভিনয় ক'রেছেন "পাপের পথে" (The Street of Sin) তাঁর সে গুণপণা আমরা দেখতে পাইনা। কনরাদ ভীট্‌কে (Conrad Veidt) "প্রাগের ছাত্র" (A Student of Prague) রূপে যে অভিনয় করতে দেখেছি "একজনের অতীত" (A man's past) ছবিতে তাঁর আর সে রূপ নেই। ভুবনবিদিতা অভিনেত্রী গ্রেটা গার্‌বো (Greta Garbo) "নিরানন্দ পথে" (Joyless Street) যে কলানৈপুণ্য দেখিয়েছেন "বহু ব্যাপারে বিজড়িতা নারী" (A Woman of Affairs) ছবিখানিতে ছায়াচিত্রের উৎকর্ষ সত্বেও তাঁর অভিনয় অনেকখানি নিরেশ হ'য়েছে। "মিথ্যার মুকুট" (The Crown of Lies) ছবিতে শ্রীমতী পোলা নেগ্রী (Pola Negri যে অপূর্ব্ব অভিনয় করেছেন "অগ্নিশিখায়" (The Flame) সে দক্ষতা দেখাতে পারেন নি। "মেনন লেসকট্" (Manon Lescaut) চিত্রে শ্রীমতী লায়া ডি পুট্টির (Lya de Putti) অভিনয় "রক্তাম্বরা নারী" (The Scarlet Woman) ছবিখানির অপেক্ষা অনেক বিষয়ে উন্নত।

আগের ও পরের ছবিতে এদের এই যে পার্থক্য, এর আরও কয়েকটি কারণ নির্দ্দেশ করা যেতে পারে। য়ুরোপের যে সব শক্তিশালী 'পরিচালক' স্বদেশে নানা অভাব ও অসুবিধার মধ্যে কাজ করতে অভ্যস্ত হ'য়ে প'ড়ে তাদের শক্তির পরিচয় দেবার সুযোগ পেয়েছিল, হোলিউডের ঐশ্বর্য্য ও প্রাচুর্য্যের মধ্যে গিয়ে পড়ে তাদের আর কোনো কিছুর জন্যই মাথা ঘামাবার প্রয়োজন হয় নি; কাজেই তাদের মস্তিষ্ক ও প্রতিভার চরম বিকাশের সুযোগও উপস্থিত হয়নি সেখানে। তারা একরকম প্রায় [illegible]র কথা ভুলেই গেছ্‌লো বলা চলে। Necessity is the mother of invention কথাটা যে কত বড় সত্য, সে পরিচয় এদের কাজের ভিতর দিয়ে যেমন ক'রে পাওয়া যায় তেমন আর কোথাও দেখা যায় না! একজন শিল্পী যার সিগারেট ধরিয়ে দেবার জন্য দু'জন ছোকরা সদাসর্ব্বদা মোতায়েন রয়েছে, রং গুলে নেবার জন্য যার হাতের কাছে একেবারে হালের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি মজুত রয়েছে, যার ছবির ক্যানভাস্ বাজারে পাওয়া যায় না, বিশেষভাবে অর্ডার দিয়ে তৈরী করানো হ'য়েছে অনেক টাকা ব্যয় ক'রে, যার রংয়ের তুলির এক একগাছি রোঁয়ারই দাম তিনশ'

টাকার কম নয়, সে কখনো কোনো সত্যিকারের ভালো ছবি আঁকতে পারে না। অভাব ও দৈন্যের মধ্যে যে শিল্পী তন্ময় হ'য়ে কাজ ক'রে, সেই জগতে নূতন কিছু সৃষ্টি করে যায়। *যেদিন তাকে নিয়ে গিয়ে ঐশ্বর্য্য ও প্রাচুর্য্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, সেই দিন থেকেই* তার শিল্প-প্রতিভারও সমাধি ঘটে! যে-সব য়ুরোপীয় 'পরিচালক' ও অভিনেতৃবর্গ আমেরিকার আহ্বানে হোলিউডের অসীম সম্পদের মধ্যে গিয়ে পড়েছে, তাদের শক্তিক্ষয়ের প্রধান কারণই হচ্ছে তাদের পূর্ব্বতন অভাবের আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিক দীন আবেষ্টনের আমূল পরিবর্ত্তন।
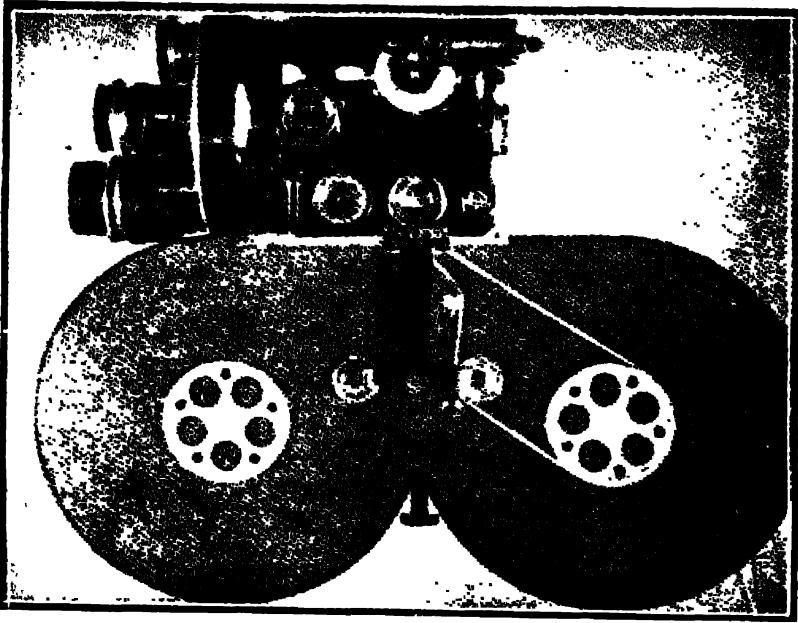
কুমারী গ্রেটা গার্বো

শ্রীমতী পোলা নেগ্রী ২০

বেল এণ্ড হাওয়েল ক্যামেরা। একসঙ্গে হাজার ফুট
সবাক ছবি তোলবার উপযুক্ত
কলকাতা আর্ট। ২১

আইমো —(বেল এণ্ড হাওয়েল) ১১
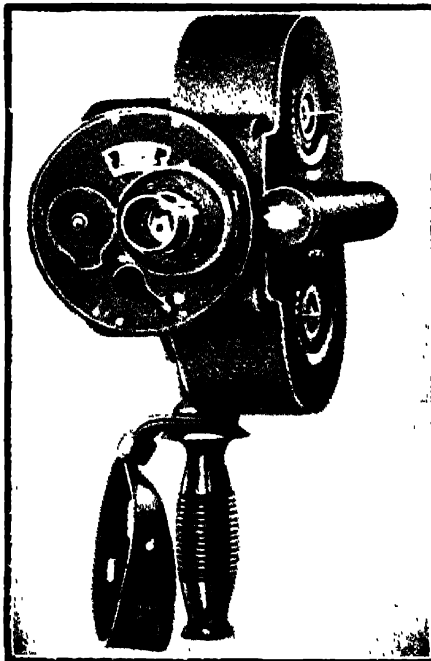
ফিল্‌ম ব্যবসায়ে আমেরিকা ও য়ুরোপ

ব্যবসায়ের দিক দিয়ে আমেরিকার বিভিন্ন চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানগুলি একই স্বার্থ প্রণোদিত হ'য়ে কাজ করবার জন্য প্রকৃতপক্ষে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিল ১৯২২ সালে। 'প্রকৃতপক্ষে' বললুম এই জন্যে যে ১৯১৫ সালে নিউইয়র্কে একটি "মোশন পিক্‌চার বোর্ড অফ্‌ ট্রেড্‌" গঠিত হ'য়েছিল বটে, কিন্তু তারা কোনো কাজই করতে পারেনি। তার পর ১৯১৭ সালে আবার "ন্যাশান্যাল এসোসিয়েশন অফ্‌ দি মোশন পিক্‌চার ইণ্ডষ্ট্রী" নাম দিয়ে আর একটি সমিতি স্থাপিত হয়, কিন্তু তারাও আগের বারের মতো নিষ্ক্রিয় অবস্থাতেই পড়ে ছিল। তার পর বারম্বার যখন এই ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে নানা জালজুয়াচুরী ও অপ্রিয় ঘটনা সব ঘটতে লাগ্‌লো তখন "মোশন পিক্‌চার প্রোডিউসার্স এণ্ড ডিষ্ট্রিবিউটার্স অফ্‌ আমেরিকা" নাম দিয়ে ১৯২২ সালে একটি পঞ্চায়েৎ গড়ে উঠলো এবং তার মোড়ল-পদে নিযুক্ত হ'লেন মিঃ উইল্‌ হেজ্‌ (Will Hays)। শ্রীযুক্ত উইল হেজ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পোষ্ট মাষ্টার জেনারেলের কাজ করছিলেন। এই উচ্চ পদে তিনি ইস্তফা দিয়ে উক্ত সমিতির কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ ক'রলেন। তাঁর সুযোগ্য তত্ত্বাবধানের গুণে এই সমিতি শীঘ্রই কার্য্যকরী ও শক্তিশালী হয়ে উঠলো। আমেরিকার সমস্ত চলচ্চিত্র সম্প্রদায় এই সমিতির নির্দ্দেশ মেনে চলতে বাধ্য হ'লেন। কেবলমাত্র ব্যবসায়ের দিক দিয়েই নয়, চলচ্চিত্রের জন্য উপযুক্ত বিষয় নির্ব্বাচন, আন্তর্জ্জাতিক চলচ্চিত্র কোম্পানীদের সঙ্গে এই ব্যবসায় সম্বন্ধে সম্পর্ক স্থাপন, চলচ্চিত্রশিল্পের সঙ্গে জনসাধারণের ঘনিষ্ঠ পরিচয়, 'সেন্সারশি[illegible] ছবি জনসাধারণকে দেখানো চলতে পারে এবং কোন্ ছবি বা কোন্ ছ[illegible] অংশ জনসাধারণকে দেখানো হ'তে পারে না এটা নির্দ্দেশ করে দেন যে [illegible] সঙ্গে বোঝাপড়া করা, এবং চলচ্চিত্র কোম্পানীর ইনকম্ ট্যাক্স্‌ নিয়ে সরক[illegible] প্রভৃতি নানা প্রয়োজনীয় দিক নিয়ে উক্ত সঙ্ঘ চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান[illegible] ক'রতে লাগলো।

১৯২৫ সাল থেকে চলচ্চিত্র ব্যাপারের আন্তর্জ্জাতিক স্বার্থ নিয়ে একাধিক গোলযোগের সৃষ্টি হ'তে সুরু হয়, চিত্রশিল্প ও ব্যবসায়ের স্বার্থের দিক ছাড়া রাষ্ট্রনৈতিক, ও সমাজনৈতিক সমস্যা নিয়েও গুরুতর গণ্ডগোল আরম্ভ হয়। বিভিন্ন দেশের গভর্ণমেণ্ট ও সংবাদপত্রসমূহও এই নিয়ে খুব হৈ চৈ ক'রতে থাকে। ছায়া পটের উপর আমেরিকার ক্রমে একচেটে অধিকার দাঁড়িয়ে যাচ্ছে দেখে য়ুরোপ এই সময় হঠাৎ সচকিত হ'য়ে ওঠে! আমেরিকার অধিবাসীদের স্বার্থের স্বপক্ষে এই চলচ্চিত্র ব্যবসায় যে কত দিক দিয়ে সাহায্য ক'রছে, ক্রমাগত তাদের জীবনী ও কার্য্যকলাপের বিবিধ চিত্তাকর্ষক পরিচয় বিজ্ঞাপিত ক'রে এই সব আমেরিক্যান্ ছবি য়ুরোপের জনসাধারণের মনের উপর যে কতখানি প্রভাব বিস্তার ক'রছে, এবং আমেরিকার অন্যান্য ব্যবসা বাণিজ্যের কত বেশী সুবিধা ক'রে দিচ্ছে এটা বুঝতে পেরে য়ুরোপ শঙ্কিত হয়ে উঠলো। কেবলমাত্র য়ুরোপই বা কেন, এশিয়া, আফ্রিকার মত মহাদেশ

এবং অষ্ট্রেলিয়া নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি উপনিবেশগুলিও সিনেমা-দূতীর মধুর আকর্ষণে মুগ্ধ হ'য়ে ধীরে ধীরে আমেরিকার প্রেমে আত্মোৎসর্গ ক'রছে দেখে চারিদিকে তুমুল আন্দোলন সুরু হ'য়ে গেলো! বহু বাক্‌বিতণ্ডা তর্ক ও বিচারের পর বিভিন্ন দেশের সরকারী কর্ত্তৃপক্ষেরা তাঁদের চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এই রফা করলেন যে প্রতি সপ্তাহে আমেরিক্যান ছবির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক 'ছবিঘর'ওয়ালাকে, তাদের স্ব-স্ব-দেশের প্রস্তুত নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ছবিও দেখাতে হবে। একে বলে 'কোটা প্রথা' (Quota System)। আমেরিকা এই 'কোটা' প্রথার কবল থেকে আত্মরক্ষা করবার উদ্দেশ্যেই বিশেষ করে য়ুরোপের বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক এবং শ্রেষ্ঠ অভিনেতা অভিনেত্রীদের আমদানী ক'রে ছবির কাজে লাগালে এবং নিজেদের সম্প্রদায়কেও বিদেশে কাজ ক'রতে পাঠালে যাতে তাদের ছবিগুলিকে আর নিছক্ আমেরিক্যান ব'লে কোনো দেশের কর্ত্তৃপক্ষ বাতিল ক'রতে না পারে। এই উপায়ে আমেরিকা তার চলচ্ছবির একটা আন্তর্জ্জাতিক মর্য্যাদা লাভ সম্ভব ক'রে তুলেছে।

"কোটাপ্রথা" প্রচলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে য়ুরোপ আবার চলচ্চিত্র শিল্প গ'ড়ে তোলবার জন্য উৎসাহিত হ'য়ে উঠ্‌লো। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স্ ও জার্ম্মানীতে আবার একে একে অনেকগুলি ছোট বড় চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান ভূমিষ্ঠ হ'ল। কিন্তু অর্থ-সামর্থ্য কারুরই তেমন ভালো ছিলনা। যাই হোক্, কয়েক মাসের মধ্যেই য়ুরোপের তৈরী খানকয়েক চলনসই ছবি বাজারে দেখা দিলে। ফ্রান্স ও জার্ম্মানীর কোন কোন ছবি প্রতিযোগিতায় আমেরিকার ছবির চেয়ে ভালই হ'য়েছিল বলা যেতে পারে, কিন্তু ব্রিটিশ ফিলম্ আমেরিক্যান্ ছবির চেয়েও নিরেশ হ'য়ে পড়্‌লো। তার কারণ সেখানে কোনো চিত্র প্রতিষ্ঠানই বেশ চারি ...ছিয়ে নিয়ে কাজ সুরু ক'রতে পারেনি। মাথাওয়ালা ভালো পরিচালকেরও ...কান্ত অভাব ছিল। তবু, ব্রিটিশ ফিল্‌মকে বাজারে সচল ক'রে তোলবার জন্য ...ঢক্কা-নিনাদ সুরু করা হ'ল। কাগজে পত্রে ভালো ভালো নামজাদা লোকদের ...শ ফিল্‌ম সম্বন্ধে বড় বড় প্রবন্ধ লেখানো চ'লতে লাগলো। ব্রিটিশ চলচ্চিত্র শিল্প ...য় নিয়ে 'হাউস্ অফ্ লর্ডস্' ও 'হাউস অফ্ কমন্‌স্' উভয় সভায় একাধিকবার ...তক বিতর্ক ও আলোচনা করা হ'লো, বিদেশী ছবিওয়ালাদের ব্যবসাসংক্রান্ত ঘৃণিত উপায়ের তীব্র নিন্দাবাদ চলতে লাগলো, আমেরিকার অভিনেতা অভিনেত্রীদের সম্বন্ধে ব্যক্তিগত কুৎসা ও দুর্নামও প্রচার করা চলতে লাগলো, এবং দেশের ও জাতের কল্যাণ ও মঙ্গলের দোহাই দিয়ে জনসাধারণের মধ্যে খুব একটা জোর আন্দোলন আরম্ভ করা হ'ল। মাসের পর মাস কাগজওয়ালারা জোর গলায় বলতে লাগলো, যে রকম আয়োজন উদ্যোগ করে ব্রিটিশ চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানগুলি ছবি তুলতে লেগেছে তাতে সে ছবি যে কী রকম উৎকৃষ্ট হবে সে কথা বলাই বাহুল্য!

এই রকম ধারাবাহিক বিপুল বিজ্ঞাপনের ফলে জনসাধারণে খুব একটা আশা ও আগ্রহের সঙ্গে ব্রিটিশ ফিল্‌মের আবির্ভাবের জন্য প্রতীক্ষা ক'রেছিল। তার পর একে একে যখন ছবিগুলি পটের উপর দেখা দিতে সুরু ক'রলে, দর্শকেরা সে ছবি দেখে মুগ্ধ হয়ে যাবে এটা স্থির জেনেই ভীড় ক'রে ছবিঘরে ছুটলো, কিন্তু, ছবি দেখে তারা হতাশ হ'য়ে ফিরে

এলো! বিরাট মিথ্যা বিজ্ঞাপনের স্তূপের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ চলচ্চিত্র শিল্প বে-আবরু হ'য়ে প'ড়লো। ১৯২৭ সালে ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট আইন করে এই বিধি প্রবর্ত্তিত করলেন যে প্রত্যেক ফিল্ম-ব্যবসায়ী ও 'ছবিঘর'ওয়ালারা অন্ততঃপক্ষে শতকরা পাঁচখানা ক'রে ব্রিটিশ ফিল্ম বেচ্‌তে ও দেখাতে বাধ্য হবে—তা' সে ফিল্ম্ যেমনই হোক্ না কেন, তাতে কিছু আসে যায়না। জার্ম্মানী এবং ফ্রান্সও ততোধিক কড়া আইন-কানুন ও বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করলেন। যদিও জার্ম্মানী ও ফ্রান্সের একটা মস্ত সুবিধা ছিল এই যে ওদের জনসাধারণ নিজেদের দেশের তোলা ছবি নিরেশ হ'লেও বিদেশী ছবির চেয়ে তারই আদর ক'রতো বেশী: তাছাড়া, জার্ম্মান্ ও ফরাসী ছবি ব্রিটিশ ফিল্মের চেয়ে অনেকগুণে ভালোও হয়েছিল। ইংল্যাণ্ডের 'ছবিঘর'ওয়ালারা কিন্তু ব্রিটিশ ছবি দেখিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হ'ত। সে ক্ষতি তার পরের সপ্তাহে আমেরিক্যান ছবি দেখিয়ে তারা পূরণ করে নেবার চেষ্টা ক'রতো। কেউ কেউ আবার 'কোটা-আইন' অমান্য করেই আমেরিক্যান ছবি দেখাতো, কারণ আমেরিক্যান ছবি দেখিয়ে আইনভঙ্গ করার অপরাধে তাদের যা জরিমানা হ'ত, সে জরিমানার টাকা জমা দিয়েও তাদের লাভ থাকতো যথেষ্ট।

কাজেকাজেই কিছুদিন যেতে না যেতে ছোট ছোট ব্রিটিশ চলচ্চিত্র কোম্পানী গুলি লোপ পেয়ে গেলো। তখন যে ক'টি বড় দল অবশিষ্ট রইল, তারা সব ভালো ভালো বিদেশী অভিনেতা অভিনেত্রীদের আনিয়ে এমন সব ছবি তুলতে সুরু করলে যা জনপ্রিয় হ'য়ে উঠতে পারে ও যা থেকে দু'পয়সা লাভ হ'তে পারে এবং তাদের কোম্পানীগুলিও দাঁড়িয়ে যেতে পারে।

ঠিক এই সময়ে আমেরিকা তার নীরব চলচ্চিত্রকে সবাক্ ক'রে তে[illegible]
ছিল। এই সুযোগে বড় বড় চারটি ব্রিটিশ চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান—"ইণ্টারন্যা[illegible]
"ব্রিটিশ ইন্স্‌ট্রাক্‌শ্যানাল" এবং "গ্যেন্‌স্‌বরো ফিল্ম কোম্পানী" আমেরিকা[illegible]
ইংলণ্ডের বাজারে অনেকখানি জনপ্রিয় হ'য়ে উঠতে পেরেছিল।

অন্যান্য দেশেও ঠিক এই ব্যাপারই ঘটছিল! তাদের যে সব ভালো[illegible]
হোলিউড্ হরণ ক'রে নিয়ে গেছলো তারা সব একে একে তাদের চুক্তি[illegible]
ফিরতে আরম্ভ করেছিল। তাদের ফিরে পেয়ে সে সব দেশে আবার [illegible] ছবি তৈরী সুরু হয়েছিল। কিন্তু, দর্শকের দল তখন সকল দেশেই ক্রমাগত একই রকম ছবি দেখে দেখে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিল। সিনেমা আর তেমন করে তাদের চিত্তাকর্ষণ করতে পারছিলনা। একটা কিছু নূতনত্ব ক'রতে না পারলে যে তাদের আর বেশী দিন ছবিঘরে টেনে আনতে পারা যাবেনা, এ কথাটা চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীরা ভাব্‌তে সুরু করেছিল। এমন সময় আমেরিকা এতদিনের মূকচিত্রকে মুখর ক'রে তুলে চলচ্চিত্র জগতে একটা নূতন সাড়া জাগিয়ে তুললে! আমেরিকার "ওয়ার্ণার্স্ ব্রাদার্স" সর্ব্বপ্রথম সবাক্‌চিত্র তুলে আশাতীত সাফল্যলাভ ক'রলে, দেখে অবিলম্বে আমেরিকার অন্যান্য চিত্রপ্রতিষ্ঠানগুলিও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রলে। য়ুরোপের নীরব ছবির ব্যবসায়ীরা সবাক্ চিত্রের আর্বিভাবে আবার একবার ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়ে পড়লো। প্রথম সবাক্ ছবি—"সিঙিংঙ্

ফুল" দেখবার জন্য যেরকম বিপুল দর্শকের ভীড় হ'তে আরম্ভ হ'ল তাতে মূক ছবিঘরওয়ালারা একেবারে মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়লো! আমেরিকা এগিয়ে এসে তাদের এ বিপদ থেকে পরিত্রাণ করলে! তাদের নীরব চিত্র-গৃহগুলিকে তারা নিজেদের 'সবাক্ যন্ত্র' ও ছবি দিয়ে একে একে মুখর :ক'রে তুলতে লাগলো। এমনি ক'রে চলচ্চিত্র জগতে দ্বিতীয়বার আমেরিকা তার একাধিপত্য বিস্তার ক'রে নিলে।

বারবার তিনবার আঘাত পেয়ে বৃটিশ চলচ্চিত্র ব্যবসায়িরা এবার কোমর বেঁধে 'সবাক্' ছবি তৈরি ক'রেতে লেগে গেলো। 'সবাক্' ছবির আবির্ভাব ইংল্যাণ্ডের চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীদের নূতন করে আবার একটা মস্ত সুযোগ এনে দিলে! এবার এই ছবির কারবারে তাদের কৃতকার্য্য হবার আশা হল।—"বৃটিশ ইণ্টারন্যাশান্যাল পিক্‌চার্স কোম্পানী" 'শ্রীযুক্ত আলফ্রেড্ হিচ্ককের' পরিচালনায় তাদের প্রথম সবাক্ ছবি "ব্ল্যাকমেল" তৈরি ক'রে আমেরিকায় পাঠিয়ে দিলে। নিউইয়র্কের কাগজে পত্রে সে ছবির প্রশংসা বেরুলো। চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞেরা অভিমত দিলেন যে—হ্যাঁ এ ছবি প্রায় আমেরিকার ছবিরই সমকক্ষ হয়েছে বলা চলে; কিন্তু, এমনি মজা যে এই কাগজপত্রের প্রশংসা ও বিশেষজ্ঞদের অভিমত সত্ত্বেও নিউইয়র্কের কোনো ছবিঘরই সে ছবি কিনে বা ভাড়া নিয়ে দেখালে না। শেষে কোম্পানী বাধ্য হ'য়ে সেখানকার একটি থিয়েটার ভাড়া নিয়ে সেই ছবি নিউইয়র্কের জনসাধারণকে দেখাবার ব্যবস্থা করলে। অথচ, প্রকৃতপক্ষে "ব্ল্যাকমেল" ছবিখানি তখনকার তুলনায় আমেরিকার সবাক্ ছবির চেয়ে লক্ষগুণে শ্রেষ্ঠ হ'য়েছিল! কিন্তু, আমেরিকার কোনো 'ছবিঘর' সে ছবি গ্রহণ করলে না ব'লে বাজারে তার কাটতি হ'লনা। "বৃটিশ ন্যাশানাল পিক্‌চার্স কোম্পানী" এজন্য বিশেষ ক্ষতি গ্রস্ত হ'ল। এমন কি উপনিবেশ ও এ ছবির চাহিদা হ'লনা। অষ্ট্রেলিয়ার 'সেন্সার' কর্তৃপক্ষরা এ ছবিখানির সে দেশে নিষেধ ক'রে দিলে। পরে এ নিয়ে অনেক হাঙ্গামা করাতে তারা সে নিষেধাজ্ঞা [illegible]ার করেছিল বটে, কিন্তু কোম্পানীর তাতে ক্ষতিপূরণ হয়নি। আমেরিকার অসৎ [illegible] সিদ্ধ হ'ল, ব্রিটিশ সবাক্ ছবি প্রথম চোটেই মার খেয়ে গেলো।

[illegible] কা কিন্তু এখন আর সবাক্‌ছবির কথা ভাবছে না। স্বাভাবিক বর্ণ ও পূর্ণ অবয়ব সম্পন্ন সবাক্ ছবি দেখাবার জন্য তার যে প্রবল ঝোঁক চেপেছিল, তাও সে এখন ছেড়ে দিয়ে, নিঃশব্দে সাধনা ক'রছে পৃথিবীর প্রমোদ ক্ষেত্র তার করতলগত করবার। এ ব্যাপার সম্ভব হ'তে পারে একমাত্র নবউদ্ভাবিত 'টেলিভিশন্' বিজ্ঞানের দ্বারা, অর্থাৎ— দেশান্তরে সংঘটিত ব্যাপারকে দূরান্তরে অবস্থিত নরনারীর লক্ষ্যগোচর করবার বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বনে।

বর্ত্তমানে আমেরিকার দু'টি কোম্পানী প্রধানতঃ পৃথিবীর সমস্ত সবাক্ ও অবাক্ প্রমোদ ব্যাপারের কর্ণধার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে বলা যায়। একটি হচ্ছে R. C. A. বা "রেডিও কর্পোরেশন অফ আমেরিকা," আর একটি হ'চ্ছে "আমেরিক্যান টেলিফোন এণ্ড্ টেলিগ্রাফ কোম্পানী"। প্রথমোক্ত কোম্পানীর সঙ্গে যোগ রয়েছে "জেনারেল ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানী," "পাথে ফিল্ম কোম্পানী" এবং "ভিক্টর গ্রামোফোন কোম্পানীর," তা ছাড়া এ কোম্পানীর

হাতে অসংখ্য নাট্যমঞ্চ সঙ্গীতশালা ও ছবিঘরও রয়েছে এবং 'রেডিও পিকচার্স' নাম দিয়ে এরা নিজেরাও এখন সবাক্ ছবি তোলার কারবার খুলেছে। নবউদ্ভাবিত 'ষ্টেরিয়োপটিকন্ (Stereopticon) যন্ত্র এরাই কিনে নিয়েছে এবং খুব শীঘ্রই তা বাজারে ছাড়বে। এই যন্ত্রের সাহায্যে 'টেলিভিশনে' ছবি দেখাবার জন্য তারা এখন থেকেই প্রস্তুত হ'চ্ছে।

এই R. C. A. কোম্পানী সবাক্ চলচ্চিত্র যন্ত্র নির্ম্মাণে বিশেষজ্ঞ ব'লে পরিগণিত হ'য়েছে। এদের সবাক্ যন্ত্র শুধু ইংল্যাণ্ডের নয়, য়ুরোপ ও এশিয়ারও অসংখ্য ছবিঘরেই স্থাপিত হয়েছে। ওদিকে, শেষোক্ত কোম্পানীও বড় কম শক্তিশালী নয়, কারণ ওয়ার্ণার ব্রাদার্স, প্যারামাউণ্ট, ইউনাইটেড্ আর্টিষ্ট্, ফক্স্, ইউনিভার্স্যাল, ফার্ষ্ট ন্যাশান্যাল ও মেট্রো-গোল্ড্ইন্-মেয়ার—আমেরিকার এই সব ক'টি শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানই এদের সঙ্গে সংযুক্ত। এদের সাহায্যে তারা পৃথিবীর অসংখ্য 'ছবিঘর' আয়ত্ত ক'রে ফেলেছে। কলম্বিয়া গ্রামোফোন কোম্পানী এবং ওয়েষ্টার্ণ ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানীও এদের সঙ্গে বিজড়িত। W. E. C. কোম্পানীর সবাক্‌যন্ত্রও ইংল্যাণ্ড, য়ুরোপ ও এশিয়ার বহু ছবিঘরে ঢুকেছে। এই দু'টি কোম্পানীই ব্যবসা হিসাবে উপস্থিত পরস্পর বিরোধী স্বার্থ হ'লেও একই উদ্দেশ্য নিয়ে অগ্রসর হ'চ্ছে, সে উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়—চলচ্চিত্র, গ্রামোফোন্, রেডিয়ো এবং টেলিভিশন সাহায্যে পৃথিবীর সমস্ত প্রমোদ-প্রতিষ্ঠান জয় করে নিয়ে দিগ্বিজয়ী ও সার্ব্বভৌম আনন্দাধিপতি হওয়া! আমাদের বিশ্বাস যেমন অনেকগুলি ক'রে ছোট ছোট কোম্পানী পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে এক হ'য়ে এই দু'টি শক্তিশালী বৃহৎ কোম্পানী গড়ে উঠেছে, তেমনি ক'রে একদিন এই দু'দলেও মিলে গিয়ে এমন একটি বিরাট ও সুবৃহৎ কোম্পানী হ'য়ে উঠবে যে, অচিরে তারা জগতের সমস্ত দেশের সকল প্রকার আমোদ প্রমোদ সরবরাহ করবার একচ্ছত্র অধিকারী হ'য়ে দাঁড়াবে।

চলচ্চিত্রের বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক দিক

কিভাবে চলচ্চিত্রের উদ্ভব হ'লো এবং কেমন ক'রে সে জনপ্রিয় হ'য়ে উঠে ক্রমশঃ পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে আমরা তা পূর্ব্বেই বলেছি। কিন্তু শিল্পের দিক দিয়ে এই সজীব ছবি যে কেন বেশীদূর অগ্রসর হ'তে পারেনি তার কারণ অনুসন্ধান করলেই বোঝা যাবে যে শিশু চলচ্ছবি যাদের আশ্রয়ে মানুষ ও বড়ো হ'য়ে উঠেছে তারা হচ্ছে সকলেই স্থুল ব্যবসাদার। সৌন্দর্য্য-তত্ত্বের চেয়ে অর্থনীতিটাই তারা ভালো বোঝে, কাজেই, এ ব্যাপারে গোড়া থেকেই তাদের লক্ষ্য ছিল কিসে অল্প খরচে যথাসম্ভব শীঘ্র সবচেয়ে বেশী লাভবান হ'তে পারা যায়!

আমাদের দেশেও ফিল্ম ব্যবসায় ঠিক এই পথ ধ'রেই যাত্রা সুরু ক'রেছে। কিন্তু *চলচ্চিত্রের মতো এত বড়ো একটা শিল্পের যে ও রাস্তা দিয়ে বেশীদূর অগ্রসর হওয়া* কোনোমতেই সম্ভবপর নয় এই সহজ কথাটা তারা আজও বোঝেনি। অতএব এ কথাটা প্রথমেই ব'লে রাখা ভালো যে অন্যান্য শিল্পের তুলনায় ফিল্ম-শিল্প একেবারে একটা স্বতন্ত্র কলা-বিদ্যা। এর একটা নিজস্ব প্রকাশ-ভঙ্গী ও ভাবাভিব্যক্তির বৈশিষ্ট্য আছে। বিষয় বস্তুর বৈচিত্র্য, গল্পের আকর্ষণ বা প্রচার-ধর্ম্ম এর কোনোটাকেই চলচ্চিত্রের প্রধান গুণ ব'লে উল্লেখ করা চলেনা। কারণ, এসকল গুণ থাকা সত্ত্বেও অনেক ছবি দর্শকদের তৃপ্তি দিতে পারে না। ছবি তখনই আমাদের মনোহরণ ক'রতে পারে যখন তা চিত্র-শিল্প হিসাবে [illegible] হ'য়ে ওঠে! চলচ্ছবি প্রধানতঃ আমাদের দৃষ্টিকে মুগ্ধ ক'রে তবে অন্তরকে অভিভূত করে। দৃষ্টিকে মুগ্ধ করার প্রধান উপায় হ'চ্ছে আলো ছায়ার অপরূপ লীলা ও গতিভঙ্গীর ছন্দ [illegible]! সুতরাং চলচ্চিত্রের দু'টি মূল উপাদান হ'চ্ছে আলোক এবং গতি। এই [illegible]লোকের সাহায্যে গতির লীলা যে ছায়ার মায়া সৃষ্টি করে আমাদের দৃষ্টি তাতে মুগ্ধ হয় [illegible] অন্ত[illegible]ত হয়।

[illegible] বৈজ্ঞানিক এবং যান্ত্রিক দিকটা যে পরিমাণে উন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর হয়েছে—কলা [illegible] দিকটা তার সঙ্গে সমান তাল রেখে অগ্রসর হ'তে পারেনি। অতএব [illegible] প্রথমে এর বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক দিকটার পর্য্যালোচনা ক'রে পরে সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করবো।

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলেছি যে ১৮৮৯ খৃঃ অব্দে শ্রীযুক্ত ইষ্ট্ম্যান সর্ব্বপ্রথম 'ফিল্ম' উদ্ভাবন করতে সক্ষম হ'ন এবং সেই ফিল্মের সাহায্যে বিশ্ব বিশ্রুত বৈজ্ঞানিক শ্রীযুক্ত এডিসন্ সর্ব্বপ্রথম চলচ্চিত্র দেখাতে পেরেছিলেন। ১৮৮৯ খৃঃ অব্দে শ্রীযুক্ত জর্জ্জ ইষ্টম্যান্ সেলুলোজ নামক পদার্থ অবলম্বনে যে কোডাক্ ফিল্ম উদ্ভাবন করেছিলেন তার দ্বারা কেবল মাত্র 'নেগেটিভ্' ছবি তোলাই সম্ভব হ'ত। 'পজিটিভ্' ছবি ছাপবার উপযোগী ফিল্মও উদ্ভাবন করা প্রয়োজন বুঝে ১৮৯৫ সালে তিনি আর একরকম ফিল্ম তৈরী ক'রলেন যার সাহায্যে
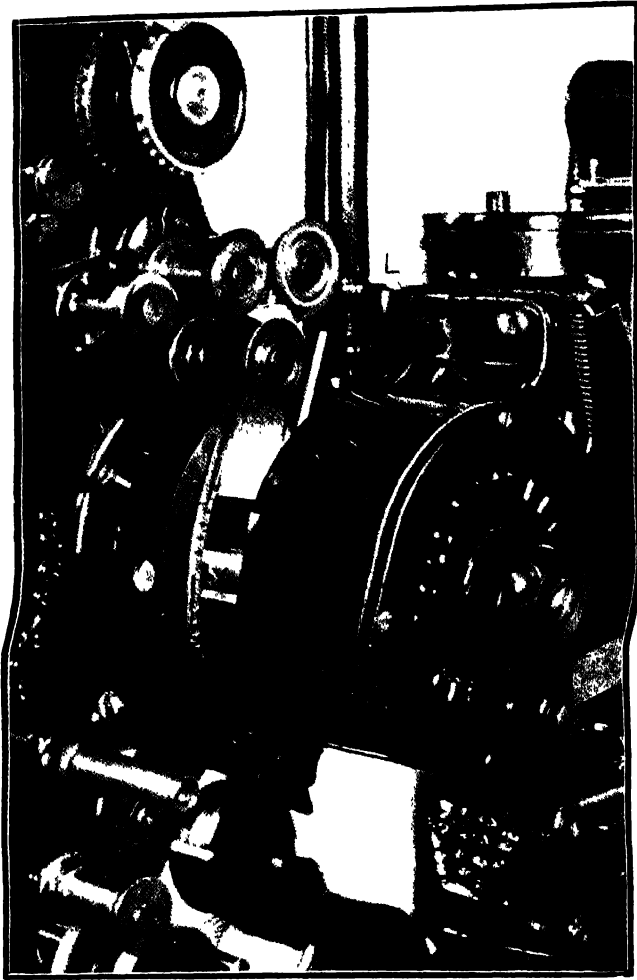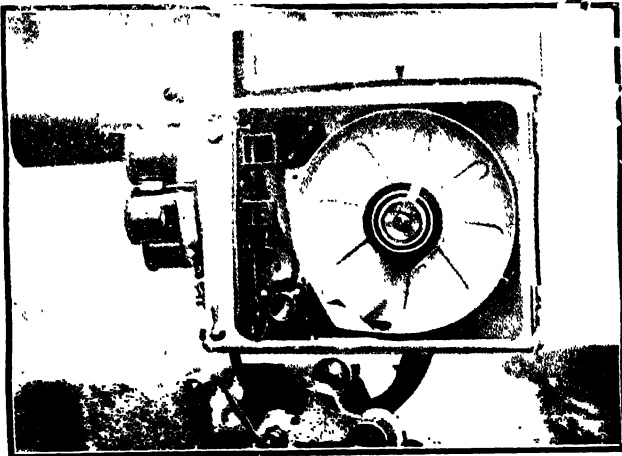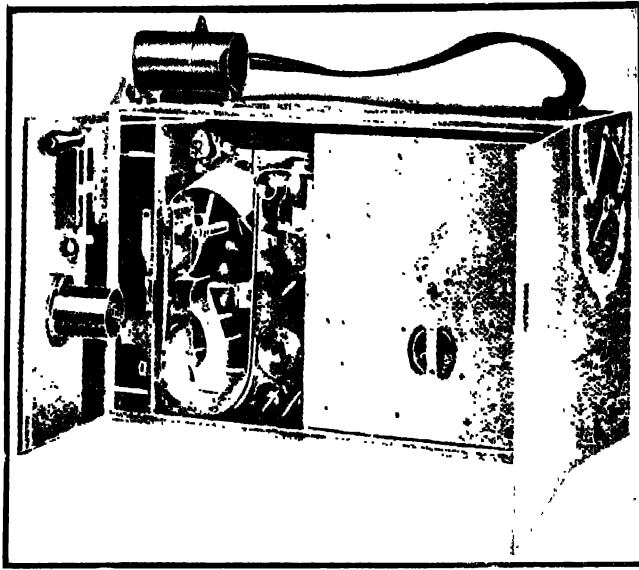
চিত্রগ্রাহক । নিউম্যান্ সিঙ্ক্লেয়ার । ২৫

শ্রীমতী এলিনোর গ্লিন্ । "আমেরিকা" চিত্রনাট্যের গল্পরচয়িত্রী । ২৭

অটোকাইন্ । নিউম্যান্ সিঙ্ক্লেয়ার্ । ২৬
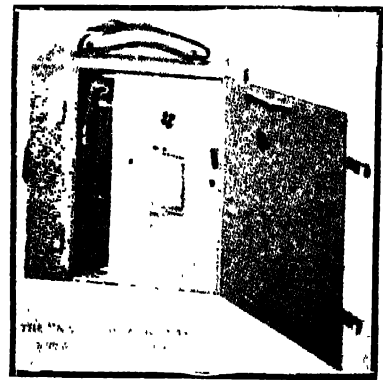
'নেগেটিভ্' ফিল্ম থেকে 'পজিটিভ্' ফিল্ম ছেপে নেওয়া সহজ হ'য়ে গেলো। সেই বছরেই ইষ্টম্যান্ কোডাক্ কোম্পানীর কারখানা থেকে প্রায় ২২০০০ ফিট পজিটিভ্ ফিল্ম বিক্রী হ'য়ে গেলো। আজকের দিনে সেই ইষ্টম্যানের কারখানা থেকে প্রতি বৎসর অন্ততঃ সাড়ে তিন হাজার লক্ষ ফুট অর্থাৎ প্রায় দুলক্ষ মাইল দীর্ঘ ফিল্ম বিক্রয় হ'চ্ছে এবং তার বেশীর ভাগই হচ্ছে পজিটিভ্। চলচ্চিত্রশিল্পের উন্নতি ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ফিল্মেরও উন্নতি আবশ্যক বিবেচনায় ১৯১২ খৃঃ অব্দে ইষ্টম্যান কোডাক্ কোম্পানী তাঁদের কারখানায় একটি গবেষণা বিভাগ খুলেছিলেন। এই গবেষণা বিভাগে ফিল্ম সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিকেরা অচিরে 'ফিল্ম'কে সকল দিক দিয়ে নির্দ্দোষ সুসম্পূর্ণ ও সমুন্নত ক'রে তুললেন। বিভিন্ন প্রয়োজনের উপযোগী কয়েক প্রকার বিশেষ বিশেষ ধরণের ফিল্মও তাঁরা প্রস্তুত করতে সক্ষম হ'লেন—যেমন শিক্ষা ও শিল্প বাণিজ্য বিষয়ক ছবির জন্য তাঁরা 'সেফ্‌টিফিল্ম' অর্থাৎ অদাহ্য (Nonflamable) ফিল্ম তৈরি ক'রলেন, কারণ এসব ছবি স্কুলগৃহ সভাকক্ষ বক্তৃতামঞ্চ প্রভৃতি এমন সব স্থানে দেখাবার প্রয়োজন যেখানে চলচ্চিত্র দেখাবার জন্য বিশেষভাবে নির্ম্মিত প্রেক্ষাগার ও দহন-বিমুখ (Fire proof) প্রক্ষেপনকক্ষ (Projection room) নেই।

১৯২১ সালে রঙীন্-ফিল্ম তৈরী হওয়াতে যে সব ছবি এতদিন শুধু সাদা-কালোয় আলো-ছায়ার রূপ তুলছিল তারা নব রংয়ে বিচিত্র হ'য়ে উঠবার সুযোগ পেলে। এই বৎসরেই News-Film বা 'সংবাদ-পত্রী' অর্থাৎ চল্‌তি খবর ছাপবার জন্য খুব কমদামের এক রকম পাত্‌লা ফিল্মও তৈরী হয়েছিল। চল্‌তি খবরের ছবি অতি অল্পক্ষণ মাত্র দেখানো হয় এবং প্রতি সপ্তাহেই ফেলে দিতে হয়, কারণ খবর পুরাণো হ'য়ে যায় ব'লে বেশীদিন সে ছবি আর চলে না, কাজেই দামী ফিল্মে খবর ছাপলে লোক্‌সান হ'য়ে যায়।

চলচ্চিত্রের প্রচলন ও প্রসার বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একাধিক 'নেগেটিভ্ ফিল্ম' বা বিষম-পত্রী, অর্থাৎ 'মূল ছবি' রাখার প্রয়োজন হ'ল, কারণ একখানি মাত্র 'মূল ছবি' হারিয়ে গেলে চুরি গেলে বা নষ্ট হ'লে আর হবার উপায় নেই, সমস্ত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় একেবারে পণ্ড হ'য়ে যাবে। একাধিক থাকলে সে ভয় নেই। তা ছাড়া একসঙ্গে অনেকগুলি পজিটিভ্ ফিল্ম বা সমপত্রী অর্থাৎ ছাপাছবি সরবরাহ করবার আবশ্যক হ'লে একখানি নেগেটিভ্ বা মূল ছবি নিয়ে কাজ চলে না। অতএব ১৯২৬ সালে মূল ছবিরও নকল নেওয়ার উপায় উদ্ভাবিত হ'ল।

'প্যানক্রোম্যাটিক্ ফিল্ম' বা সার্ব্ববর্ণিক ছায়াপত্রী ছবির উপাদান হিসাবে খুব একটা প্রয়োজনীয় উদ্ভাবন বলতে হবে। কারণ এই ফিল্মে ছবি তুললে পরিদৃশ্যমান সবক'টি রংই তার সম্পূর্ণ রূপরেখা নিয়ে চলচ্চিত্রে ধরা দেয়। ১৯২৭ ও ১৯২৮ সালে এই 'প্যানক্রোম্যাটিক্ ফিল্মের' বিশেষ উন্নতি সাধিত হ'য়েছে! রাত্রে ইনক্যাণ্ডিসেণ্ট (Incandescent) আলোর সাহায্যে তোলা ছবিও এই প্যানক্রোম্যাটিক ফিল্মে বেশ সুস্পষ্ট ওঠে। কাজেই আজকাল ছবি তোলবার জন্য এই ফিল্ম ছাড়া অন্য কোনো ফিল্ম আর ব্যবহারই হয় না।

তুলো থেকে রসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা 'সেলুলোজ' তৈরি করে তাকে রাসায়নাচার্য্যেরা

চলচ্চিত্রের উপাদানে রূপান্তরিত করেন। ফিল্ম তৈরি করবার জন্য এক ইষ্টম্যান্ কোডাক্ কোম্পানীই বছরে প্রায় ৬৩০০০ মণ তুলো খরিদ করেন। এই তুলোকে রিফাইন বা বিশুদ্ধ ক'রে নিয়ে নাইট্রিক্ ও সালফিউরিক্ এসিডে ভিজিয়ে পরে এলকোহলে গুলে চলচ্চিত্রের উপাদান 'সেলুলোজ নাইট্রেটে' রূপান্তরিত করা হয়।

ফিল্মের এই জন্ম-ইতিহাস আলোচনা ক'রতে বসলেই মনে হয় জর্জ্জ ইষ্ট্ম্যান যদি ফিল্ম উদ্ভাবন করতে না পারতেন তাহ'লে হয়ত আজ চলচ্চিত্রের অস্তিত্ব সম্ভব হ ত না! কিন্তু আর একটু ভাবলেই বোঝা যায় যে চলচ্চিত্র গ্রহণোপযোগী অতি ক্ষিপ্র ও তীব্র শক্তিশালী ক্যামেরা Camera—'ছায়াধর' যন্ত্র যিনি উদ্ভাবন ক'রেছেন চলচ্চিত্র শিল্প তাঁর কাছেও কোনো অংশেই কম ঋণী নয়। ক্যামেরা বা "ছায়াধর" সৃষ্টি না হ'লে ফিল্ম আমাদের কোনো কাজেই আসতো না, আবার এ কথাও ঠিক যে শুধু ক্যামেরা নিয়েও চল'চ্চিত্র তৈরী করা সম্ভব হ'ত না—যদি না ফিল্ম পাওয়া যেতো!

আবার এ কথাও যখন ভাবি যে এই ক্যামেরা অথবা ফিল্ম কোনোটার অস্তিত্বই আজ আমরা দেখতে পেতুম না যদি বৈজ্ঞানিকেরা এই তথ্যটি না আবিষ্কার করতেন যে আমাদের দৃষ্টিশক্তির একটা মস্ত বড় দুর্ব্বলতা হ'চ্ছে যে খুব দ্রুতগতিতে আমাদের চোখের সামনে অনেকগুলি আঙুলও যদি নাড়া হয় তাহ'লেও আমরা দেখি ঠিক যেন একটি আঙুলই নড়ছে! দৃষ্টি-বিভ্রমের এই রহস্যটুকু যদি না উদ্ঘাটিত হ'ত তাহলে চলচ্চিত্রের পরিকল্পনাই কখনো কারুর মাথায় আসতো না! সুতরাং, চলচ্চিত্রের ক্যামেরা ও ফিল্ম দুইই তাদের জন্মের জন্য সেই বৈজ্ঞানিকের কাছে চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকতে বাধ্য, যিনি সর্ব্বপ্রথম সন্ধান দিয়েছিলেন যে স্থির ছবিও আমাদের চোখে ন'ড়ছে বলে মনে হ'তে পারে যদি তাকে সেই ভাবে অর্থাৎ সেই রকম দ্রুতবেগে আমাদের চোখের সামনে নাড়া হয়।

দৃষ্টি দৌর্ব্বল্যের এই রহস্য ভেদ হবার পর থেকেই চলচ্চিত্র তোলার উপযোগী ক্যামেরা উদ্ভাবিত হ'ল। অতি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে গতিশীল কোনো ব্যক্তির প্রতি পদক্ষেপের পর পর অসংখ্য আলোকচিত্র গ্রহণ করে সেই ছবি যখন আবার আলোর সাহায্যে প্রোজেক্টার বা প্রক্ষেপন-যন্ত্রের দ্বারা পর্দ্দার উপর ঠিক অবিকল সেই গতিতেই পরের পর নিক্ষেপ ক'রে দেখানো হয় তাহ'লে আমরা দেখতে পাই যে সেই ব্যক্তি হাঁটছে, চ'লছে বা দৌড়চ্ছে কিম্বা লাফাচ্ছে। অর্থাৎ সেই ব্যক্তির যে গতিভঙ্গীর চিত্র তোলা হয়েছিল অবিকল সেই আলেখ্যই আমাদের চোখের সামনে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠ্ছে। এই ব্যাপার সম্ভব ক'রতে গিয়ে প্রাথমিক উদ্যোক্তারা প্রতি সেকেণ্ডে অন্তত পঞ্চাশখানি করে ছবি পর্দ্দার আলোর উপর নিক্ষেপ করা প্রয়োজন ধার্য্য করেছিলেন। তাঁদের হিসাব মত চলতে গিয়ে প্রতি সেকেণ্ডে কোনো গতিশীল কিছুর পঞ্চাশখানি ক'রে চলচ্ছবি তোলাও অত্যাবশ্যক হ'য়ে পড়লো। ফলে, যে বেগে গতির ছায়াছবি নেওয়া এবং তা' দেখানো দরকার সেটা একটা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়ালো! তা' ছাড়া ছোট্ট একটা গল্প বা হাস্য কৌতুকের বিষয় চলচ্চিত্রে দেখাতে হ'লে এত বেশী ফুট ফিল্মের দরকার হ'তে লাগ্লো যে ঢাকের দায়ে মন্সা বিক্রী হবার যোগাড়। কাজে-কাজেই এই মুস্কিল আসান করবার জন্য আবার অনুসন্ধান চলতে লাগলো এবং শেষে

জ্যাক ডেম্প্‌সী : বিখ্যাত
বক্সিং খেলোয়াড়। ২৮
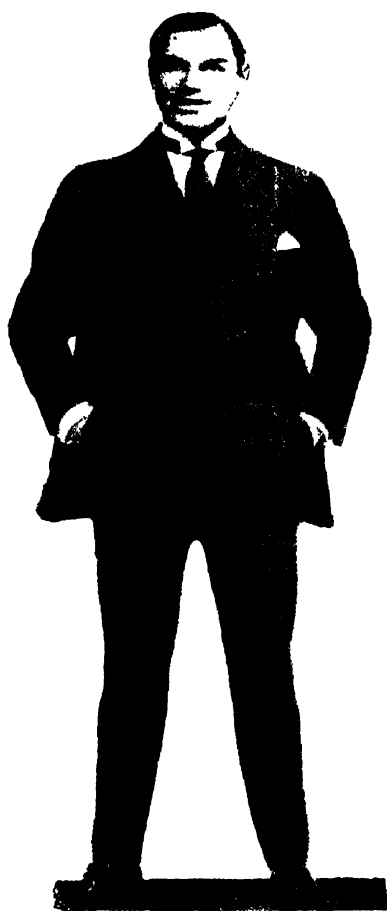
গতির চলচ্চিত্র। এই মেয়েটির প্রতিপদক্ষেপের যে আলোকচিত্র নেওয়া হয়েছে, ছবির পর্দায় এই চিত্রগুলিকে পরের পর ঠিক সমান বেগে ফেলতে পারলে—আমাদের দৃষ্টিতে ফুটে উঠবে একটি মেয়ে ছুটে যাচ্ছে। ২৯
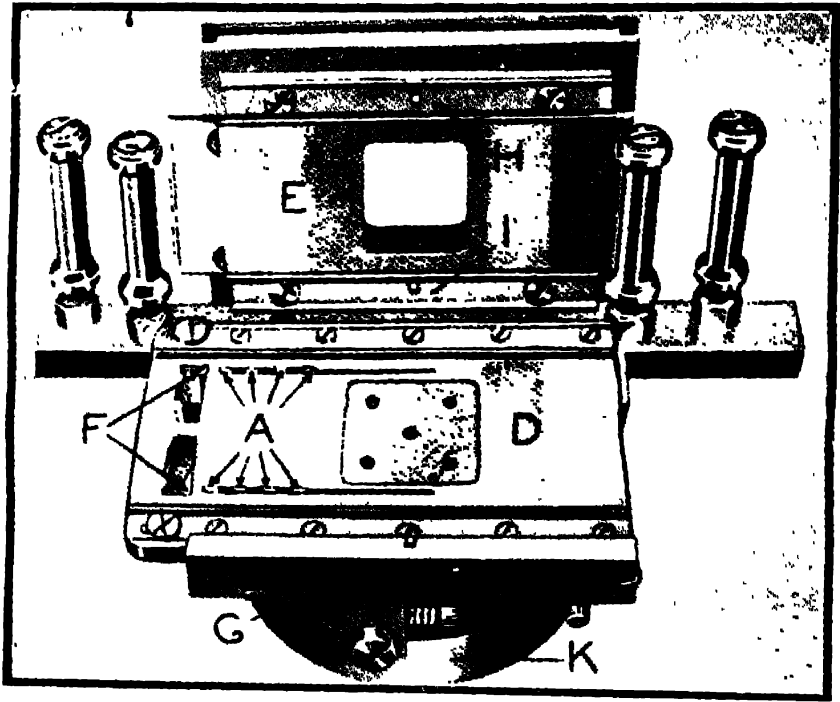
অতি দ্রুত চিত্রগ্রাহী যন্ত্র। এই যন্ত্রের সাহায্যে
প্রতি সেকেণ্ডে ২০০ খানি
ছবি তোলা যায়। ৩০
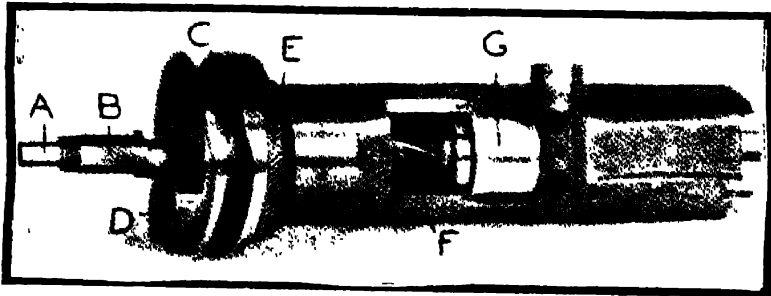
ক্যামেরার মুখের ঢাক্‌না। (ইহাতে ইচ্ছামত বেগে
ক্যামেরার মুখ চাপা দেওয়া ও
খোলা যায়) ৩১

অনেক হিসাব নিকাশ ও পরীক্ষার পর স্থির হ'ল যে প্রতি সেকেণ্ডে যোলখানি ক'রে ছবি তোলা ও দেখানো হ'লেই যে কোনো গতির চলচ্চিত্র পর্দ্দার উপর সঠিক নিক্ষিপ্ত হয়। আজকের দিনে প্রতি সেকেণ্ডে যোলখানি ক'রে ছবি তোলা খুব কঠিন নয় এবং তা দেখানোও আর তেমন শক্ত ব্যাপার নেই, কারণ, 'ক্যামেরা' ও 'প্রজেকটর' এই দু'টি যন্ত্রই আজ সবিশেষ উন্নতি লাভ ক'রেছে।

চলচ্চিত্র ক্যামেরার প্রথম কাজ হ'চ্ছে অগ্রাহিত (raw film) ফিল্‌মখানির কতক অংশ প্রতি সেকেণ্ডে লেন্‌সের (Lens-মণি-মুকুর বা পরকলা) সামনে এমন ভাবে এনে হাজির করা—যাতে প্রতি সেকেণ্ডে যে কোনোও চলমান ব্যক্তি বা বস্তুর গতি-ভঙ্গীর অন্ততঃ যোল-খানি সঠিক ছায়াচিত্র সেই ফিল্‌মের বুকে এসে পড়ে! চলচ্চিত্র ক্যামেরার দ্বিতীয় কাজ হ'চ্ছে লেন্‌সের বা মণি-মুকুরের সামনের আলোটুকু প্রত্যেক সেকেণ্ডের শেষে নিমেষের জন্য আড়াল করবে ব'লে একটি ঢাক্‌না অবিরত চাপা দেওয়া এবং খোলা।

চলচ্চিত্র ক্যামেরার তৃতীয় কাজ হ'চ্ছে প্রতি সেকেণ্ডে যেটুকু ফিল্‌মে ছায়াছবি নেওয়া হ'য়েছে এবং যেটুকু অগ্রাহিত ফিল্‌ম তখনো ব্যবহার করা বাকী রয়েছে এই উভয় অংশই আলোক-বিরোধী Light-proof আধারের মধ্যে সংগোপনে গুটিয়ে রাখা। এ ছাড়াও চলচ্চিত্র ক্যামেরার আরো অনেক কাজ আছে যা গৌণ হ'লেও বর্জ্জনীয় নয়, যেমন, ঐ এক সেকেণ্ডের মধ্যেই একাধিকবার ফিল্‌মখানির গতি কালের সঙ্গে ছবির বিরতি কালের অদল-বদলের সুযোগ পাওয়া! অবশ্য এ সুযোগটুকু পাবার জন্যে চলচ্চিত্র ক্যামেরার কলকব্জা একটু নূতন রকমে পরিবর্ত্তন ক'রে নিতে হ'য়েছে।

ফিল্‌মে কোনো ছবি তোলবার সময় এবং তা' দেখাবার সময় যাতে ফিল্‌মখানি দাঁত সংযুক্ত চাকার সাহায্যে আগাগোড়া ঠিক সমান্তরালে অথচ দ্রুত এবং অনায়াসে নড়াতে অর্থাৎ সরাতে পারা যায় তার জন্য ফিল্‌মের দু'ধারে সমান্তরালে ছিদ্র রাখার ব্যবস্থা হ'য়েছে। এডিসন তাঁর 'কাইনেটোস্‌কোপ' যন্ত্রে এবং ল্যুমীয়ার তার 'সিনেমেটোগ্রাফ' যন্ত্রে ফিল্‌মে ছবি নেবার ও দেখাবার সুবিধার জন্য এই সছিদ্র ফিল্‌ম ব্যবহার ক'রতে বাধ্য হ'য়েছিলেন। এডিসন্‌ যে ফিলম ব্যবহার করতেন তার উভয় প্রান্তে চৌকো চৌকো ঘর কাটা ছিল, কিন্তু ল্যুমীয়ারের 'সিনেমেটোগ্রাফ্‌' যন্ত্রের ফিল্‌মে গোল গোল ঘর কাটা। ক্যামেরা, প্রিন্টিং মেশিন, এবং প্রোজেকটিং মেশিন এই তিনটি যন্ত্রেই এমনভাবে দাঁত সংযুক্ত চাকা লাগানো আছে যে ফিল্‌মের দু'ধারের ফুটোয় সেই দাঁত ঢুকে গিয়ে ফিল্‌মখানিকে ঠিক সমান তালে প্রসারিত ও সঙ্কুচিত করে এবং তার প্রয়োজনীয় অংশটুকু মাত্রই খোলে বা গুটিয়ে তোলে!

কিন্তু এই সছিদ্র ফিল্‌ম ব্যবহার করবার সময় প্রথমে ভারি একটু মুস্কিল হয়েছিল। ছবি তোলার পর সেই ছবি যখন লেবোরেটারীতে অর্থাৎ, রসায়নাগারে গিয়ে ছেপে বেরিয়ে আসে তখন দেখা যায়—রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে ফিল্‌মখানি কুঞ্চিত হ'য়ে যাওয়ার দরুণ নেগেটিভের ফুটোগুলি ছোট হ'য়ে গেছে! সুতরাং তা থেকে যদি 'পজিটিভ' ফিল্‌ম নেওয়া হয় তা' হ'লে নেগেটিভ ছবির সঙ্গে পজিটিভ ছবির ঘর গরমিল হ'য়ে পড়ে! কাজে কাজেই বাধ্য হ'য়ে 'পজিটিভ' ফিল্‌ম এমনভাবে আলাদা ফুটো করে তৈরী হ'তে লাগলো যাতে

লেবোরেটারী ফেরৎ 'নেগেটিভের' সঙ্গে তার ঘর অবিকল ঠিক্ মেলে! এতে কাজের অত্যন্ত ঝামেলা বাড়ছিল, তাই "বেল্ এণ্ড হাওয়েল" কোম্পানীর এ, এস্, হাওয়েল্ সাহেব অনেক গবেষণা ক'রে এমন একটি ছবি ছাপবার অভিনব যন্ত্র উদ্ভাবন করলেন যাতে 'নেগেটিভ' ফিল্ম ছাপবার সময় কুঞ্চিত না হওয়ায় পজিটিভ ফিল্মের সঙ্গে তার ছিদ্রের আর কোনো অনৈক্য ঘটেনা।

মিঃ হাওয়েল্ চলচ্চিত্র ক্যামেরার আরও অনেকগুলি উন্নতি সাধন ক'রেছেন, যেমন Slow motion Picture!—মন্থরগতি-চিত্র। হাওয়েল তাঁর ক্যামেরাকে এমনভাবে তৈরী ক'রলেন যে সেই যন্ত্রের সাহায্যে চিত্রের গতিও প্রযোজকের করায়ত্ত হ'য়ে গেলো! অর্থাৎ যে কোনো বেগের গতি-চিত্র ইচ্ছামত দ্রুত বা সংযত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হ'ল।

শিক্ষামূলক ছবি তোলার পক্ষে এই নবউদ্ভাবন বিশেষ কাজে এসেছে। যেমন কী ভাবে ধীরে ধীরে বীজ অঙ্কুরিত হ'য়ে ক্রমে বৃক্ষে পরিণত হয় এবং কী ভাবে কলি ও মুকুল ক্রমে ফুলে ফলে রূপান্তরিত হয় চলচ্চিত্রের সাহায্যে এ বিষয়ে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া আজ কোনমতেই সম্ভব হ'তনা যদি না 'ছবি'র গতির সঙ্গে 'গতি'র ছবি তোলাও শিল্পীর করায়ত্ত হ'ত। হাস্যরসপ্রধান ও কৌতুক-রঙ্গের চিত্র নেবার সময়ও এই নবউদ্ভাবন শিল্পীর মস্ত বড় সহায় হ'য়ে উঠেছে! মিঃ হাওয়েলের ক্যামেরা প্রতি সেকেণ্ডে যে কোনো গতির দু'শ চিত্র তুলে নিতে পারে। হাওয়েলের আগে ফরাসী বৈজ্ঞানিক এম্ লাব্রেলী যে ক্যামেরা উদ্ভাবন করেছিলেন তাতে প্রতি সেকেণ্ডে একশ' থেকে দেড়শ' পর্য্যন্ত ছবি তোলা যেতো। প্রসিদ্ধ ডেবরী (Debrie) ক্যামেরার 'অতি দ্রুত' (Super Speed) সংস্করণ এঁরই মস্তিষ্ক প্রসূত। পরে 'বেল্ এণ্ড হাওয়েল' ক্যামেরা এসে 'ডেব্রী'কেও টেক্কা দিয়েছে। 'বেল এণ্ড হাওয়েল্' ক্যামেরার আর একটা বিশেষত্ব হ'চ্ছে যে একই ক্যামেরায় 'সাধারণ' ছবি—অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে ষোলোখানি মাত্র এবং 'অতিদ্রুত ছবি'—অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে দু'শ ছবিও তোলা যাবে—এ রকম ব্যবস্থা আছে।

'সবাক্ চিত্র' (Talkie) উদ্ভাবিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'ক্যামেরাকে' আবার একবার ভেঙে চুরে নূতন করে গড়তে হ'য়েছে। 'কথা কওয়া' ছবি প্রতি সেকেণ্ডে চব্বিশখানি ক'রে তোলা দরকার, নইলে ছবির সঙ্গে কথার যোগ রাখা যায়না। প্রতি সেকেণ্ডে ২৪খানি ক'রে ছবি তুলতে গেলে আর হাতে ক'রে ক্যামেরা ঘোরাণো চলেনা, কারণ হাতের গতির কমবেশী হ'লে 'মূক' ছবির তেমন কোনো ক্ষতি হ'তনা বটে কিন্তু 'মুখর' ছবি তাতে মাটি হ'য়ে যাবার সম্ভাবনা, তাই ক্যামেরার হাতল 'সবাক্' ছবি তোলবার সময় মোটরের সাহায্যে ঘোরাণো হয়। এর আর একটা প্রধান কারণ হ'চ্ছে—হাতে ঘোরাণো সহজ হবে বলে 'মূক' ছবি তোলবার ক্যামেরায় হাতলের চাকার মূলে যে 'বলবেয়ারিং' ব্যবহার হ'ত, সবাক্ ছবির ক্যামেরায় তা ব্যবহার করা যায়না, কারণ 'বলবেয়ারিং' সংযুক্ত চাকা ঘোরাবার সময় যে টিক্ টিক্ শব্দ হয়, সবাক্ ছবি তোলবার সময় সে শব্দ হ'লে ছবি নষ্ট হ'য়ে যায়। তাই 'সবাক্' ছবির ক্যামেরা একেবারে নীরব (noiseless) ক'রে নির্ম্মাণ ক'রতে হ'য়েছে।

চলচ্চিত্র ক্যামেরার কপাট বা রোধক (shutter) 'বোবা' ছবি তোলবার সময় প্রতি
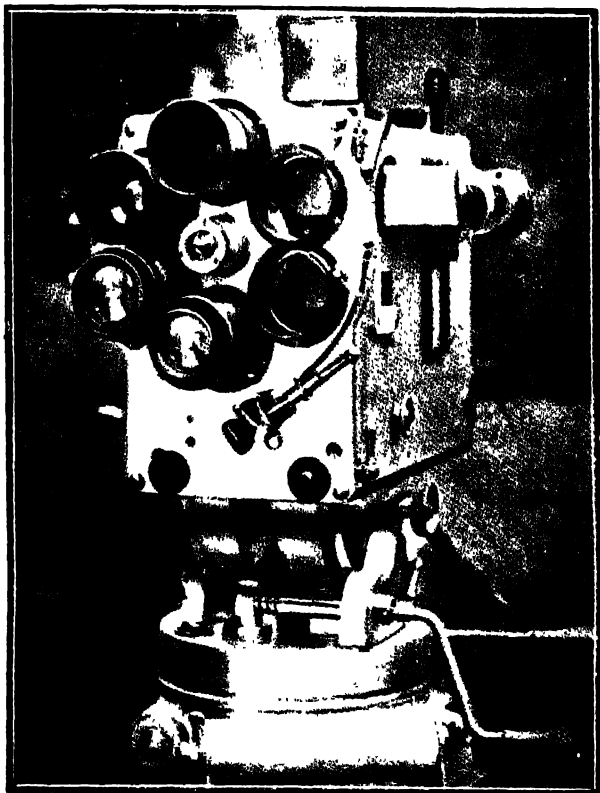
ষড়ানন ক্যামেরা— এই ফরাসী ক্যামেরার ছ'টি মুখে ছ'রকম লেন্স আছে। ক্যামেরাম্যান ছবির দূরত্ব ও গভীরতার পরিমাণ অনুযায়ী যখন যে কোনও মুখ ব্যবহার করেন। মাথার উপর ফোকাসের জন্য লক্ষ্যভেদ দর্পণ আছে ৩২
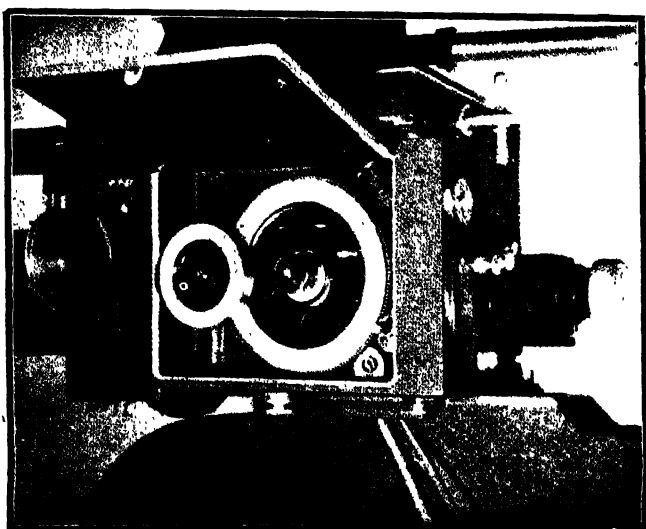
মিচেলের সবাক্ ছবির ক্যামেরা ৩৩
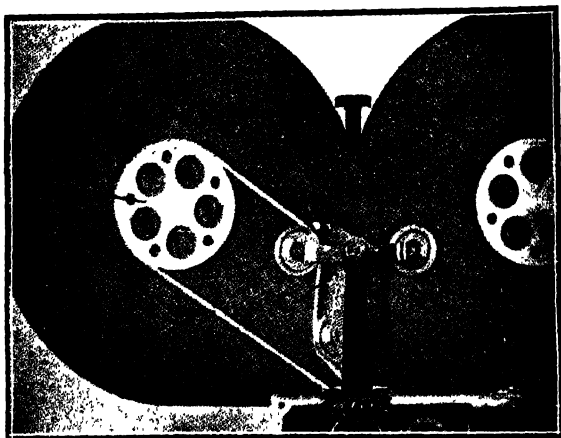
ফিতে ও কপি (বেল এণ্ড্ হাওয়েল) ৩৪
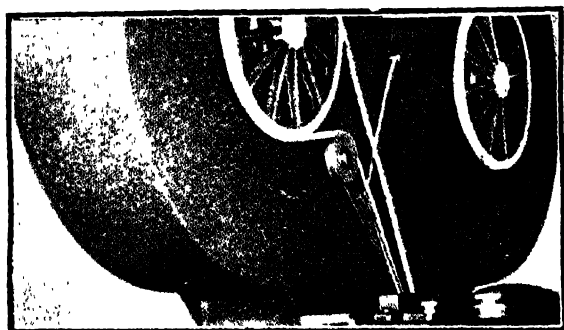
ছবির চাকা ঘোরাবার বেল্ট্ ও পুলি (নিচের) ৩৫

ফুটবল খেলোয়াড় ফ্রিন ৩৬

"দি ক্যাবিনেট অফ্ ডক্টর ক্যালিগারি" চিত্রে সীজারের ভূমিকায়—শ্রীযুক্ত কনরাদ ভাইট ৩৭

সেকেণ্ডে ষোলোবার খুলতো আর বন্ধ হ'তো এবং প্রত্যেক ছবিখানিকে ফিল্মের বুকে উঠে পড়বার জন্য এক-সেকেণ্ডের আটচল্লিশ ভাগের এক ভাগ মাত্র সময় দিত। তখন ক্যামেরার মুখ ১২০ ডিগ্রী এ্যাঙ্গেলের বেশী খোলা যেতোনা, কিন্তু, পরে ১৭০ ডিগ্রী এ্যাঙ্গেল পর্য্যন্ত ক্যামেরার মুখের 'হাঁ' (opening) বাড়ানো সম্ভব হ'য়েছিল। এতে লেন্সের (Lens—মণি-মুকুর) ভিতর দিয়ে বেশী মাত্রায় আলো আসা সম্ভব হওয়ায় ছবি আরও স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌তো।

চলচ্চিত্রের গোড়ার দিকে 'ফেডইন্' বা বিকাশ (Fade-in) ফেডআউট বা অন্তর্দ্ধান (Fade-out) ডিজল্‌ভ বা বিলয় (Dissolve) প্রভৃতি যে সব কৌশল ছবিতে প্রদর্শিত হ'তো তা এই ক্যামেরার ঢাক্‌নাকেই অবলম্বন ক'রে। অর্থাৎ ক্যামেরার মুখের ঢাক্‌নাটিকে ধীরে ধীরে বন্ধ করে বা ধীরে ধীরে খুলে ছবির ক্রমবিকাশ, ক্রমাস্ত বা বিলয় সাধন করা হ'তো। কিন্তু অন্তর্বিলয় (lap-dissolve) সাধনে—অর্থাৎ ছবির একটি দৃশ্যকে ডুবিয়ে দিয়ে তার মধ্যে আর একটি দৃশ্যকে পরিস্ফুট ক'রে তোলার সময় এ কায়দা তেমন কাজে আসতোনা! কারণ দু'খানি ছবির আলোর পরিমাণ সমসূত্র না হ'লে এই 'অন্তর্বিলয়' প্রক্রিয়া ঠিক নির্দ্দোষ হ'তে পারেনা। কিন্তু যখন 'দো-ডালা' (Double disc) ঢাক্‌না উদ্ভাবিত হ'লো, তখন থেকে আপনা হ'তেই ক্যামেরায় স্বতক্রিয় (Automatic) নিখুঁত 'অন্তর্বিলয়' ঘটানো চ'লতে লাগলো!

ক্যামেরার ঢাক্‌না শুধু 'দো-ডালা' হ'য়েই থামেনি, তার প্রতি নিমেষের গতিও এখন ক্যামেরা-ম্যানের সম্পূর্ণ করায়ত্ত হ'য়ে গেছে! তাতে মস্তবড় একটা সুবিধা হয়েছে এই যে—ইচ্ছা মতো যে কোনো দৃশ্যকে যতক্ষণ দরকার আলো লাগিয়ে ফিল্মে ওঠ্‌বার সুযোগ দেওয়া যায়। ফলে দশহাজার ফুট ফিল্মেও সমস্ত ছবিখানিতে এখন আলোর পরিমাণ সর্ব্বত্র সমান রাখা সম্ভব হয়েছে।

ফোকাস্ (Focus) করবার সময়—অর্থাৎ ক্যামেরার মুখের ভিতর দিয়ে ফিল্মের বুকের উপর ছবিখানিকে ঠিক 'তাগ্' ক'রে বাগাতে বিশেষ অসুবিধা ভোগ ক'রতে হ'তো আগে। আজকাল আমেরিকা ছবি তাগ্ করবার জন্য—বন্দুকের 'মাছি' বা 'লক্ষ্যভেদ' যন্ত্রের মতো—ক্যামেরার বাইরে দিকে ফোকাসের উপযোগী পৃথক কলকব্জা বিশেষ ভাবে এঁটে নিয়েছে। পূর্ব্বোক্ত 'বেল্ এণ্ড হাওয়েল্' ক্যামেরা, 'মিচেলের' (Mitchell) ক্যামেরা, একলী (Akeley) ক্যামেরা প্রভৃতি সবেতেই 'ফোকাসের' আলাদা ব্যবস্থা করা আছে। এতে শুধু সময় এবং ফিল্মই বাঁচ্‌ছেনা, অধিকন্তু ছবি তোলার কাজের এত বেশী সুবিধা হ'চ্ছে যে আমেরিকার পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে ফরাসীর 'ডেব্‌রী' ও ক্যামেরাক্লেয়ার (Camereclair) ক্যামেরা এবং ইংরাজের নিউম্যান সিঙ্ক্‌লেয়ার (Newman Sinclair) ক্যামেরাও ফোকাসের জন্য পৃথক্ যন্ত্র সংযুক্ত হ'য়ে নির্ম্মিত হ'চ্ছে।

আমেরিকা আর একটা মস্ত সুবিধা ক'রেছে ক্যামেরায় নূতন ধরণের পত্রী-কৌটা (Film Magazine) নির্ম্মাণ ক'রে। ফরাসী ক্যামেরাই প্রথম চলচ্চিত্র জগতের আদর্শ ছিল। তাতে দু'টি মাত্র পত্রী-কৌটা থাকতো; একটিতে অগ্রাহিত ফিল্ম গোটানো থাকতো, আর একটিতে ছবি তোলা হ'লে ব্যবহৃত ফিল্ম রাখা হ'ত গুটিয়ে। কিন্তু, 'বেল্

এণ্ড হাওয়েল্‌' কোম্পানী 'দো-ঘরা-পত্রী-কৌটা' (Double-chamhered Magazine) উদ্ভাবন ক'রে পত্রী-কৌটা সংক্রান্ত সমস্ত অসুবিধাই দূর ক'রে দিয়েছে।

পত্রী-কৌটার মধ্যে যে চাকায় ফিল্‌ম গোটানো হয় এবং যে চাকা থেকে ফিল্‌ম খুলে নেওয়া হয় তাদের পরস্পরের ঘোরার বেগ কিছুতেই সমতালে না হওয়ায় গোড়ার দিকে এই নিয়ে অত্যন্ত মুস্কিল হ'চ্ছিল। কারণ, ফিল্‌ম জড়ানো চাকাখানি প্রথমটা ফিল্‌মের ভারে একটু ধীরে ঘুরতো, আর ফিল্‌ম গোটাবার খালি চাকাখানি তখন হাল্‌কা ব'লে বেশ জোরে ঘুরতো; তারপর যেমন আস্তে আস্তে এ চাকাখানি ক্রমশঃ খালি হ'য়ে হাল্‌কা হ'য়ে প'ড়তো তখন আবার ওটির বেগ কমে আস্‌তো এবং এটির বেগ জোর হ'ত! আজকাল বেল্ট্‌ ও পুলি, অর্থাৎ সরু ফিতে ও ছোট্ট কপিকল এমনভাবে ক্যামেরার মধ্যে ফিট্‌ করে নেওয়া হয়েছে যার সাহায্যে ভারী চাকাখানিকে হালকা চাকার সঙ্গে সমান বেগেই ঘোরানো যায়।

'বিকাশ' (Fade in) অন্তর্দ্ধান (Fade out) বিলয় (dissolve) অন্তর্বিলেয় (Lap-Dissolve) দ্বিপাতন-চিত্র (Double-exposure) বা ছবির উপর ছবি তোলা, এমনি আবার একাধিকবার একই ছবির উপর ছবি নেওয়া অর্থাৎ, 'বহুপাতনচিত্র' (multiple exposure) 'পটভঙ্গ' (Split screens) 'স্তম্ভন' (stop-motion) ইত্যাদি ক্যামেরা-কৌশল চলচ্চিত্রকে চিত্তাকর্ষক ও রহস্যময় ক'রে তুলেছে! চলচ্চিত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনমত তার বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক দিকেরও এই সব বিস্ময়কর উন্নতি সাধিত না হ'লে চলচ্চিত্র আজ এতবড় একটা ব্যাপার হ'য়ে উঠতে পারতো না! আলোকচিত্রকর (Photographer বা Camera man) যাতে অনায়াসে তার যন্ত্র পরিচালনার খুঁটিনাটির দিকে দৃষ্টি আবদ্ধ না রেখে ছবির ঔৎকর্ষের প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারে তার জন্য আধুনিক ক্যামেরায় 'টাকোমিটার' (Tachometers) সংযুক্ত হ'য়েছে, ভিগনেটিং (Vignetting) বা 'প্রান্তবিলয়ন' যন্ত্র যার দ্বারা ইচ্ছামত ছবির অংশ বিশেষ বিলোপ ক'রে দেওয়া যায়, তাও এখন ক্যামেরার অন্তর্ভুক্ত হ'য়েছে।

বড় বড় ভারি ভারি ক্যামেরা দূর দুরান্তরে নিয়ে যাওয়ার এবং সর্ব্বত্র ব্যবহার করার অসুবিধা হয় বলে আজকাল তিন চার রকম লঘু-বাহ (Portable) ক্যামেরা উদ্ভাবিত হ'য়েছে। 'বেল এণ্ড হাওয়েলের' 'আইমো" (Eyemo) ফরাসী Devry ও cinex, বিলাতী Sinclairs' Auto-Kine প্রভৃতি 'লঘু-বাহ' (Portable) ক্যামেরাগুলির কলকব্জা ছোটর মধ্যেও এমন সুন্দর ভাবে তৈরি যে তার সাহায্যে ঠিক বড় ক্যামেরার মতই নির্দ্দোষ ছবি তোলা যায়।

চলচ্চিত্রের ফিল্‌ম, ক্যামেরা, ছবির রাসায়নিক পরিস্ফুটন (Developing) ও প্রেজেক্টিং বা 'প্রক্ষেপন যন্ত্র' প্রভৃতি ওদেশে যে এত বেশী উন্নতিলাভ ক'রেছে তার একমাত্র কারণ—ও দেশের বহু গুণী বৈজ্ঞানিক রাসায়নিক ও যন্ত্রশিল্পী (Mechanical Engineer) এ ব্যাপারে নেমে দীর্ঘকাল ধরে মাথা ঘামিয়ে অনুসন্ধান, গবেষণা, পরীক্ষা ও সাধনা ক'রে তবে একে আজ সকল দিক দিয়ে সুসম্পূর্ণ ক'রে তুলেছেন। আমাদের মতো ফাঁকি দিয়ে কিছু করবার চেষ্টা করা ওদের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ, কাজেই আমাদের যেখানে ব্যর্থতার অন্ত নেই ওদের সেখানে সিদ্ধির ষড়ৈশ্বর্য্য!

"দি ক্যাবিনেট্ অফ ডক্টর ক্যালিগারি" জেনের ভূমিকায় প্রসিদ্ধা জার্ম্মাণ অভিনেত্রী লিল ডাগোভার্। সীজার জেনের শব চুরি করে নিয়ে যাচ্ছেন। ৩৮

জেনের শব নিয়ে সীজারের পলায়ন।
সীজারের ভূমিকায় কনরাদ ভীট্ ৩৯

ব্যাটেলশিপ্—পোটেমকিন্—সোভিয়েট চলচ্চিত্র ৪০
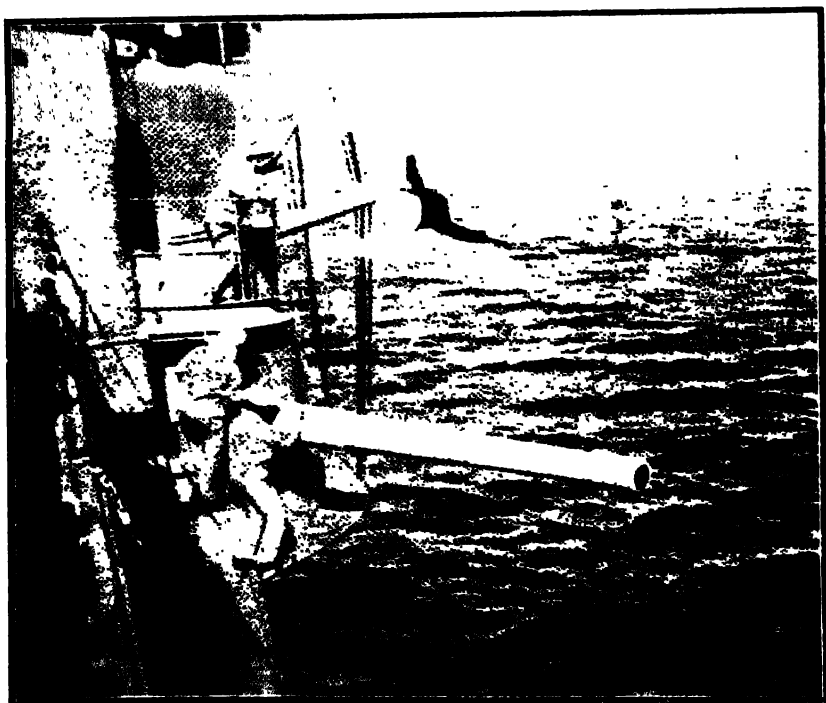
নৌ-সেনা নায়কদের জলমগ্ন হওয়ার দৃশ্য।
ব্যাটেলশিপ্ পোটেমকিন। ৪১

চলচ্চিত্রের শিল্পকলার দিক

পূর্ব্বেই বলেছি যে বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক বিভাগে চলচ্চিত্রের যে বিপুল উন্নতি সাধিত হ'য়েছে, শিল্প-কলার দিক দিয়ে এখনও তার সে পরিমাণ ঔৎকর্ষলাভ ঘটেনি। তার প্রধান কারণ প্রথমতঃ চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ীরা অনেকেই টাকা-আনা-পাই যতটা বোঝেন,—চারু কারু সম্বন্ধে তাঁরা ঠিক সেই পরিমাণেই অবোধ! দ্বিতীয় কারণ—ক্যামেরার চোখে অবিকল সত্য বস্তুই নির্ব্বিকারভাবে প্রতিফলিত হয়, এই ভুল ধারণাবশতঃ এতকাল পর্য্যন্ত রঙীন তুলি নিয়ে শিল্পীদের স্বপ্ন-কল্পনার মায়া তার পিছনে এসে দাঁড়ায়নি। কাজেই তখন গল্পের ছবিও উঠ্ছিল ঠিক এখনকার 'টপিক্যাল বাজেট্' বা চল্তি খবরের মতই! দেশের বিশেষ বিশেষ ঘটনার ইতিবৃত্ত সংক্রান্ত নির্ভুল নথী-সংগ্রাহক হিসাবে, শিক্ষার প্রসার ও জ্ঞান প্রচারের দিক দিয়ে—এমন কি, ক্যামেরায় বিজ্ঞানের' নব নব উদ্ভাবন সম্ভাবনার উপায় নিহিত আছে বলে ধ'রে নিলেও ক্যামেরার শক্তি যদি আজ কেবল 'চল্তি খবরের' মতো চলচ্ছবি শ্রেণীর-সজীব চিত্র তোলাতেই সীমাবদ্ধ থাকতো, তাহ'লে আমাদের দেশের সনাতন গরুর গাড়ীর বৈদিক চাকার মতো ক্যামেরা আজও তার আদিম অবস্থাতেই পড়ে থাকতো! কিন্তু সে তার বহুবিধ শক্তির পরিচয় দিয়ে আজ অনেকখানি এগিয়ে গেছে।

সীনেমা দেখতে গিয়ে প্রধান ছবি সুরু হবার আগে এখনো "চলতি খবরে" দেশ-বিদেশের সচিত্র সমাচারটুকু অনেকেরই ভালো লাগে। কিন্তু, সে ভালো লাগা তাদের ছবির জন্য নয়, খবরেরই জন্য! ঠিক যে আগ্রহে লোকে সকালে উঠেই নিবিষ্ট মনে সংবাদপত্র পড়ে, এও তাই। কিন্তু, একটা কোনো গল্প বা রূপকথার যদি ঠিক ঐ ভাবে ছবি তুলে দেখানো হয় তাহ'লে—সেটা না হবে ছবি—না হবে রূপকথা! কারণ 'চল্তি খবরের' ছবিতে যখন আমরা দেখি যে,—বড়লাট দিল্লীতে একটি নূতন হাসপাতালের দ্বারোদ্ঘাটন ক'রছেন, কিম্বা বিলাতে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর ব্রাইটনে সমুদ্র-স্নান ক'রছেন, তখন বড়লাট বা মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের মনের ভাব কি রকম, সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়না, আমাদের লক্ষ্য হয়ে ওঠে কেবল তাঁদের কাজটুকু! কিন্তু, ছবিতে রূপকথা দেখবার সময় পাতালপুরীর রাজকন্যাকে দেখে উদয়গড়ের যুবরাজের মনে কী ভাবের উদয় হ'চ্ছে, সেইটে জানবার আগ্রহই হ'য়ে ওঠে আমাদের প্রধান আকর্ষণ। রাজকুমারীর সঙ্গে কুমারের চোখের দেখাটুকুর ছবিই শুধু আমাদের নয়ন-মনকে তৃপ্ত ক'রতে পারেনা! কাজেই, চলচ্চিত্রের আদিম যুগে যখন ক্যামেরায় গল্পের ছবি নেওয়া হ'তো—মাত্র কতকগুলি ঘটনার পরের পর ছবি তুলে—অবিকল 'চলতি খবরের' ধরণে, তখন সে ছবি দর্শকদের প্রাণকে স্পর্শ ক'রতে পারতো না, কেবল তাদের—চোখের কৌতূহল কতকটা জাগিয়ে তুলতো মাত্র!

সেই যে প্রথম দিন থেকেই ভুলপথে এই চলচ্চিত্র-শিল্প তার পা' বাড়িয়েছিল, আজও সেই ভুল পথ ধ'রেই সে চলেছে। অল্প কয়েকজন প্রতিভাবান্ পরিচালক ব্যতীত আর কেউ

ক্যামেরাকে শিল্পীর হাতের ক্রীড়নক ক'রে তুলতে পারেননি। ক্যামেরাকে নিজের বশে না এনে ক্যামেরার বশে থেকে যাঁরা ছবি তোলেন, সে ছবিতে তাঁরা কোনো কাল্পনিক সৌন্দর্য্য সৃষ্টি ক'রে কলা-নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পারেন না। চলচ্চিত্র যে কেবলমাত্র 'ফটোগ্রাফ্' নয়, সে যে ছবি—এবং, সে যে গল্পের ছবি নয়—ছবিতে গল্প—এই সহজ কথাটা যে ডাইরেক্টার বা পরিচালক মনে রাখতে পারেন না, তাঁর তত্ত্বাবধানে তোলা ছবিতে পরিচালকের কৃতিত্ব কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। ক্যামেরাকে যিনি ইচ্ছামত ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দূরে নিকটে ও কোণাকোণি ক'রে রেখে, ছবি তোলার সময় ও গতির হ্রাস বৃদ্ধি ক'রে এবং পটচ্ছেদ প্রণালী (Masking) ও পটবিপর্য্যয় (Transposition.) প্রথা প্রভৃতি অবলম্বন ক'রে চলচ্চিত্রকে ছবির পর্য্যায়ে টেনে এনে, ছবির দ্বারা গল্পটিকে সজীব ও প্রত্যক্ষ ক'রে তুলতে পারেন, তিনিই সুদক্ষ পরিচালক ব'লে অভিহিত হবার যোগ্য।

কোনো বস্তু বা ব্যক্তির অবিকল প্রতিকৃতি অর্থাৎ তার আকৃতির প্রত্যেক অংশ ও তার পরিমাপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ছবিতে দেখ্‌তে পেলেই আসল জিনিসটি বা ব্যক্তিটিকে দেখার অনুরূপ আনন্দ বা অনুভূতি জাগেনা। কোনো বস্তু বা ব্যক্তির পরিবর্ত্তে যদি আমরা কেবলমাত্র তার ছবিখানি পাই তাতে আমরা খুশী হ তে পারিনি। টাকার পরিবর্ত্তে যেমন টাকার ছবি পেলে কারুর মন ওঠেনা, এও অনেকটা সেই রকম। যে পরিচালকের শিল্প-প্রতিভা আপন কল্পনা-শক্তির সাহায্যে কোনো বস্তু বা ব্যক্তির প্রতিরূপ সৃষ্টি করে—যেটা তার নিজের অনুভূতির ছায়া বা তার অন্তর্দৃষ্টির অবলোকিত কিম্বা মানস-গোচর রূপের অভিব্যক্তি—সেইটাই যথার্থ 'আর্ট' বা কলা-পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে শিল্পের মর্য্যাদা লাভ করতে পারে। "একজনের ছবি উঠেছে ঠিক যেন তার অবিকল জীবন্ত প্রতিকৃতি" এ কথা ব'ললে—সে ক্যামেরাটি যে খুব ভালো এবং নির্দ্দোষ এটা প্রমাণ হ'তে পারে বটে, কিন্তু, শিল্পীর বাহাদুরী বা গুণপনার পরিচয় কিছুই পাওয়া যায় না তার মধ্যে। শিল্পীর কৃতিত্ব সেই খানে —যেখানে শিল্পীর চোখে সে তাকে যেমনটি বা তার যে রূপটি দেখেছে—তার যেটুকু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বা প্রধান পরিচয় যা শিল্পীর দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে—সেইটুকু বিশেষ ক'রে যে ছবিতে সে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে—সেইখানেই শিল্পীর যথার্থ নৈপুণ্য, এবং দর্শকের মনেও সেই ছবিই একটা আনন্দানুভূতির সাড়া জাগিয়ে তোলে! নইলে, তাদের প্রতিদিনের সহজ দেখা মানুষটিকে ছবিতে হুবহু তেমনি দেখলে তাদের দৃষ্টি বেশীক্ষণ সেদিকে আবদ্ধ থাকে না। অথচ,—দর্শকের দৃষ্টিকে ছবির উপর আবদ্ধ ক'রে রাখাই হ'চ্ছে এই চলচ্চিত্র শিল্পের ক্ষেত্রে সার্থকতা লাভের একটা প্রধান উপায়!

শিল্পীর চোখের বিশেষ দৃষ্টি আমাদের সহজ-দেখা কোনো মানুষের যে বিশেষ রূপটি লক্ষ্য ক'রে ছবির পটে তাকে ফুটিয়ে তোলে, আমরা সে আলেখ্য দেখে যদি মুগ্ধ নাও হই, অন্তত, অবাক্ বিস্ময়ে সেদিক পানে চেয়ে দেখে ভাববো যে,—এ মানুষটির এ মূর্ত্তি কবে যেন আমাদের চোখে একটিবার পড়েছিল। সে কবে—কে জানে? ঠিক মনে পড়ছে না, কিন্তু, দেখেছিলুম যে নিশ্চয়,—তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই, কেন না একে ত' একটুও আমাদের অপরিচিত ঠেকছেনা! আবার, অনেক সময় এমনও হয়—যে, শিল্পীর দেখা সেই মানুষের

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটুকু সর্ব্বপ্রথম দর্শকের চোখে ধরা পড়ে শিল্পীর আঁকা সেই ছবি দেখেই! আবার, হয় ত' আগে অনেকবার আমরা সেই মানুষটিকে দেখেছি, দূর থেকে দেখলেই তাকে চিনতে পারি, তার চলার ভঙ্গী, তার আকৃতির গঠন আমাদের খুব চেনা, কিন্তু, তার মুখের দিকে স্থির হ'য়ে অনেকক্ষণ ভালো করে চেয়ে দেখবার সুযোগ আমাদের কখনো হয়নি, কাজেই তার মুখের ঠিক স্বরূপ চেহারাও আমরা ভালো চিনিনা ;—এ সত্য কেবল তখনই বেশ বুঝতে পারি যখন তাকে আমরা—হঠাৎ একদিন একেবারে খুব কাছে পেয়ে তার মুখের দিকে ভালো ক'রে চেয়ে দেখবার অবসর পাই!

এই সুযোগটা ফিল্মে খুব' বেশী রকম কাজে লাগে. যখন 'Close-up' ছবি নেওয়া হয়, অর্থাৎ ক্যামেরা খুব কাছে নিয়ে গিয়ে কোনো বস্তু বা ব্যক্তি-বিশেষের বিশেষত্বটুকু খুব বড়ো করে ছবিতে তুলে দেখানো হয়। এই উপায়ের দ্বারা ছবির নায়ক নায়িকার সঙ্গে দর্শকদের যেন খুব একটা নৈকট্য বা সাযুজ্য স্থাপিত হয়, এবং, এই নৈকট্য বা সাযুজ্যর ফলে যে বস্তু বা ব্যক্তি ইতিপূর্ব্বে ছিল আমাদের চোখে সাধারণ ও বৈচিত্র্যহীন—তারই মধ্যে আমরা দেখতে পাই—যেন কী একটা অনাবিষ্কৃত রহস্য—একটা নূতনতর রূপ! চলচ্চিত্র-শিল্পীদের এ কথাও বরাবর মনে রাখা উচিত যে—ছবি—কোনো বস্তু বা ব্যক্তি বিশেষের হুবহু প্রতিকৃতি না হ'য়েও অবিকল তার প্রতিরূপ হ'তে পারে! ফটোগ্রাফ এবং আর্টে এইখানেই প্রভেদ!

কোনো ফিল্ম দেখে তার সমালোচনা করবার সময় যদি কেউ বলেন যে—'অমুক ছবিখানি আগাগোড়া অতি সুন্দর হ'য়েছে, নির্দ্দোষ হয়েছে বা নিখুঁত হয়েছে, তাহ'লে তিনি অত্যন্ত ভুল বলবেন, কারণ কোনো ফিল্মই সুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত আগাগোড়া নিখুঁত বা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আজ পর্য্যন্ত হয়নি—এবং কবে যে হবে তা'ও সঠিক বলা যায় না। তবে, অমুক ফিল্মখানি এ বৎসরের সব ছবিগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম এ কথা বলা চলে, কারণ, যে ছবির মধ্যে পরিচালকের শিল্প-প্রতিভা যতো বেশী দিক দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে, সে ছবি তত বেশী উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ হ'য়ে ওঠে! কাজেই, ছবির প্রধান কর্ণধার হ'চ্ছেন—যিনি সুপটু পরিচালক (Director)। তিনি—ক্যামেরাম্যান আলোকশিল্পী এবং অভিনেতৃবর্গের ভিতর দিয়ে নাট্যকারের স্বপ্নকে আপন কল্পনার রংয়ে ফুটিয়ে তোলেন ছবির পর ছবি সাজিয়ে তোলার নৈপুণ্যে! কবি ও সাহিত্যিক যে কাহিনী রচনা করে সুললিত ভাষায়, চলচ্চিত্র-শিল্পী সজীব ক'রে তোলে সে কাহিনীকে রূপের অপরূপ ঐশ্বর্য্যে।

১৯০৩ সালে প্রথম যে গল্পের চলচ্চিত্র দেখানো হ'ল "The Great Train Robbery" (ভীষণ রেল-ডাকাতী) সেটা দর্শকদের এত বেশী ভালো লেগেছিল যে সেদিন থেকে চলচ্চিত্রে রূপকথা গল্প উপন্যাস নাটক এমন কি কাব্য ও গীতিকবিতা পর্য্যন্ত রূপান্তরিত হ'তে সুরু হয়েছে। সেদিনের পরিচালকদের আদর্শ ছিল রঙ্গমঞ্চ। নাট্যশালার অভিনয়কে তাঁরা ছবির পর্দ্দার উপর টেনে নিয়ে এসে যে ভুল করেছিলেন সে ভুল আজও সম্পূর্ণরূপে ভাঙেনি। ১৯০৮ সালে Comedie Francaiseএর প্রসিদ্ধ অভিনেতৃবর্গকে 'Tartuff,' 'Phedre' প্রভৃতি কয়েকখানি জনপ্রিয় নাটকের নির্ব্বাচিত দৃশ্যাবলী ক্যামেরার সম্মুখে অভিনয় করবার

জন্য নিযুক্ত করা হ'য়েছিল। কারণ সে যুগে চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীদের ধারণা ছিল যে,—প্রসিদ্ধ নাটক ও বিখ্যাত নট নটীর সমাবেশে রঙ্গালয়ের মতো চলচ্চিত্রেও দর্শকদের আকৃষ্ট হ'তেই হবে। যশস্বী পরিচালক এডলফ্ জুকর (Adolf Zukor) এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হয়েই 'ফেমাস্ 'প্লেয়ার্স' নাম দিয়ে একটি চলচ্চিত্র সঙ্ঘ গড়ে তুলেছিলেন। এই কোম্পানী সাফল্য মণ্ডিত হ'য়ে উঠে এখন জগতের বৃহত্তম চলচ্চিত্র-প্রতিষ্ঠান হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এর নাম হয়েছে এখন "The Famous Players Lasky film Corporotion."

Comedie Francaise এর অভিনেতৃদের নিয়ে চলচ্চিত্রে নামানোর দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত য়ুরোপ ও আমেরিকায় এই প্রথাই চলে আসছে। যে নাটক যে প্রহসন যে গীতিনাট্য রঙ্গালয়ে অসামান্য সাফল্য অর্জ্জন ক'রে সর্ব্বজন প্রিয় হ'য়ে উঠছে, চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীরা অমনি তৎপর হ'য়ে বহু মূল্য দিয়ে তার 'ছায়াছবি' তোলবার অধিকার ক্রয় করে নিচ্ছেন। যে উপন্যাসখানি যখনি বিশ্বসাহিত্যের দরবারে সমাদর লাভ ক'রছে, অমনি তৎক্ষণাৎ সেখানি চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত করা হ'চ্ছে; তা' সে উপন্যাস বা গল্প ছবিতে তোলবার ও পর্দ্দায় ফেলে দেখাবার উপযোগী হোক্ বা নাই হোক্। রঙ্গমঞ্চে যে নটনটীরা একটু খ্যাতিলাভ ক'রছে, তা সে অভিনয়েই হোক্ বা নৃত্যেই হোক্ বা সঙ্গীতেই হোক্—অমনি তাকে চতুর্গুণ পারিশ্রমিক দিয়ে চলচ্চিত্রের 'প্রয়োগশালায়' (Studio) টেনে নিয়ে আসা হ'চ্ছে। বিশেষ করে আজকাল-কার সবাক্ ছবির 'প্রয়োগশালায়,' তাদেরই একাধিপত্য চ'লেছে! এমন কি নাট্যশালার বাইরেও যারা অন্যান্য নানা বিভাগে সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বিখ্যাত হ'য়ে পড়ছেন, চলচ্চিত্রওয়ালারা তাদেরও ছবির মধ্যে টেনে নিয়ে আসবার লোভ সম্বরণ ক'রতে পারছে না। তাদের মধ্যে শ্রীমতী এলিনোর গ্লিন্ (Elinor Glyn) এমী ম্যাক্ফার্সন্‌ও (Aimee Macpherson) আছেন, আবার বক্সিংয়ের ওস্তাদ্ জ্যাক্ ডেম্প্সী (Jack Dempsey) ও জর্জ্জ কারপেন্তিয়ারও (George Carpentier) আছেন! এমন কি ফুটবল খেলোয়াড় 'ফ্লিন্' (Flynn) এবং ঘোড়-দৌড়ের শ্রেষ্ঠ সোওয়ার্ ষ্টীভ্ ডনোঘুও (Steve Donoghue) বাদ যাচ্ছেন না! সে যুগে রঙ্গালয়ে অভিনীত নাটকগুলিই হ'য়ে উঠেছিল চলচ্চিত্রের প্রধান সম্বল! অভিনয়-ভঙ্গীও ছিল হুবহু নাট্যশালার অনুকরণে, কারণ নাট্যমঞ্চ থেকেই চলচ্চিত্রের জন্য অভিনেতা অভিনেত্রী বেছে নেওয়া হ'ত তখন, ঠিক যেমন আমাদের এখানেও চলেছে এখনো! যে রঙ্গমঞ্চে কখনো অভিনয় করেনি চলচ্চিত্রে তেমন লোককে নেওয়া হ'ত না! Acting বা অভিনয় কৌশল ভালোরকম জানা থাকলে তবেই সে হতে পারতো তখন 'ম্যুভি-ষ্টার্' !—অর্থাৎ, চলচ্চিত্রাকাশের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র!

আমেরিকা এই 'ষ্টার' গুলিকে আগে অনেক অর্থ দিয়ে নিয়ে যেতো নিজেদের চিত্র লোকে। আজকাল কিন্তু তাদের সেখানে রীতিমত 'ষ্টারের' 'চাষ' চলেছে! নিত্য নূতন 'ষ্টার' গজিয়ে উঠ্ছে তাদের হোলিউড্ আর লস্ এঞ্জেল্সের বুকে। ক্যামেরার পছন্দসই যে কোনো সুপুরুষ ও সুন্দরী মেয়ে, অর্থাৎ যাদের নাক চোখ মুখ এবং দেহের গঠন ছবিতে বেশ সুন্দর দেখায়—একটু আধটু নাটকীয় হাবভাব—অর্থাৎ 'থিয়েটারী ঢঙ্'ও আছে যাদের চলাফেরার মধ্যে এবং বিশেষ ভাবে যারা তাদের হাসিতে চাহনিতে ও লীলায়িত

ব্যাটলশিপ্ পোটেমকিন্—ওডেসার বিরাট
সোপান শ্রেণীর উপর তোলা
সঙ্কের একটি বিরাট দৃশ্য।

৪২

সোভিয়েট চলচ্চিত্র "অক্টোবর"

সোভিয়েট চলচ্চিত্রে জারের প্রাসাদ দৃশ্য—"অক্টোবর" ৪৪

মানানসই সজ্জা

বেমানান সজ্জা

অঙ্গভঙ্গীতে যৌন-লালসা উদ্দীপিত ক'রে তুলতে পারে—তারাই হ'য়ে উঠ্ছে চলচ্চিত্র-গগনের সুগণ্য গ্রহ-তারা।!

সে যুগে দর্শক আকর্ষণের জন্য ছবিতে এমন সব আজগুবী গল্প তাঁরা বেছে নিতেন, যাতে ক্যামেরার কারচুপিতে অসম্ভবও সম্ভব ক'রে তোলা যেতো! যেমন প্রকাণ্ড 'এক ষ্টীম রোলার' রাস্তার এক পুলিশ সার্জ্জেণ্ট্‌কে চাপা দিয়ে চলে গেলো, সেই প্রকাণ্ড ষ্টীম রোলারের প্রচণ্ড চাপে পুলিশ সার্জ্জেণ্ট একেবারে জিবে গজার মতো চ্যাপ্টা হ'য়ে গেলো—কিন্তু তবুও মরলোনা! চ্যাপ্টা সার্জ্জেণ্ট তার চ্যাপ্টা রূপ নিয়ে তখনি ধুলো ঝেড়ে আবার উঠে দাঁড়ালো! কিম্বা, বীর রাজকুমার অসি-চালনার সুকৌশলে ভীষণ দৈত্যকে কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো করে দিয়ে ঘুমন্ত রাজকুমারীকে দৈত্যপুরী থেকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে গেলো, কিন্তু, সেই মায়াবী দৈত্যের ছিন্ন-ভিন্ন দেহাংশ একে একে আবার পরস্পরের সঙ্গে জোড়া লেগে সেই ভীষণ দৈত্য আবার বেঁচে উঠ্‌লো এবং প্রতিহিংসা নেবার জন্য রাজপুত্রের পিছু নিলে—! ১৯০০ সালের আগে থেকেই ক্যামেরার কারচুপির গোড়া-পত্তন হ'য়েছিল এই সব ছবিতে, আজও তার বিরাম হয়নি। যেমন 'মিকি-মাউস্‌' (Mickey Mouse) Cartoon film বা কৌতুকচিত্র হিসাবে আজও মুখর চলচ্চিত্রের দর্শকদের পর্য্যন্ত আকৃষ্ট ও মুগ্ধ ক'রছে। কিছুদিন আগে Eisensteinএর রুষগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত প্রসিদ্ধ ছবি October'এ ক্যামেরার এই কারচুপি কাজে লাগানো হয়েছিল। রুষসম্রাট Czarএর গভর্ণমেণ্ট ধ্বংস হওয়ার প্রতীক্ স্বরূপ তাঁর বিরাট মর্ম্মর মূর্ত্তি মাটিতে পড়ে গিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেলো, কিন্তু, তৎপরিবর্ত্তে রুষিয়ায় কার্ণেস্কীর (karneskey) অস্থায়ী শাসন-পরিষদ গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই ভগ্ন মূর্ত্তির প্রত্যেক চূর্ণখণ্ড পরস্পর জোড়া লেগে আবার খাড়া হ'য়ে উঠ্‌লো, যেন 'জারে'র শাসনেরই নামান্তর রূপ কার্ণেস্কীর গভর্ণমেণ্টকে উপহাস করবার জন্য! ডগলাস্‌ ফেয়ার ব্যাঙ্ক্‌সের ছবি "The Thief of Bogdad" (বোগদাদের চোর) ফিল্‌মখানিতে এই ক্যামেরার কারচুপি খুব বেশী মাত্রায় দেখানো হয়েছে।

এই ধরণের সব ক্যামেরা-কৌশল দর্শকের মনে একটা বিশেষ কৌতূহল জাগিয়ে তোলে এইজন্য যে, তারা নিশ্চিত জানে যে এটা অসম্ভব, এ রকমটা বস্তুতঃ কখনো হ'তেই পারে না, তবু—সেই ব্যাপারই তাদের চোখের সামনে প্রত্যক্ষ ঘটছে দেখে তারা বেশ আমোদ অনুভব করে। মানুষের মনকে এই অবস্থায় নিয়ে এসে অর্থাৎ এমনি ভাবে আশ্চর্য্য ক'রে দিয়ে ভোলানো চলচ্চিত্র সৃষ্টি হবার আগে অন্যবিধ প্রমোদ ব্যবসায়ীদের মধ্যেও ছিল, যেমন ম্যাজিক্—ইন্দ্রজাল—ইজীপ্সিয়ান ব্ল্যাক-আর্ট প্রভৃতি।

চলচ্চিত্রে দর্শকদের মনকে মাতিয়ে তোলবার আর একটা প্রধান উপায় হ'চ্ছে গতির প্রতিযোগিতা; অর্থাৎ পলায়ন, পশ্চাদ্ধাবন, ছুটে গিয়ে পলাতককে বন্দী করা বা আততায়ীকে উদ্ধার করা, নির্দ্দিষ্ট সময়ে কোথাও গিয়ে পৌঁছানো, ইত্যাদি! এ সব ব্যাপারে পায়ে হেঁটে ছোটা থেকে সুরু ক'রে ঘোড়ার পিঠে, সাইকেলে, মোটরকারে, মোটর বাইকে, ট্রেনে, ষ্টীমারে, উড়ো জাহাজে, সব রকম যান-বাহনেই ছোটাছুটী দেখানো হয়! এই ছোটাছুটীর উত্তেজনা দর্শকদের মনকেও উত্তেজিত ক'রে তোলে; গল্পের কথা ভুলে গিয়ে দর্শকের মন এই

গতির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তন্ময় হয়ে উঠে। কাজেই Scenario বা 'চিত্রনাট্য' লেখকেরা প্রায়ই তাঁদের গল্পে এই সুযোগটুকু নেবার লোভ সম্বরণ ক'রতে পারেন না। এ সব ছবিতে যত রকম সস্তার উত্তেজনা, খেলো বিস্ময় ও নিম্নশ্রেণীর হাস্যরসের অবতারণা করা হ'ত। এ সব ছবিতে না-ছিল 'টেম্পো', (Tempo) না ছিল নট নটীর উচ্চ অঙ্গের অভিনয়! পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সাজসরঞ্জাম প্রভৃতির দিকেও লক্ষ্য ছিলনা, এমন কি ফিল্‌ম্ editing অর্থাৎ চিত্রের সম্পাদন কার্য্য, যে ভার যোগ্য লোকের হাতে পড়লে ছবিখানিকে সকল দিক দিয়ে সুন্দর ক'রে ও নূতন ক'রে সৃষ্টি ক'রতে পারে—তারও বিশেষ কোনো সুব্যবস্থা ছিলনা।

১৯২০ সালে প্রথম একখানি ছবি ও-পারের পর্দ্দার উপর দেখতে পাওয়া গেছলো যা' চলচ্চিত্ররাজ্যের গতানুগতিক পথ ছেড়ে এক নূতন রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল। সে ছবিতে ছিল কল্পনার ঐশ্বর্য্য, ভাবের মাধুর্য্য ও সৃষ্টির বৈচিত্র্য! সে ছবি সঙ্গে এনেছিল শিল্প জগতের এক অভিনব সম্পদ, কলা-নৈপুণ্যের এক নবীন পরিচয়, যা গ্রিফিথ্ প্রভৃতি বড় বড় চলচ্চিত্র-পরিচালকেরা কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারতোনা! ফিল্‌মের রাজ্যে গ্রিফিথের দান অবশ্য ছোট নয়; যদি শিল্পের দিক দিয়ে ফিল্‌ম আজ কিছুমাত্র উন্নতির পথে এগিয়ে থাকে তবে সেটুকুর জন্য তাকে চিরদিন গ্রিফিথের কাছে ঋণ স্বীকার ক'রতেই হবে, কারণ গ্রিফিথই সেই প্রথম চলচ্চিত্র পরিচালক যিনি তাঁর নিজের চোখের সঙ্গে ক্যামেরার দৃষ্টিকেও মেলাতে পেরেছিলেন এবং নিজের ধ্যানের ছবিকে রূপায়িত ক'রে তুলতে পেরেছিলেন। 'সাযুজ্য' 'বিলয়' 'অন্তর্দ্ধান' ও 'বিকাশ' প্রভৃতি ফরাসী চিত্রকর জর্জ্জ সেলিজের আবিষ্কৃত কলা-কৌশলের চিত্রজগতে তিনিই প্রথম সুব্যবহার ক'রেছিলেন; কিন্তু এ সব সত্বেও গ্রিফিথের কোনো ছবিই শিল্পের দিক দিয়ে সে আভিজাত্য দাবি ক'রতে পারেনা যা ডাঃ রবার্ট হ্বীয়েনের (Dr. Robert wiene) জার্ম্মাণ ফিল্‌ম্—"The Cabinet of Doctor Caligari" শীর্ষক ছবিখানি দাবি ক'রতে পারে। তারপর পাঁচ-বৎসর আর কোনো ছবি এর সমকক্ষ হ'তে পারেনি; পাঁচবৎসর পরে অর্থাৎ ১৯২৫ সালে সোভিয়েট্ ফিল্‌ম "The Battleship Potem-kin" এসে এই ছবিখানির সঙ্গে সমান আসন দাবি ক'রতে পেরেছিল।

বার্লিন থিয়েটারের Decla প্রোডিউসিং কোম্পানীর পক্ষ থেকে ১৯১৯ সালে ডাঃ হ্বীয়েন "The Cabinet of Doctor Caligari" ছবিখানির পরিচালন ভার গ্রহণ করেছিলেন। এই সময় য়ুরোপের শিল্পরাজ্যে কিউবিজম্ (Cubism) ফলকাঙ্ক পদ্ধতি, Impressionism—অভিভাবন পদ্ধতি—Expressionism, অনুভাবন পদ্ধতি' ও উত্তর কলা (Futurist) প্রভৃতি অতি আধুনিক কলাবিধির প্রচলন সুরু হ'য়েছিল। ১৯২০ সালের মার্চ্চমাসে "The Cabinet of Doctor Caligari) চিত্রখানি শেষ হ'য়ে পর্দ্দার উপর এসে পড়েছিল। Dr. Wiene নিজে তখন Expressionismএর একান্ত অনুরাগী ছিলেন। চলচ্চিত্র পরিচালনা সম্বন্ধে তাঁর কোনো অভিজ্ঞতাই ছিলনা। এই ছবিখানি তোলবার সময় তাঁর যে তিনজন সহকারী ছিলেন—Walther Rohrig, Herman Warm ও Walther Reimann তাঁরা তিনজনেই 'কিউবিজ্‌মের' ভক্তশিল্পী।

Abstract Art অর্থাৎ অবিমিশ্র শিল্প বা খাঁটি 'কলা সৌন্দর্য্যের' অনুরাগী তাঁরা, কাজেই চলচ্চিত্র পরিচালনে নেমে তাঁরা যে গতানুগতিক্ পথে না গিয়ে নিজেদের শিল্প-প্রতিভার দ্বারা সচল ছবির একটা নূতন রূপ সৃষ্টি করবেন এটা খুবই স্বাভাবিক।

ক্যামেরার চক্ষুতে যে কেবল হুবহু বাস্তবের ছায়াটুকুই ধরা পড়ে না, পরিচালকের ইচ্ছামত এই যন্ত্রের চোখও যে স্বপ্ন-ভাবাতুর হ'য়ে উঠতে পারে, চলচ্চিত্রও যে কঠিন বাস্তবের প্রতিরূপ না হ'য়ে শিল্পীর ধ্যানের মূর্ত্তিও পরিগ্রহ করতে পারে, সে যে কল্পনার বস্তু এবং শিল্পীর সৃষ্টি ব'লেও পরিগণিত হ'তে পারে,—অলোকচিত্র হ'লেও তার প্রাণময় নাটকীয়তা যে অক্ষুণ্ণ রাখা যায় এবং জীবনের বাহ্যিক রূপ ছাড়া মানুষের মনস্তত্বের অভিব্যক্তিও যে চলচ্চিত্রে প্রকাশ করা অসম্ভব নয়, এসব নূতন তত্বের সন্ধান The Cabinet of Doctor' Caligari" ছবিখানিই চিত্রজগতে সর্ব্বপ্রথম এনে উপস্থিত ক'রেছিল।

আরও একটু বিশদভাবে এ ছবিখানির সম্বন্ধে আলোচনা ক'রলে বোধ হয় চলচ্চিত্রের শিল্পের দিক ব'লতে কী বোঝায় তা পাঠকদের সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হ'তে পারে। "The Cabinet of Doctor Caligari" ছবির চিত্রনাট্য রচনা ক'রেছিলেন—Karl Mayer ও Hans Janowitz দুজনে মিলে। গল্পটি একটা পাগলা গারদের অধ্যাপককে নিয়ে। গল্পের প্রতিপাদ্য বস্তু এবং তার পরিকল্পনা সম্পূর্ণ অনন্যসাধারণ। গল্প বলার ভঙ্গীটিও অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক! এ ফিলম্‌খানির বিশেষত্বই হ'চ্ছে যে, গল্পটি যেমন ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'তে থাকে, দর্শকদের আগ্রহও তেমনি সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে! অন্য কোনো বাজে ব্যাপার দিয়ে বা সস্তার উত্তেজনা সৃষ্টি ক'রে দর্শকদের ভোলাবার চেষ্টা করা হয়নি। পরিচালক Dr. Weine এ ছবির পট-ভূমিকায় বাস্তব দৃশ্যপটের আমদানি করেন নি। কেবলমাত্র প্লেন ক্যানভাস্ এবং সাধাসিধে স্ক্রীনের সাহায্য নিয়েছেন। সরঞ্জামের মধ্যে তিনি এমন সব জিনিসপত্র ব্যবহার করেছেন যা পাগলের চোখেই ভালো লাগতে পারে! অর্থাৎ, তিনি তাঁর প্রত্যেক দৃশ্যে একজন পাগলের নিবাসের আবহাওয়া সৃষ্টি করবার চেষ্টা ক'রেছেন এবং তাতে সম্পূর্ণ সফলকামও হ'য়েছেন। প্রকৃত শিল্পীর মত তিনি আর একটা কৌশলও এতে দেখিয়েছেন—বর্ণ বৈচিত্র্যের লীলা! বিভিন্ন রংয়ের সমাবেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে চিত্রের সৌন্দর্য্য যে কতখানি বাড়তে পারে, তার পরিচয় পাওয়া যায় এ ছবিখানির প্রত্যেক দৃশ্যে! তিনি এমনভাবে ঘটনার দিকে লক্ষ্য রেখে দৃশ্যগুলিকে সাজিয়েছেন, যাতে নাটকের ও অভিনয়ের অর্থ সহজেই দর্শকদের হৃদয়ঙ্গম হ'তে পারে। যেমন দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে ঘরের মেঝেয় তিনি মোটামোটা লম্বা লম্বা কালো সাদা লাইন আঁকিয়ে নিয়েছেন, এর ফলে ঘরের যেখানে যে বস্তু বা যে ব্যক্তি থাকবে দর্শকের পরিপূর্ণ দৃষ্টি সেই দিকেই আকৃষ্ট হ'তে বাধ্য হবে। পাগলা গারদের ভিতরের দেয়াল কেবল কতকগুলি উঁচু লম্বা সরু ও বিবর্ণ প্রাচীর এমনভাবে সাজিয়ে দেখানো হ'য়েছে যাতে সহজেই মনের উপর একটা অসাড় ঔদাসীন্যের ভাব জেগে ওঠে! অফিসের টাউন-ক্লার্কের জন্য তিনি একেবারে ছ'ফুট উঁচু একখানি টুল ব্যবহার ক'রেছেন, এর ফলে সে দৃশ্য দেখলেই বোঝা যাবে যে এই টাউন-ক্লার্ক প্রভুটি নিজেকে মস্ত একটা লোক ব'লে মনে করেন;

সহজে কেউ তাঁর কাছে এগুতে পারেনা,—এবং তিনিও কারুর দিকে চট্ করে দৃক্পাত করেন না! এমনিতর নানান খুঁটিনাটির ভিতর দিয়েই Dr. wiene ছবিখানির অর্থ ও পাত্রপাত্রীর চরিত্র পরিস্ফুট ক'রে তুলতে চেষ্টা করেছেন। একেই বলে যথার্থ Artistic Direction! শিল্পের দিক দিয়ে চলচ্চিত্র সেই দিনই যথার্থ উন্নতি লাভ ক'রতে পারবে যেদিন Dr. wieneর মত কলাভিজ্ঞ পরিচালকেরা প্রত্যেক ব্যাপারে মাথা ঘামিয়ে তাঁদের শিল্প প্রতিভার পূর্ণ ব্যবহার ক'রতে পারবেন।
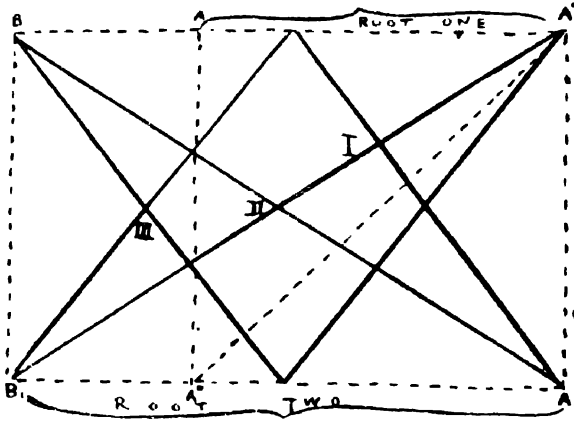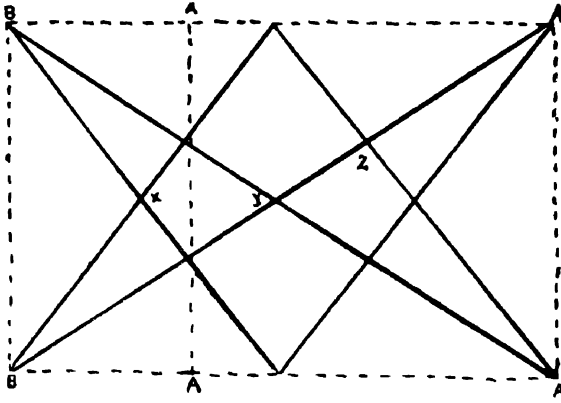
গতির অনুকূল রেখা ও সামঞ্জস্যাঙ্কনের নক্সা—গতির অনুকূল রেখা I বা X প্রথম ও প্রধান আকর্ষণস্থল II বা Y দ্বিতীয় আকর্ষণ স্থল III বা Z তৃতীয় আকর্ষণস্থল। ৪৬
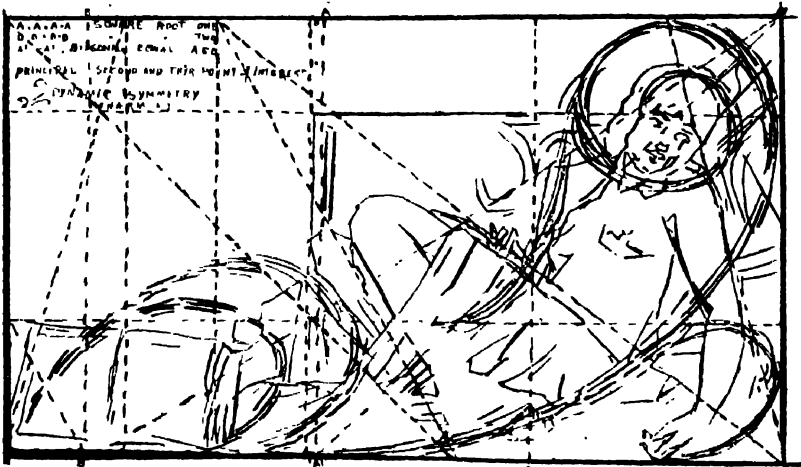
জ্ঞানদেবী—নক্সায় তোলা জ্ঞানদেবীর চিত্র ৪৭

জ্ঞানদেবী—(দর্শকদের দৃষ্টি দেবীর মুখের দিকে আকর্ষণ করা হয়েছে) ৪৮

জ্ঞানদেবী—(দর্শকদৃষ্টি দেবীর জ্ঞানভাণ্ডার গ্রন্থখানির দিকে আকর্ষণ করা হয়েছে) ৪৯

চলচ্চিত্রের দৃশ্যরচন-রীতি

ছবি দেখতে সুন্দর হয়, তার composition বা সংযুতির গুণে; অর্থাৎ, একখানি ছবিতে যা কিছু দ্রষ্টব্য থাকে সেগুলিকে এমন ভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা দরকার, যাতে সমস্ত ছবিখানি দেখতে বেশ শোভন বা সুদৃশ্য হ'য়ে ওঠে। ছবিকে সুদৃশ্য ক'রে তোলা চলচ্চিত্র শিল্পের একটা প্রধান প্রয়োজনীয় অঙ্গ। কারণ ছবির সাফল্য অনেকখানি নির্ভর ক'রে এই সাজানোর কৌশলেরই উপর। পূর্ব্বেই বলেছি যে আলোকচিত্র কেবলমাত্র বাস্তবের অবিকল প্রতিকৃতি হ'লে চল্‌বেনা। নটনটীর অভিনয়াংশ তোলার সঙ্গে সঙ্গে আলোকচিত্রে গল্প-লেখকের বক্তব্য এবং প্রয়োগ-শিল্পীর ও পরিচালকের স্বপ্ন ও কল্পনাকেও ফুটিয়ে তুলতে হবে। এ কাজ সুসম্পন্ন করবার সহজ উপায় হ'চ্ছে composition বা সংযুতি পদ্ধতির প্রতি অবহিত হওয়া এবং সেদিকে আগাগোড়া সতর্ক দৃষ্টি রাখা।

লেখক, পরিচালক ও নটনটীর কাজের সুসমন্বয় ঘটিয়ে তোলাই হ'চ্ছে আলোক-চিত্রকরের কৃতকার্য্য হবার সুনির্দ্দিষ্ট পথ। কারণ, এই তিনটির সহযোগেই চিত্রের গল্পটি গ'ড়ে ওঠে এবং সজীবও হয়। যেখানে এই ত্রিবিধ সম্মিলন ঘটেনা, সেখানে ছবিখানি আর যাই হোক সুন্দর ও সুদৃশ্য যে হয়না এ একেবারে সুনিশ্চিত। আমাদের বাংলা ছবিগুলি এর ·প্রকৃষ্ট উদাহরণ! সুতরাং চিত্রের সংযুতি বা দৃশ্যরচন রীতিটা প্রত্যেক অলোক- চিত্র-শিল্পীর সর্ব্বাগ্রে জেনে রাখা দরকার। জগতের একাধিক শ্রেষ্ঠ শিল্পীর তুলি দিয়ে আঁকা অসংখ্য জড়-ছবিরও (Still Pictures) জন-প্রিয়তার একটা বিশেষ কারণ হ'চ্ছে তাঁদের চিত্রের এই composition বা সংযুতিতে তাঁরা অসাধারণ নৈপুণ্য দেখাতে পেরেছেন। মনে রাখা দরকার যে চলচ্চিত্রও ছবি, অতএব এর সাফল্যও নির্ভর করে ঐ সংযুতি বা দৃশ্যরচন-কৌশলের উপর।

চলচ্চিত্রের সুদক্ষ শিল্পী হ'তে হ'লে এই সংযুতি বা দৃশ্যরচন-পদ্ধতি ছাড়া তাঁকে আলোক ও ছায়ার (Light & Shade) তারতম্যের উপযোগিতা ও বিভাগ-কৌশল এবং তাঁর ক্যামেরা বা ছায়াধর যন্ত্রটির সর্ব্বপ্রকার ব্যবহার-নৈপুণ্যও শিখতে হবে। দৃশ্যরচন-পদ্ধতির আবার নানা রকম প্রকার-ভেদ আছে, কারণ, পূর্ব্বেই বলেছি এ জিনিসটা আজকের কোনো নূতন আবিষ্কার নয়, ছবি যেদিন থেকে উচ্চ অঙ্গের একটা শিল্প বলে স্বীকৃত হয়েছে সেদিন থেকেই চিত্রে এই দৃশ্যরচন রীতির প্রচলন হয়েছে। বহু প্রাচীন চিত্রের মধ্যেও এই সংযুতির দক্ষতা পরিলক্ষিত হয়। কে যে প্রথম এ তত্ব আবিষ্কার ক'রেছিলেন, তার সঠিক খবর জানা যায় না; তবে, তিনি যিনিই হোন্, তাঁর শিল্প-প্রতিভার অনন্ত-সাধারণত্ব স্বীকার না ক'রে উপায় নেই।

বর্ত্তমান শিল্প-বিজ্ঞান সপ্রমাণ করেছে যে, কি পটে আঁকা ছবি, কি চলচ্চিত্র বা অন্য চিত্র, সব কিছুই দেখবার সময় সাধারণতঃ আমাদের দৃষ্টি সর্ব্বপ্রথম গিয়ে পড়ে ছবির নীচেকার বাঁ-দিকের কোণে, তারপর সেখান থেকে আমাদের দৃষ্টি ক্রমে সরে সরে উপর দিকে উঠ্‌তে থাকে, যে পর্য্যন্ত না একটা কিছু দ্রষ্টব্য বস্তুর উপর গিয়ে আবদ্ধ হয় বা অন্য কোনো কিছুতে আকৃষ্ট হয়। এই সব বস্তু বা দ্রষ্টব্য বিষয় গুলিকে ঠিক যথাযথ স্থানে সাজিয়ে রাখার কৌশলের মধ্যেই দৃশ্যরচন-রীতির গুহ্যতত্ত্ব নিহিত রয়েছে।

চলচ্চিত্রে এমন ভাবে একখানি ছবির দৃশ্য সাজানো যেতে পারে যাতে দর্শকের দৃষ্টিকে শিল্পী তাঁর ইচ্ছামত ছবির যে কোনোও একটি দিকের কোনো বিশেষ স্থানে আকৃষ্ট করতে পারেন এবং সেখানে আবদ্ধ রাখতেও পারেন, অথচ সে সময় সেই ছবিরই অন্যদিকে হয়ত অনেক কিছু ব্যাপার ঘট্‌ছে, কিন্তু, দর্শক সেদিকে বেশী মনোযোগ দিতে চাইবেনা! এই যে দর্শকের দৃষ্টিকে নিজের ইচ্ছামত ছবির যে কোনো অংশে টেনে নিয়ে যাওয়া এবং কেবলমাত্র নিজের অভীষ্ট যে কোনোও বস্তু বা বিষয়ের উপর তাদের দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখতে পারার কৌশল ও নৈপুণ্য—এইটুকুই হ'চ্ছে নিপুণ আলোক-চিত্রকরের প্রধান বিশেষত্ব। এইখানেই যিনি দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন, তিনিই হ'য়ে ওঠেন 'পাকা-খেলোয়াড়'! আর, যিনি এসব বোঝেনও না, পারেনও না, তিনি বরাবরই এ লাইনে আনাড়ী ও কাঁচা লোক ব'লেই বিবেচিত হবেন। ছবির ঘটনাবলী অনেক সময় এই দৃশ্যরচন-রীতির দোষেই জটিল ও দুর্ব্বোধ হ'য়ে ওঠে, কিন্তু, দৃশ্যরচন-কৌশল যে জানে, তার হাতে পড়লে যে কোনো ছবি যেন আপনি কথা কয়! চিত্রিত বিষয় খুবই সরল ও সহজবোধ্য হয়ে ওঠে।

পূর্ব্বেই বলেছি এই দৃশ্যরচন-কৌশল প্রয়োগ করবার অসংখ্য উপায় শক্তিশালী শিল্পীর হাতের মুঠোর মধ্যেই থাকে। যে যত বেশী সেগুলিকে নিপুণভাবে কাজে লাগাতে পারে সেই তত বেশী দক্ষতার পরিচয় দেয়! একটা কোনো আভ্যন্তরীণ দৃশ্যে (Interior scene) যে Set বা পৃষ্ঠপট ব্যবহার হয় তা'তে—সেই পট-ভূমিকার পরিকল্পনা থেকে আরম্ভ করে সব কিছু সাজসরঞ্জাম ও আস্‌বাবপত্র ব্যবহারের ভিতর দিয়ে সে ছবিতে শুধু সুরুচি ও সৌন্দর্য্য ফুটিয়ে তোলাই শিল্পীর একমাত্র কাজ নয়—গল্পের প্রতিপাদ্য ব্যাপারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পাত্র-পাত্রীর চরিত্র ও প্রকৃতিগত বিশেষত্বের দিকটাও যাতে পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে সেদিকেও তাঁর সতর্ক ও সযত্ন দৃষ্টি রাখা দরকার।

একজন রাসায়নিকের পরীক্ষাগার, একজন নৃ-তত্ত্ববিদের অনুসন্ধান-কক্ষ, বা একজন প্রত্ন-তাত্ত্বিকের গবেষণা-গৃহ সাজানো হয়ত খুব সহজ; কিন্তু, একজন দার্শনিকের ঘর কিম্বা উন্মাদের কক্ষ কী ভাবে সাজানো উচিত, এ সম্বন্ধে আলোক-চিত্রকরকে অনেক ভাবতে হয়। রসায়নতত্ত্ববিদ্, নৃ-তত্ত্ববিদ্ বা প্রত্ন তাত্ত্বিকের সাজ-পোষাকের মধ্যে তেমন কোন বিশেষত্ব নেই—বিশেষত্ব শুধু তাদের পরস্পরের কার্য্যালয়ের। একজনের শিশি-বোতল ও 'টেষ্ট্-টিউব' নিয়ে কারবার, একজন কঙ্কালের পূজারী, আর একজন প্রাচীন প্রস্তর-মূর্ত্তি ও স্থাপত্যের মধ্যে নিমগ্ন; কিন্তু একজন দার্শনিক অথবা কোনো উন্মাদের বাসগৃহ দেখাতে গেলে আস্‌বাবপত্রের সাহায্য অতি সামান্যই পাওয়া যাবে। এখানে চিত্রের সাফল্য নির্ভর করবে
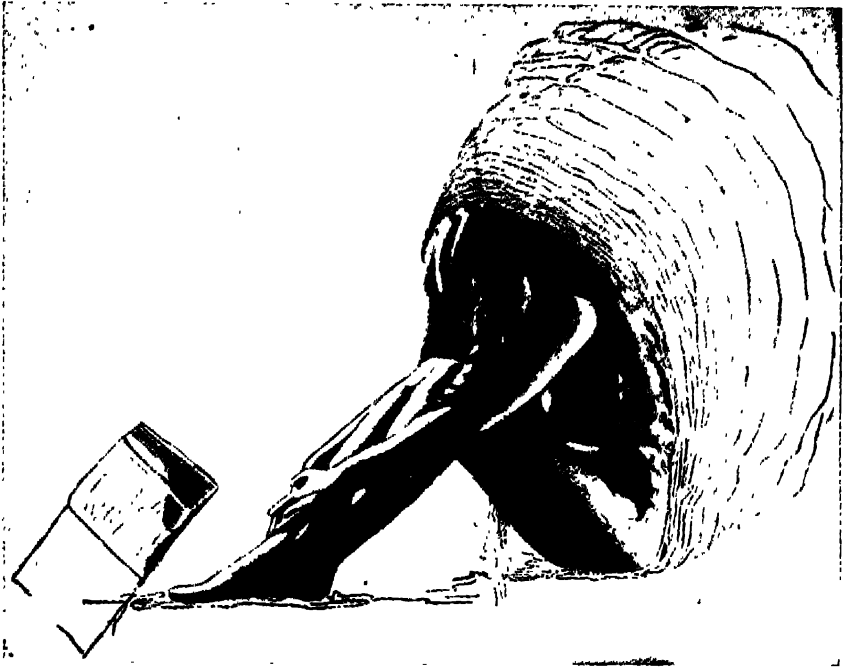
কাল ও দীপশিখা—(দর্শকদৃষ্টি মূর্ত্তির পানে আকৃষ্ট হবে ৫০

কাল ও দীপশিখা—(দর্শকদৃষ্টি কোলের পুঁথির পানে আকৃষ্ট হবে) ৫১

আপেল খাওয়া—(দর্শকদৃষ্টি দন্তরুচির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে) ৫২

বনভোজন—(দৃশ্যরচন কৌশলের গুণে, তৈজসপত্রগুলি রাখার মধ্যে একটি শোভন সামঞ্জস্য সাধিত হয়েছে) ৫৩

অভিনেতার রূপসজ্জা ও নাট নৈপুণ্যের উপরই সব চেয়ে বেশী! তাদের সেই রূপসজ্জা ও অভিনয় কৌশলকে সুসম্পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ক'রে তোলাই—হওয়া উচিত তখন আলোক-চিত্রকরের সর্ব্বপ্রথম লক্ষ্য। এটা নিপুণতার সঙ্গে নিষ্পন্ন হতে পারে প্রধানতঃ ছবিখানিতে প্রয়োজনমত আলো-ছায়ার পরিবেষণ পটুতায়। আস্‌বাব-পত্রের সাহায্যও কিছু কিছু নেওয়া যেতে পারে, যদি সে আলোক-চিত্র-শিল্পী তার ব্যবহার সম্বন্ধে সুদক্ষ হ'ন। একখানি ইজিচেয়ার, একটি নস্যদান কিম্বা গড়গড়া, অত্যন্ত সাদাসিধা একটি শয্যা একধারে, খানকয়েক মোটা দর্শন শাস্ত্রের বই, একটি উজ্জ্বল আলোকাধার, একটি এলার্ম ঘড়ী, একটি ছোট্ট ষ্ট্যাণ্ড, চায়ের পেয়ালা পিরিচ, খাতা কলম কাগজ ও একটি 'লাল-নীল' পেন্সিল —এই আস্‌বাব-পত্রগুলি দার্শনিকের ঘরে হয়ত' রাখা যেতে পারে; কিন্তু, শুধু ওগুলো রাখলেই তো হবে না, ওগুলিকে এমনভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে হবে যাতে দার্শনিকের ঘরখানি কেবল মানিয়ে যাওয়াই নয়, লোকটিকে দেখলেই বোঝা যাবে যে আমরা একজন দার্শনিকের সাক্ষাৎ পেলুম! ওই সব আসবাবপত্রের যথাযোগ্য সমাবেশে এমন একটা পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন গড়ে উঠবে সেই ঘরের মধ্যে, যে, সে ছবি দেখ্‌বামাত্র দর্শকদের মনে একটা দার্শনিকতার আবহ এসে ছোঁয়া দেবে! এইখানেই দৃশ্য-রচন-কৌশলের সার্থকতা এবং আলোক-চিত্রকরের কৃতিত্ব।

বহির্দৃশ্যের (Exterior Scene) সংরচনে প্রাকৃতিক সম্পদ শিল্পীর প্রচুর পরিমাণে সাহায্য করে। তরু, লতা, নদী, গিরি, মরু, প্রান্তর, ঘনবন, জীর্ণগৃহ, প্রাসাদ, তোরণ, কুটীর-প্রাঙ্গণ এসব ত' আছেই, তা' ছাড়া কৃত্রিম ফল-ফুলের গাছ, শিক্ষিত জীবজন্তু ও পশুপক্ষী, কৃত্রিম পাহাড় ও হ্রদ প্রভৃতি অনেক কিছুর সাহায্য নিতে পারা যায়। এর উপর আবার ক্যামেরার নানারকম কারচুপিও তিনি কাজে লাগাতে পারেন। কৃত্রিম আলোক-পাতের সুযোগও তাঁর থাকে।

পরিচালক নটনটীকে কোন্ দৃশ্যে কী করতে হবে এবং কী বলতে হবে যখন ব'লে দেন, তখন আলোক-চিত্রকর সেটি ভালো ক'রে শুনে নিয়ে সেই দৃশ্যটি সংরচনের ভার নেন, কারণ, এ কাজটি সম্পূর্ণরূপে আলোক-চিত্রকরের উপরই নির্ভর করে। অভিনেতৃরা অভিনয় ক'রছেন, পরিচালক মহাশয় তাঁদের গতিবিধি ও ভাবাভিব্যক্তি দূর থেকে নির্দ্দেশ ক'রে দিচ্ছেন, কিন্তু, তাঁদের সে গতিবিধির ও ভাবভঙ্গীর ছবি এঁকে নিচ্ছে কে? চলচ্চিত্রের প্রকৃত শিল্পী কে?—তুলি ও রংয়ের পরিবর্ত্তে ছায়াধর যন্ত্রের সাহায্যে আলোক-চিত্রকরই সে ছবি তুলে নেয়! সেই এ-কাজের একমাত্র 'সুপটু পটুয়া!' সুতরাং শ্রেষ্ঠ বা উচ্চ অঙ্গের চলচ্ছবি তোলবার দুরাকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন যে প্রতিভাবান পরিচালক, তাঁকে সর্ব্বাগ্রে সংগ্রহ করতে হবে এমন একজন আলোক-চিত্রকর যার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ শিল্প জ্ঞান ও কলারস-বোধ আছে।

প্রথমে লেখক তার সাধ্যমত একটি উৎকৃষ্ট গল্প রচনা করে আনেন, প্রযোজক সেই গল্পটি প'ড়ে দেখে যদি বোঝেন যে—হ্যাঁ, ছবিতে এ গল্পটি খুব ভালোই ফুটবে এবং এর মধ্যে দর্শক আকর্ষণের মালমশ্‌লাও যথেষ্ট পরিমাণে আছে, সুতরাং লাভবান হবার সম্ভাবনাও

বর্ত্তমান, তখন তিনি সে গল্পটির সর্ব্বস্বত্ব কিনে নেন। তারপর, তিনি আবার সে গল্পটিকে নাট্যরূপ দেবার জন্য বেতনভোগী চিত্রনাট্য-রচয়িতার কাছে উপস্থিত করেন এবং সেই সঙ্গে ছবিখানির সম্বন্ধে তিনি যা যা ভেবেছেন এবং তাঁর মাথায় যে সব কল্পনা এসেছে তাও সেই নাট্য-রচয়িতার গোচর করেন। চিত্র-নাট্য-রচয়িতা তখন সেই গল্পটিকে ছবির ছাঁচে ঢালাই ক'রে তাতে প্রযোজকের কল্পনার ঐশ্বর্য্যটুকু এবং আপন মনের রূপ-রসের সমস্ত মাধুরী মিশিয়ে দেন। তার পর সেটি গিয়ে পৌঁছয় পরিচালকের হাতে। পরিচালক আবার তার মধ্যে নিজের প্রতিভা-স্ফূরিত ও অভিজ্ঞতা-লব্ধ বহু বৈচিত্র্য সন্নিবিষ্ট ক'রে সেখানিকে একটি সুসম্পূর্ণ চিত্র ক'রে তোলেন। অর্থাৎ, প্রকৃত পক্ষে সে গল্পটি হ'য়ে ওঠে তখন শুধু অসংখ্য ধারাবাহিক চিত্রের নক্সা—যা' সর্ব্বশেষে আলোক-চিত্রকর তাঁর ক্যামেরায় গেঁথে তোলেন। কিন্তু, তার আগে পরিচালক সেই চিত্র-নাট্যের ভূমিকা নির্ব্বাচন ক'রে তাঁর অধীনস্থ নটনটীদের মধ্যে যথাযোগ্য লোককে তা' বিতরণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে গল্প-লেখক, প্রযোজক, চিত্র-নাট্যকার ও তাঁর নিজের ঐক্যমতের উপযোগী দৃশ্যপটের পরিকল্পনা আঁকবার ভার দেন শিল্পীর উপর। নির্দ্দিষ্ট ভূমিকা অভিনয়ের জন্য নির্ব্বাচিত নটনটীরা ইতিমধ্যে তাদের অভিনেয় চরিত্রগুলির ধ্যান-ধারণা এবং প্রত্যেক চরিত্রটি পরিস্ফুট করে তোলবার জন্য মহলা দিয়ে অভিনয় ও রূপসজ্জার কি ঔৎকর্ষ সাধন করা যেতে পারে সে বিষয়ে চিন্তা ক'রতে থাকেন। তারপর ডাক পড়ে আলোক-চিত্রকরের!

অতএব দেখা যাচ্ছে যিনি ক্যামেরার পিছনে আছেন শেষরক্ষার ভার ও দায়িত্ব সবটাই তাঁর! তিনি গল্প পেলেন—গল্পের ভিতর গল্প লেখকের কল্পিত ছবি পেলেন, প্রযোজকের নিকট দর্শক আকর্ষণোপযোগী 'প্যাঁচের' সন্ধান পেলেন, চিত্র-নাট্যকারের রচিত ছায়ালিপিতে তিনি চিত্র-বিবৃতি বা চিত্র-পরিচয় পেলেন, পরিচালকের পরিকল্পনায় সে ছবি যে "রূপ" নেবে তার প্রতিচ্ছবি ও দৃশ্যপট প্রভৃতি পেলেন এবং অভিনেতৃবর্গের মানসপটে আঁকা চরিত্র-চিত্রগুলিও পেলেন। এখন, এই এতগুলি মনের কল্পিত স্বপ্নকে বাস্তবে রূপান্তরিত করা, তাদের ধ্যানের ছবিকে সজীব ও প্রত্যক্ষ ক'রে তোলার কঠিন কার্য্যভার গিয়ে পড়ে চলচ্চিত্রের আলোক চিত্রকরের উপর! তিনি যদি যোগ্যতার সঙ্গে তাঁর এই কঠিন কার্য্যভার সুসম্পন্ন ক'রতে না পারেন তাহ'লে সেই গল্প-লেখক থেকে সুরু ক'রে প্রযোজক, চিত্রনাট্যকার, পরিচালক, কলানায়ক (Art Director) ও নট-নটীগণ সকলেরই সমবেত চেষ্টা উদ্যম ও পরিশ্রম একেবারে পণ্ড হ'য়ে যাবে। সুতরাং চলচ্ছবিতে আলোক-চিত্রকরের দায়িত্ব সবচেয়ে গুরুতর। বিশেষ, আবার যে আধারে বা প্রচ্ছদের উপর তাঁর পটের ভিত্তি নির্ভর করে তার পরিমাপ মাত্র ৳" × ১" ইঞ্চি। এই ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যেই তাঁকে শিশির বিন্দুতে আকাশ ধরার মতো চলচ্ছবির প্রত্যেক দৃশ্যটি তুলে নিতে হবে। কাজেই, তাঁর অসুবিধাও খুব; এবং সবচেয়ে মুস্কিল সেই ছবি যখন পৃথিবীর নানাদেশের ছবি-ঘরে অসংখ্য দর্শকদের চোখের সামনে ধরা হবে তখন সেই ক্ষুদ্র ছবিকে "প্রক্ষেপন-যন্ত্রের" সাহায্যে প্রায় ষোলো হাজার গুণ বড়ো ক'রে দেখানো হবে! এই বিস্তৃতির সঙ্গে ছবির প্রত্যেক খুঁটিনাটির তাল মানের অনুপাতে (Proportion) যে বিপুল পরিবর্ত্তন ঘটে,

চলচ্চিত্র-শিল্পীকে প্রতিপদে সে কথা স্মরণ রেখে সেই হিসাবের সঠিক অনুপাতে ছবি তুলতে হয়।

পূর্ব্বেই বলেছি দৃশ্যরচন-কৌশলের নানা রকম পদ্ধতি আছে। তার মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বজনপ্রিয় পদ্ধতি হ'চ্ছে 'ডাইন্যামিক সিমেট্রী' (Dynamic Symmetry) বা গতিক সাম্য অর্থাৎ গতির অনুকূল সামঞ্জস্য-বিধান। শ্রীযুক্ত জে হ্যাম্বিজ্ (Jay Hambidge) এই বিষয় নিয়ে একখানি বেশ সুচিন্তিত গ্রন্থ রচনা ক'রেছেন। চিত্র নিয়ে যাঁদের কারবার তাঁরা এ বইখানি পড়লে ছবিকে এই সংবৃতি, অর্থাৎ—দৃশ্য-রচন-কৌশল বা composition যে কতখানি সুন্দর ও সুদৃশ্য এবং চিত্তাকর্ষক ও নয়নাভিরাম করে তোলে—এক কথায় সুসম্পূর্ণ করে তোলে—তা' জেনে বিস্মিত এবং প্রভূত উপকৃত হবেন।

'ডাইন্যামিক সিমেট্রী' ব্যাপারটা আর কিছুই নয়—একটা কোনো নির্দ্দিষ্ট পরিমিত ক্ষেত্রের উপর প্রথমত কয়েকটি গতির অনুকূল রেখা (ডাইন্যামিক্ লাইন) টেনে দৃশ্য রচনের একটা নক্সা ছ'কে নেওয়া এবং সেই ছকের মধ্যে চিত্রের বিষয়-বস্তুকে মানিয়ে সাজানো! তুলি ও রং নিয়ে যাঁরা ছবি আঁকেন তাঁরাও এই নক্সা আগে ছ'কে নিয়ে তবে সে কাগজে বা ক্যানভাসে হাত দেন, চলচ্চিত্র শিল্পীর সে সুযোগ নেই; তাঁকে নিজের মানস-পটে এই নক্সা ছ'কে রাখতে হয়। কেউ কেউ অবশ্য ক্যামেরার পিছনে যে ঘসা কাঁচের পর্দ্দাখানি থাকে ছবির লক্ষ্য স্থির করবার জন্য, তারই উপর পেন্সিল দিয়ে ডাইন্যামিক্ লাইনের বা গতির অনুকূল রেখার ঘর দেগে রেখে দেন। তাতে ছবির দৃশ্য রচন কাজে আলোক-চিত্রকরের অনেকটা সুবিধা হয়।

'গতির অনুকূল রেখা' ব'ললে কী বোঝায় হয় ত' অনেকে তা ঠিক অনুধাবন ক'রতে পারবেন না। কিন্তু, শিল্পীরা এর রহস্য জানেন। যেমন,—ঋজু-রেখা (Vertical line) ঔদ্ধত্য, অহঙ্কার এবং উচ্চ পদমর্য্যাদার গাম্ভীর্য্য দ্যোতক! শায়িত-রেখা (Horizontal line) ঔদাস্য, বিনয় এবং অবসাদ ও আরাম-ব্যঞ্জক! কোণা-কোণি রেখা (Diagonal line) বিরক্তি, ক্রোধ, উৎসাহ ও কার্য্যতৎপরতা প্রভৃতির পরিচায়ক!

একই ছবি কেবলমাত্র দৃশ্য-রচন-কৌশলের গুণে কিরূপ বিভিন্ন অর্থ সূচিত ক'রে তার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে এই প্রবন্ধ সংলগ্ন চিত্রগুলি থেকে। হোলি উডের যশস্বী শিল্পী শ্রীযুক্ত হেনরী গুড (Henry Goode) এই ছবিগুলি 'আমেরিক্যান সোসাইটী অফ সিনামেটোগ্রাফার্স্' সমিতিকে উপহার দিয়েছেন। এই ছবিগুলিতে তিনি 'গতিক সাম্য পদ্ধতি' (System of Dynamic Symmetry) অনুসারে চলচ্চিত্রের দৃশ্য-রচন-কৌশল প্রদর্শন করেছেন। প্রথম চিত্রে সজ্জিত তৈজসপত্রগুলির মধ্যে একটা বেশ সুরের ঐক্য লক্ষ্যগোচর হয় কিন্তু দ্বিতীয় ছবিতে সেই জিনিষগুলিই সাজাবার দোষে নেহাৎ যেন বেসুরো বেতালা লাগে! দৃশ্য-রচন কৌশলের গুণে একইছবিতে কেমন সুন্দর সৌসাম্য 'Harmony' এবং কিরূপ সুস্পষ্ট বৈষম্য 'discord' ফুটিয়ে তোলা যায় এর চেয়ে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আর কিছু হ'তে পারে না। এই দৃশ্য-রচন-কৌশলের গুণেই আবার একই ছবিতে দর্শকের দৃষ্টি শিল্পীর ইচ্ছা মতো চিত্রের বিশেষ কোনো একটি অংশের উপর কী ভাবে

আকৃষ্ট ও নিবদ্ধ করা যায়, সে উপায়ের সন্ধান দিয়েছেন তিনি 'জ্ঞানদেবীর দু'খানি পরের পর ছবিতে। তার পরের দু'খানি ছবিতে 'কাল ও দীপশিখার' পরিকল্পনায় সেই গতিক সাম্য পদ্ধতি' অনুসারেই আঁকা একই চিত্রে তিনি দৃশ্য-রচন-কৌশলের গুণে দর্শকের দৃষ্টিকে একবার মানুষটির উপর টেনে নিয়ে গেছেন, একবার তার 'বই'খানির উপর টেনে নিয়ে গেছেন। অথচ এই দুখানি ছবির মধ্যে আঁকার দিক দিয়ে পার্থক্য এত যৎসামান্য যে, অভিজ্ঞের প্রখর দৃষ্টি ভিন্ন তা ধরা পড়ে না। কেবলমাত্র আলো ছায়ার ঈষৎ তারতম্য ঘটিয়ে একই ছবির মধ্যে মানুষটির বামহস্তের তর্জ্জনীটির অবস্থান একটু বদলে এই যে বিভেদ সৃষ্টি করা হ'য়েছে—দৃশ্য রচন কৌশলের এও একটা প্রধান দিক। একটিমাত্র আঙুলের একটু এদিক-ওদিক হ'য়ে গেলেই দর্শকের দৃষ্টির গতি যখন ফিরে যায়, তখন এ কথা আর বেশী ক'রে বলাই বাহুল্য যে, দৃশ্য রচন কৌশলের উপর ছবির সাফল্য নির্ভর করে কতখানি। মোটের উপর চলচ্চিত্র-শিল্পীরও এ-কথা ভুলে গেলে চলবেনা যে শিল্পসাধনায় সংযুতি অর্থাৎ composition বা দৃশ্য-রচন-কৌশল আয়ত্ত রাখা কলজ্ঞানের সম্যক্ পরিচায়ক।

আরাম ও উদ্বেগ। (সরল ও ঋজুরেখার অনুসরণে দৃশ্যরচন কৌশলের গুণে কুকুরটির মধ্যে আনন্দ মূর্ত হয়ে উঠেছে, এবং উদ্ধত মানুষটি তা থেকে বঞ্চিত) ৫১

কোণাকুণি রেখায় চিত্রের ঘটনা সমাবেশ (বাম দিক্ থেকে দক্ষিণে, উপর কোণ থেকে নীচের কোণ) ৫৫

আলো ছায়ার তারতম্য— আলোক সম্পাতের গুণে এই ছবিখানি দেখলেই মনে হয় যেন খিলানের নীচে দিয়ে অনেকদূর পর্যন্ত ভিতরে দৃষ্টি যাচ্ছে। খিলান ও আসবাব গুলির উপর জোর আলোর কৌশলে, Depth & roundness চমৎকার ফুটে উঠেছে ৫৬
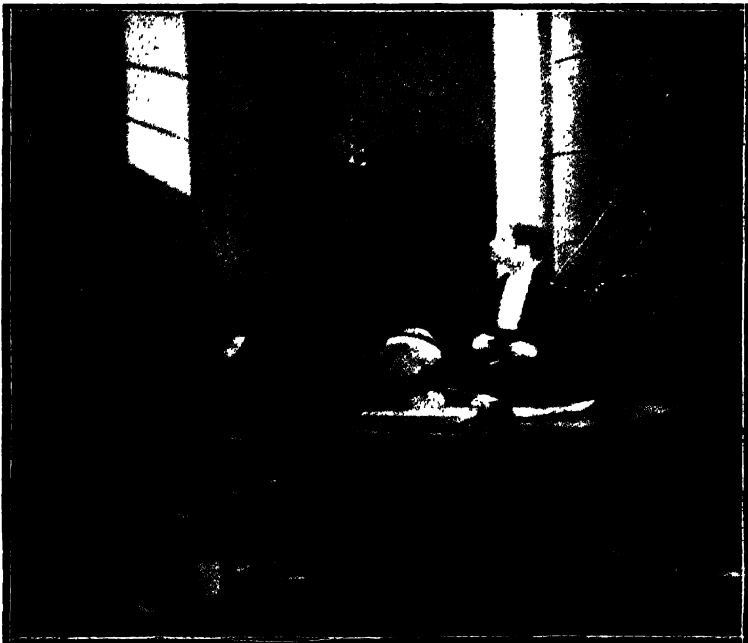
যথাস্থানে আলো —(এই ছবিখানিতে বামদিকের খোলা জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে আলো আসছে। জানালা আলোক আসবারই পথ। সুতরাং এই জানালার ভিতর দিয়ে এই দৃশ্যে যে কৃত্রিম আলোকসম্পাত করা হয়েছে, একে বলে 'Source lighting' বা যথাস্থানে আলো।) ৫৭

চলচ্চিত্রের আলোক রহস্য

চিত্র সম্বন্ধে যাঁদের সামান্য কিছু জ্ঞান আছে, তাঁরাই এ কথাটা জানেন যে ছবির প্রধান সম্পদ হ'চ্ছে 'আলো-ছায়ার' (Light & shade) লীলা-চাতুর্য্য! এই 'আলো-ছায়ার' বিশেষ তারতম্যের গুণেই ছবির অন্তর্নিহিত রূপ ও প্রকাশভঙ্গীর সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে! চলচ্চিত্রও ছবি; তাই এরও প্রকাশমাধুর্য্য সম্পূর্ণ নির্ভর করে আলো-ছায়ার সুবিন্যাসের উপর। আলোক- সম্পাতের কৌশলে মানুষের দৃষ্টিকে এমনিই বিভ্রান্ত ক'রে তোলা যায় যে, পাতলা একখানি পর্দ্দার উপর ঘর-বাড়ী, গাছপালা, নরনারী, জীবজন্তু, এবং আস্‌বাব ও তৈজসপত্রের যে ছায়া পড়ে, তার কোনটিকেই ছায়া ব'লে মনে হয় না। সবই যেন চোখের সামনে সত্য ও প্রত্যক্ষ দেখ্‌চি বোধ হয়! ছবিতে গোটা-জিনিসটার শুধু আকার নয়—সম্পূর্ণ অবয়বটিও তার ঘনত্ব (depth) এবং ঘের (roundnes) টুকুও দেখানোর একমাত্র উপায়ই হচ্ছে এই আলো-ছায়ার সু-সন্নিবেশ! কাজেই, চলচ্চিত্রের প্রধান একটা অঙ্গ হ'চ্ছে আলোক-সম্পাত।

দিনের আলোর উপর নির্ভর ক'রে ছবি তোলার একটা মস্ত অসুবিধা হ'চ্ছে, সে আলো নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল; তা'ছাড়া সূর্য্যালোক তেমন সহজে আমরা যদৃচ্ছা নিয়ন্ত্রিত করতে পারিনি। প্রয়োজন মত অতিসূক্ষ্ম ওজনে কমানো বা বাড়ানোরও কোনো সহজ উপায় থাকেনা আমাদের হাতে। সুতরাং সূর্য্যালোকের চেয়ে 'ষ্টুডিও' বা প্রয়োগশালার মধ্যে কৃত্রিম আলোর সাহায্যে ছবি তোলাই সবচেয়ে সুবিধাজনক। কারণ, আলোক এখানে সম্পূর্ণরূপে পরিচালকের আয়ত্তাধীন। প্রয়োগশালায় বৈদ্যুতিক আলোক ছাড়াও 'ইন্‌ক্যাণ্ডিসেণ্ট্ লাইট্' এবং 'আর্কল্যাম্প্' প্রভৃতি নানা রকম আলোক ব্যবহারের সুব্যবস্থা করা থাকে। এই সব আলো পরিচালক তাঁর ইচ্ছামত ও প্রয়োজন অনুসারে যেখানে খুশী ফেলতে পারেন এবং যেরকম দরকার সেইরকম ভাবেই অনায়াসে কমাতে বা বাড়াতে পারেন।

প্রয়োগশালার 'আলোক-রহস্য' যদিও কতকগুলি মাপ-জোক্' করা হিসাব ও যন্ত্রপাতির অধীন, তবু চিত্রের প্রয়োজন মতো তাকে অদলবদল ক'রে নিয়ে ব্যবহার করা চলে। প্রথমেই ত' ১/২৫ সেকেণ্ডের মধ্যে ছবি তোলা যেতে পারে এমনভাবে প্রয়োগশালাকে ক্যামেরার সামনে দিক থেকে আলোকিত ক'রে রাখতে হবেই। এর উপর আবার ব্যাপ্তালোক (diffused light) সমস্ত দৃশ্যটির উপর ওজোন বুঝে ছড়িয়ে ফেল্‌লে ছবির যে সব জায়গা একেবারে গাঢ় আঁধার অর্থাৎ গভীর ছায়াযুক্ত, সে সব অংশও বেশ সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। এর ফলে, ছবিখানির মধ্যে আলো-ছায়ার লীলা এমন সুন্দরভাবে দেখতে পাওয়া যায় যে, সে ছবির তারিফ না ক'রে পারা যায় না। ক্যামেরার দিক থেকে দৃশ্যপটের উপর সংহত আলোকও (spot-light) ফেলতেই হয়, তাছাড়া উপরদিকথেকে আবার এই diffused light বা ব্যাপ্ত

আলো ছড়িয়ে দিয়ে সমস্ত দৃশ্যটি সমানভাবে আলোকিত ক'রে রাখতে পারলে ছবির আলো-ছায়ার পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করা নিজেদের আয়ত্তের ভিতর থাকে। কোন্ ছবিতে কোন্‌দিকে এবং কোন্‌খানটায় কতখানি আলো বা কতটা ছায়া (shade) রাখা দরকার, কোথায় আলো খুব জোর হ'লে ভাল হয়, কোথায় কমজোর হওয়াই বাঞ্ছনীয়, এই সব দিক থেকে ছায়ার মায়াকে মূর্ত্ত ক'রে তোলার পক্ষে এই diffused light বিশেষ কাজে আসে। তা'ছাড়া, আজকাল সবাক্ ছবি তোলবার জন্ত প্রত্যেক দৃশ্যে এতবেশী সংখ্যক ক্যামেরা ব্যবহার করা হয় যে, ব্যাপ্ত আলোক-সম্পাত এখন ছবি তোলার একটা প্রধান আবশ্যকীয় অঙ্গ হ'য়ে উঠেছে!

নির্ব্বাক্ ছবিতে কোনো প্রয়োগশালায় আগে একসঙ্গে তিনটির বেশী ক্যামেরাব্যবহার করা হ'ত না। কিন্তু এখন 'কথাকওয়া ছ'বি তুলতে গিয়ে অনেক প্রয়োগশালায় একসঙ্গে পনেরোটি পর্য্যন্ত ক্যামেরাও ব্যবহার হ'চ্ছে। যাদের অবস্থা খুব বেশী সচ্ছল নয়, তারা সবচেয়ে কম ক'রেও একসঙ্গে অন্ততঃ চারটি ক্যামেরা না হ'লে কাজ করতে পারেনা! একই ছবির একই দৃশ্য পনেরোটি ক্যামেরায় কেন তুলে নেওয়া হয়—এ প্রশ্ন যদি কারুর মনে জাগে, তার অবগতির জন্ত বলছি যে—ছবি এক হ'লেও নানা বিভিন্ন কোন (angle) থেকে দেখলে সেই একই ছবি বিভিন্ন রকম দেখতে হয়। তাছাড়া নিকট ও দূর থেকে দেখার ও শোনার দুইয়েরই পার্থক্য ত' আছেই এবং আরও আছে—বিভিন্ন ক্যামেরার চক্ষের দৃষ্টি-শক্তি (power of lens) ভিন্ন ভিন্ন রকম। অর্থাৎ, কোনো ক্যামেরার লেন্‌সের power খুব বেশী, কোনোটার কম। কাজেই বিভিন্ন 'মাইকে'র অবস্থান অনুযায়ী পনেরোটি বিভিন্ন শক্তির ক্যামেরায় ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে ও ভিন্ন ভিন্ন দূরত্ব থেকে এবং বিভিন্ন আলোক-সম্পাতের সাহায্যে যে গল্পটির ছবি তোলা হয়, সে ছবির শব্দ ও চিত্রের দিক দিয়ে নিখুঁত হয়ে ওঠবার সম্ভাবনা থাকেই। আজকাল একাধিক ক্যামেরা ব্যবহার করা হয় বলেই আরও বিশেষ ক'রে ব্যাপ্ত-আলোর সাহায্যে সমস্ত দৃশ্যগুলি সমানভাবে আলোকিত ক'রে রাখা প্রয়োজন।

উপরদিক থেকে আলো ছড়িয়ে ফেলার একটা মস্ত সুবিধা হ'চ্ছে প্রত্যেক জিনিষটার এবং প্রত্যেক নরনারীর উপরাংশ অর্থাৎ মাথার দিক ক্যামেরার সামনে বেশ স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে! ছবির লোকগুলোর চোখ মুখ যদি আমরা ভালো ক'রে দেখতে পাই, তাহ'লে সে ছবির উপর সহজে আমাদের বিরাগ উৎপন্ন হয়না। উপর থেকে আলো ফেলার ব্যবস্থা ক'রলে আর একটা সুবিধা হয় এই যে, ছবি তোলবার সময় ক্যামেরা-কুঠ্‌রী (camera-booths) আলোকাধার (lightstands) আস্‌বাবপত্র (Furnitures) প্রভৃতির পরিবেষ্টনে সঙ্কীর্ণ হ'য়ে ওঠা অভিনয়ের স্থানটুকু আর অধিকতর সঙ্কীর্ণ হ'য়ে পড়েনা।

উপর থেকে এই ছড়িয়ে ফেলা আলোর ব্যবস্থাটা বেশ সন্তোষজনক ভাবে ক'রে উঠতে পারলেই তার পরের কাজ হ'চ্ছে কী-ভাবে প্রত্যেক দৃশ্যে আলোক নিক্ষেপ করা হবে সেইটে স্থির করা। অর্থাৎ সেই দৃশ্য ছবির আখ্যান ভাগ অনুযায়ী কোন্ সময়ে ঘট্‌ছে সেইটে জেনে তদনুরূপ আলোক নিক্ষেপের ব্যবস্থা করা। যদি সেই দৃশ্যে খোলা-জানালা দেখাবার সুযোগ থাকে তাহ'লে সেই খোলা জানালার ভিতর দিয়ে দিনের তখন কতদণ্ড হিসাব করে

নিরপেক্ষ আলো — "লাভ্ প্যারেড্" ছবির এই দৃশ্যে এমনভাবে আলো ফেলা হয়েছে যে, প্রধান নট-নটীর সঙ্গে দ্বারপালেরাও ক্যামেরার দৃষ্টিতে সমান আদর পেয়েছে। একে বলে—Impersonal lighting। ৫৮
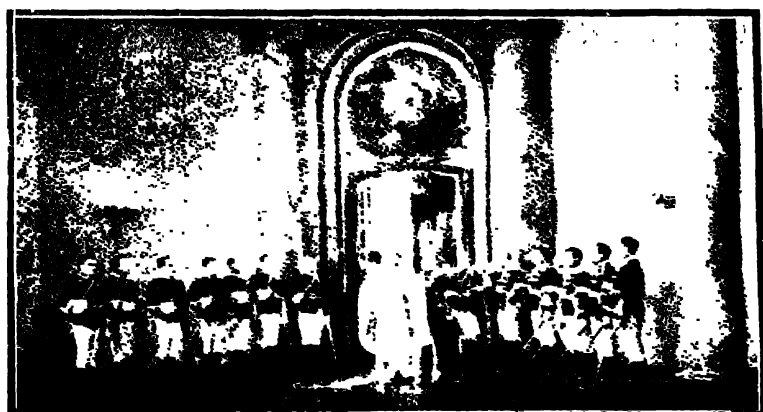
'লাভ্ প্যারেডে'র একটি দৃশ্য। এই দৃশ্যের নট ভূমিকায় আলো ফেলা হয়েছে, অন্যান্য অভিনেতৃবর্গের উপর তার চেয়ে হালকা আলো দেওয়া হয়েছে। আবার, প্রধানা অভিনেত্রীর উপর অপেক্ষাকৃত জোর আলো ব্যবহার করা হয়েছে। এর ফলে এই লঘু ছবিখানির মধুর ভাবটুকু বেশ মূর্ত্ত হয়েছে। ৫৯

ডাঃ ক্য মাক্রুর একটি দৃশ্য। এই দৃশ্যে আলো-ছায়ার যে বৈচিত্র্য দেখানো হয়েছে, তার ফলে এই গুরু ছবিখানির একটা গম্ভীর সংযত ভাব চমৎকার ফুটেছে। ৬০
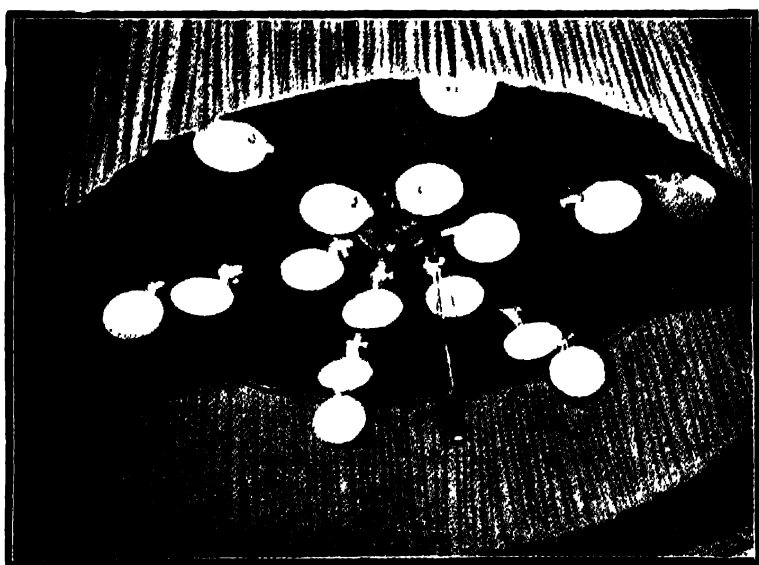
ঘরের ভিতর আলো (chamber lighting) ৬১

এবং সে সময় কোন্‌দিক্‌ থেকে ঘরের মধ্যে আলো আসা সম্ভব, সেটা বিবেচনা ক'রে ঘরের সেইদিকের জানালা দিয়ে আলোক নিক্ষেপের আয়োজন করা উচিত। কিম্বা, যদি সেটা রাত্রিকালের কোনো দৃশ্য হয়, তাহ'লে ছবির গল্পের বর্ণনা অনুযায়ী সে ঘরে তখন কী আলো বা দীপ জলছিল, ঝাড়লণ্ঠন, দেয়ালগিরি, না টেবিলল্যাম্প, সেইটে জেনে তারই সাহায্যে দৃশ্যটি আলোকিত ক'রে তোলবার ব্যবস্থা করাই হ'চ্ছে শিল্প-রুচি-সম্মত উপায়।

আলোর ব্যবস্থা করায় যদি কোনো ভুল বা ক্রটী হ'য়ে পড়ে তাহ'লে কিন্তু ছবিগুলি মাটি হ'য়ে যায়। কারণ ভুল দিক থেকে আলো ফেলার দোষে এবং সেখানে যতটুকু আলোর দরকার তার কমবেশী হ'য়ে গেলে সে দৃশ্যে অভিনয় ত' ক্ষতিগ্রস্ত হয়ই, তা' ছাড়া সে ছবিও ভালো খোলেনা! অর্থাৎ ক্যামেরা খুব ভালো হ'লেও আলোর দোষে ঠিক আশানুরূপ সাফল্যলাভ হয় না। সুতরাং চলচ্চিত্র-শিল্পীদের প্রথম কর্ত্তব্য হ'চ্ছে গল্পটি বেশ ভালো ক'রে পড়ে নিয়ে—'আলোক-শিল্পী' (Light-expert) কলানায়ক (Art-Director) এবং ছায়াধর যন্ত্রী (cameraman) তিনজনে মিলে পরামর্শ ক'রে প্রত্যেক দৃশ্যের ছবি তোলবার আগেই সে দৃশ্যটিতে কী ভাবে কোন্‌দিক দিয়ে কতটা আলো ব্যবহার করা হবে, তার একটা ব্যবস্থাপত্র প্রস্তুত করা। এইভাবে কাজ সুরু করেতে পারলে অনেক ভুলচুক্‌ কম হবে। ছবি তুলতে অযথা অর্থের অপব্যয় এবং অকারণ বিলম্ব ঘটবে না।

কোন্‌ দৃশ্যে কোন্‌দিক থেকে কি ভাবে আলো ফেলা হবে, এটা স্থির হবার পরই চলচ্চিত্র-শিল্পীর দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে আলোর সাহায্যে দর্শকদের দৃষ্টি-বিভ্রম উৎপাদন করা। অর্থাৎ চিত্রেয় বস্তু বা ব্যক্তির শুধু রেখায় আঁকা আকৃতি দেখানো নয় তার সম্পূর্ণ অবয়বের রূপ (depth & roundness) ফুটিয়ে তোলা! এটা সম্ভব হ'তে পারে একমাত্র আলো-ছায়ার কৌশলে দর্শকদের দৃষ্টি-বিভ্রম সৃষ্টি ক'রতে পারলে। চিত্রেয় বস্তু বা ব্যক্তির আকৃতির depth দেখাতে হ'লে আলোর তারতম্য বিধানই একমাত্র সহজ উপায়।

কোনো ছবির পুরো ভূমি (Fore-ground) যদি ছায়ালেখ্য (Silhouett) মাত্র ক'রে রেখে, মধ্যভূমি (middle-ground) খুব দীপ্ত আলোকোজ্জ্বল করে তোলা হয় এবং পশ্চাদ্‌ভূমি (Back-ground) একেবারে অন্ধকার রাখা হয়, তাহ'লে যে কোনো দৃশ্যের depth ছবিতে বেশ স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। লক্ষ্য রাখতে হবে যে আলো ছায়ার তারতম্যটুকু (Contrast of light & shade) তা' ব'লে কোনো ছবিতেই যেন স্পষ্ট হ'য়ে না ওঠে। কারণ, আলো ছায়ার তারতম্যটুকু যদি দর্শকদের চোখে ধরা প'ড়ে যায় তাহ'লে তাদের দৃষ্টি-বিভ্রম সৃষ্টি করা কঠিন। সুতরাং ছবির যে অংশটুকু মাত্র সিল্‌হৌট্‌ বা ছায়ালেখ্য রাখা হবে তার মধ্যেও প্রত্যেক খুটি-নাটিটি (details) পর্য্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পাওয়া চাই; আবার, যে অংশটুকু আলোকোজ্জ্বল করা হবে সেটুকু যেন বড্ড বেশী জোর আলোয় একেবারে সাদা না হ'য়ে পড়ে। এবং একেবারে অন্ধকার অংশেরও অন্ততঃ আকৃতি-রেখাগুলো (Outlines) যেন অদৃশ্য না হ'য়ে যায়।

Depth দেখাবার আর একটা উপায় হ'চ্ছে দৃশ্যের দেওয়াল বা প্রাচীরগাত্র খুব আলোকোজ্জ্বল ক'রে তুলে ঘরের ভিতরের ও দেওয়ালের সম্মুখের আসবাবপত্রগুলি একটু

'সিল্‌হোট্‌' ক'রে রাখা! Depth দেখাবার এ উপায় যেখানে অবলম্বন করা হবে, সেখানে দৃশ্যপটের দেওয়ালগুলি যাতে চ্যাপ্টা ও প্লেন না হ'য়ে উঁচু উঁচু 'বীট' বা 'পল' তোলা, থাম বসানো এবং ষট্‌-কোণ বা অষ্ট-কোণ হয়, আগে থেকে সে ব্যবস্থা করতে হবে। দেওয়ালের অভ্যন্তরে ঝরোকা, বাতায়ন বা ঘুলঘুলি থাকলে আরও ভালো হয়। আস্‌বাবপত্রগুলো একটু আকারে বড়ো হ'লে এ রকম ছবির পক্ষে খুব সুবিধা। তা'ছাড়া ঘরের ভিতরকার প্রত্যেক বস্তু বা ব্যক্তির যদি সেই ঘরের মেঝেয় আলোর বিপরীত দিক থেকে ছায়া পড়ছে দেখানো হয়, তাহ'লে অতি সহজেই দর্শকদের দৃষ্টি-বিভ্রম উৎপাদন ক'রতে পারা যায়।

Roundness অর্থাৎ চিত্রের বস্তু বা ব্যক্তির আকৃতি ও অবয়বের সম্পূর্ণ গঠন যদি দেখাতে হয় তা'হলে বিশেষ যত্ন ক'রে জোর আলো ব্যবহারের কৌশল শিক্ষা করা চাই। দৃশ্যের মধ্যে যেখানে সামান্য একটুও বৃত্তরেখার (Curve) সম্পর্ক আছে, সেই সেই স্থানগুলিতে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রেখে অল্প বাতির সংহত আলোক (Spot-iight) ব্যবহার ক'রে সেগুলি সুস্পষ্ট ক'রে তোলা চাই। বৃত্তরেখা বেশী করে দেখাতে পারলেই ছবির roundness ফুটিয়ে তোলা সহজ হ'য়ে উঠবে। কারণ এই বৃত্তরেখার (Curve) সাহায্যেই আমাদের দৃষ্টির 'গোলাকার বোধ' জন্মায়।—কাজেই ছবিতে কোনোও কিছুর 'ঘের' বোঝাতে হ'লে বৃত্তরেখার সাহায্য নেওয়া ভিন্ন অন্য উপায় নেই। যেমন ধরুন কোনো ছবিতে যদি গোটাকতক গোল খিলান সারি সারি গোল থামের উপর থাকে, তাহ'লে যে কোনো একদিক থেকে সেই থামের উপর জোর আলো ফেললে থামের বৃত্তরেখা আমাদের দৃষ্টিতে স্পষ্ট হ'য়ে উঠবে। সঙ্গে সঙ্গে এক পাশ থেকে খিলোনেরও, ভিতর দিকটায় জোর আলো দিতে পারলে শুধু যে তার roundness টুকুই আমরা বুঝতে পারবো তাই নয়, তার ভিতরের depthও আমাদের দৃষ্টিপথে প্রতিভাত হবে। এমনি ভাবে আস্‌বাব্‌ পত্রের উপরও আলো ফেলতে পারলে সমান ফল পাওয়া যায়। ঘরের ভিতরের টেবিল চেয়ারগুলির পায়া যদি এমনভাবে আলো ফেলে স্পষ্ট ক'রে তোলা যায় যে, মেঝের আলো এবং দেওয়ালের গায়ের আলোর সঙ্গে বেশ একটা তার পার্থক্য থাকবে অথচ সেটা খুব বেশী তফাৎ না হ'য়ে পড়ে, তাহ'লে সে আস্‌বাবগুলো আমাদের চোখে একেবারে প্রত্যক্ষ সত্য হ'য়ে উঠবে।

অবশ্য দৃশ্যপট ও আস্‌বাব-পত্রের চেয়ে নট-নটীদের উপরই লক্ষ্য রাখতে হবে বেশী, কারণ ছবির প্রধান আকর্ষণ তারাই, দৃশ্যপট বা আস্‌বাব-পত্র নয়। ওগুলো তাদেরই সুবিধার জন্য রাখবার প্রয়োজন। চলচ্চিত্রের আলোকপাতের মধ্যে আবার ছবির রকম হিসাবে দু'টো শ্রেণী আছে। একরকম হ'চ্ছে 'ষ্টার' ছবি! অর্থাৎ প্রধান অভিনেতা বা অভিনেত্রীই এ ছবির একমাত্র আকর্ষণ! সুতরাং এ ছবির মধ্যে যা কিছু থাকবে সমস্তই সেই 'ষ্টার' বা প্রধান আকর্ষণের অনুকূল। আর এক-রকম ছবি হ'চ্ছে "All-Star" চিত্র অর্থাৎ সে ছবিতে প্রধান ব'লে বিশেষ কোনও একজনের আকর্ষণ নেই, সে ছবির গল্পের সাফল্য নির্ভর করে সবারই উপর সমান ভাবে! কেউ তাতে কম বেশী নয়।

এই দুই বিভিন্ন শ্রেণীর ছবিতে আলোর ব্যবহারও একেবারে দু' রকমের। প্রথম শ্রেণীর ছবিতে সেই প্রধান ব্যক্তির প্রয়োজন হিসাবেই আলোর ব্যবস্থা ক'রতে হয়। 'ষ্টার' যিনি

পক্ষপাতি আলো—ভ্যাগাবণ্ড কিং ছবির এই দৃশ্যে প্রধানা অভিনেত্রীকেই আলোকিত করে দেখানো হয়েছে,—তার সখী ও পরিচারিকাদের সম্পূর্ণ অবহেলা করে। (একে বলে personal lighting.) ৬২

আলো ও ছায়া, (ডানদিক থেকে এক পাশে আলো ফেলা) ৬৩

সামনের দিকে আলো (Flat lighting)　　১৪

সামনে ও পাশ থেকে আলো (এক সঙ্গে দু' রকম)　　১৫

তাঁকে যাতে সকল দৃশ্যেই সুন্দর ও মনোহর ক'রে তোলা যায় সেই দিকেই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রেখে চলতে হয়। কারণ, তিনিই হচ্ছেন সেই ছবির প্রধান আকর্ষণ! দ্বিতীয় শ্রেণীর ছবিতে ব্যক্তির প্রয়োজন গৌণ হ'য়ে পড়ে। সেখানে গল্পের আকর্ষণটাই মুখ্য; কাজেই সেইদিকে লক্ষ্য রেখে ছবিখানিকে চিত্র-শিল্পের দিক দিয়ে দ্রষ্টব্য ক'রে তুলতে হয়।

'ষ্টার-ছবি' তোলা আজকাল অনেক ক'মে এসেছে, কারণ যে ছবিতে 'ষ্টার্' অর্থাৎ প্রধান একজন নায়ক বা নায়িকাকেই বড়ো ক'রে তোলা হয়, সে ছবির অনেক দোষ থেকে যায়! যেহেতু—তার গল্প, তার চিত্রনাট্য, তার ভূমিকা-নির্ব্বাচন—তার অভিনয় পরিচালন—তার আলোক-সম্পাত, তার বিবৃতি লিপি (Titles) সব কিছুই এমন ধরা-বাঁধার মধ্যে থেকে ক'রতে হয় যাতে সেই 'ষ্টারে'র নাগালের বাইরে না গিয়ে পড়ে কিছু!

একাধিক নিম্নশ্রেণীর 'ষ্টার্-ছবি'তে বাজার ছেয়ে যাওয়ায় 'ষ্টার-ছবি'র উপর সাধারণেরও একটা অভক্তি জন্মেছে। গল্পের মধ্যে যে দৃশ্যে 'ষ্টার্' আছেন—তার ঘটনা যেমনই হোক্ না কেন, 'ষ্টার'কে তার ভিতর প্রধান আকর্ষণ ক'রে ছবি তুলতেই হবে—প্রযোজকদের এই খেয়াল অনেক সময় পরিচালক ও চিত্র-শিল্পীর কাজের পক্ষে পীড়াদায়ক হ'য়ে ওঠে! কারণ, 'ষ্টারের' খাতিরে তাঁদের প্রায়ই 'আর্ট'কে গলাটিপে হত্যা ক'রতে হয়। ছবি তুলতে তুলতে এমন অনেক দৃশ্যে দেখা যায় যে সেই তথাকথিত ষ্টারের সুন্দর মুখের চেয়ে একটা কোনো ছোট্ট অপ্রধান ভূমিকার চোখ মুখের ভাব ক্যামেরার সামনে অভিনয়ে এত চমৎকার ফুটে উঠেছে যে নাটকীয় ঘটনার দিক দিয়ে তার সার্থকতা যতখানি শিল্প-কলার দিকদিয়েও তার সৌন্দর্য্য তেমনই লোভনীয়! কিন্তু, পাছে 'ষ্টার' কোথাও এতটুকু মলিন হ'য়ে পড়ে এই আশঙ্কায় সে অপ্রধান ভূমিকার অভিনেতাকে অলক্ষ্যেই রেখে যেতে হয়। তাছাড়া, 'ষ্টার্' কোনো উৎসব-মণ্ডপে, আনন্দ-সভায়, প্রমোদগৃহে বা কারাগারের অন্ধকূপে, পর্ব্বত গহ্বরে কিম্বা পাতালের সুড়ঙ্গপথেই থাক্—সব সময়েই—সর্ব্বত্র—তাকে সুন্দর ক'রে ছবিতে তোলা চাই, অর্থাৎ, স্থান-কাল যেমনই হোক না কেন, সেদিকে চোখ বুজে 'ষ্টারের' চাঁদমুখের চারপাশে ছবিখানির গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত আলোর একটা চালচিত্তির ধ'রে বেড়াতেই হবে। এটা যে কোনোরকম যুক্তিতর্ক দিয়েই সমর্থন করা যায়না, এবং এতে যে আর্টের চরম অপমান করা হয়—ছবির কারবারী মহাজন তা' কিছুতে বোঝে না; সে ভাবে—যাকে এত টাকা দিয়ে কণ্ট্রাক্ট্ ক'রে—অর্থাৎ চুক্তি-পত্র সহি করে এনেছি, তাকে ছবির মধ্যে আগাগোড়া যত বেশী ক'রে দেখাতে পারি, সেইটেই আমার পক্ষে লাভ! কিন্তু, এই অতি-লোভের ফলে যে ছবির মর্য্যাদা অনেক খেলো হ'য়ে যায় সে হিসাব তারা রাখে না। কাপড়ের পাড়ের জরিদার কাজ দেখিয়েই তারা লোক ভোলাতে চায়,—মিহি বা খাপি খোলের জন্যে মাথা ঘামায় না!

দ্বিতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ 'All-star' ছবি যেগুলি, সৌভাগ্যক্রমে আজকাল সেই ছবিই ক্রমে ক্রমে জনপ্রিয় হ'য়ে উঠ্ছে। এতে চলচ্চিত্র-শিল্পীর স্বাধীন ভাবে কাজ করবার যথেষ্ট সুযোগ থাকে। একজনের প্রতি সমস্ত মনোযোগ না দিয়ে সকলের প্রতি সমান মনোযোগ দেবার

অবকাশ পায় সে। এর ফলে শিল্পের দিক দিয়ে চলচ্চিত্রের চরম সৌন্দর্য্য বিকশিত হয়ে ওঠবার সম্ভাবনা ঘটে।

ছবির আলোক-সম্পাত, সর্ব্বত্র ঠিক গল্পের ভাবানুকূল ক'রে তোলা উচিত। উৎকৃষ্ট ছবির প্রধান গুণই হ'চ্ছে তাই। ছবির ঘটনা ও কাহিনীর মর্ম্মনিহিত যে সুর, আলোর ভিতর দিয়ে সেই সঙ্গীতকে মূর্ত্ত ক'রে তুলতে পারলেই সেই ছবি হয়ে উঠ্‌বে সকল ছবির শ্রেষ্ঠতম।

ছবির গল্প যদি 'The way of All Flesh'; বা 'Lummox' কিম্বা 'The case of Sgt. Grischa'র মতো গুরুগম্ভীর ভাবের হয়—তাহ'লে আলোক-সম্পাত সে ছবিতে খুব সংযতভাবে করা উচিত। কিন্তু ছবিখানি যদি 'মেলো-ড্রামা' বা মধুর নাটক হয় যেমন 'Dr. Fu Manchu' বা 'Alibi' ছবি, তাহ'লে আলোক-সম্পাত হওয়া উচিত একটু নরম রকমের, অথচ তারই মধ্যে আগা-গোড়া আলো-ছায়ার বৈচিত্র্যও রাখা উচিত। আবার 'Love Parade' কিম্বা 'Vagabond King'এর মতো মধুর মিলনান্তক হাল্‌কা ছবি যদি হয়, তাহ'লে আগাগোড়া খুব জোর-আলো ব্যবহার করাই সমীচীন। এর দু'টি কারণ দেওয়া যেতে পারে। প্রথম, ঘটনার সঙ্গে আলোর সামঞ্জস্য থাকে, দ্বিতীয় কারণ, ছবির কোনো মধুর অংশই এতে দর্শকের অলক্ষ্যে থেকে যাবে না! নিপুণ চলচ্চিত্র-শিল্পীর তত্ত্বাবধানে ছবির আলোক-সম্পাত শুধু যে গল্প ও অভিনয়ের স্থানকালোপযোগী একটা নাটকীয় আবহাওয়া সৃষ্টি ক'রে তাই নয়, দর্শকের মনকেও চিত্রের অতি সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য ও রস গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করে তোলে।

কেবলমাত্র যে 'প্রয়োগশালার' অভ্যন্তরে কৃত্রিম আলোর সাহায্যেই এইভাবের ছবি তোলা সম্ভব, এমন যেন কেউ মনে করবেন না। বাইরে মুক্ত প্রকৃতির কোলে দিনের আলোতে তোলা ছবিও এমনিই সুন্দর ও সু-আলোকিত ক'রে তোলা যায় যদি সে চলচ্চিত্র শিল্পীর জানা থাকে—স্বভাবের আলোকেও কি উপায়ে নিজের আয়ত্তাধীন করে' নেওয়া যেতে পারে! এ কিন্তু অত্যন্ত কঠিন কাজ এবং দীর্ঘকালের সাধনা-সাপেক্ষ!

সূর্য্যের আলোক নিয়ন্ত্রিত করবার প্রধান উপায় হ'চ্ছে ক্যামেরার মুখটি খোলা ও বন্ধ করার কৌশল আয়ত্ত করা। অর্থাৎ, কোন্ দৃশ্যটি কতক্ষণ কী পরিমাণ আলোর ভিতর তোলা দরকার, সেইটি জানা এবং লেন্‌সের সামনে সূতোর জাল ব্যবহার ক'রতে শেখা। অর্থাৎ কী রকম আলোর কী পরিমাণ তারতম্য ঘটাবার জন্য কোন্ ধরণের জালিপর্দ্দা ব্যবহার করা দরকার, সেটা ভাল ক'রে শেখা। এই উপায়ে সমস্ত ছবিখানি আগাগোড়া, কিম্বা তার অংশ-বিশেষের উপর দিনের আলোয় তোলবার সময়ও প্রয়োজন মত আলোর হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটানো চলে। প্রত্যেক দৃশ্যের অনেক কিছু খুঁটিনাটি ব্যাপার ওই Gauze Matte বা 'জালি-পর্দ্দার' সাহায্যে ইচ্ছামত সুস্পষ্ট ক'রে তোলা বা অস্পষ্ট ক'রে ফেলা যায়। তবে এ করবার উপায়টুকু একান্ত সীমাবদ্ধ! বহির্দৃশ্যের ছবি তোলবার সময় চলচ্চিত্রশিল্পীর প্রয়োজন হ'লে এই ভাবেই তিনি দিনের আলো কতকটা কমিয়ে বাড়িয়ে নিতে পারেন। এখানে একটা কথা ব'লে দেওয়া উচিত মনে করি; ক্যামেরার ভিতরের Matte বাক্সে এক আধ
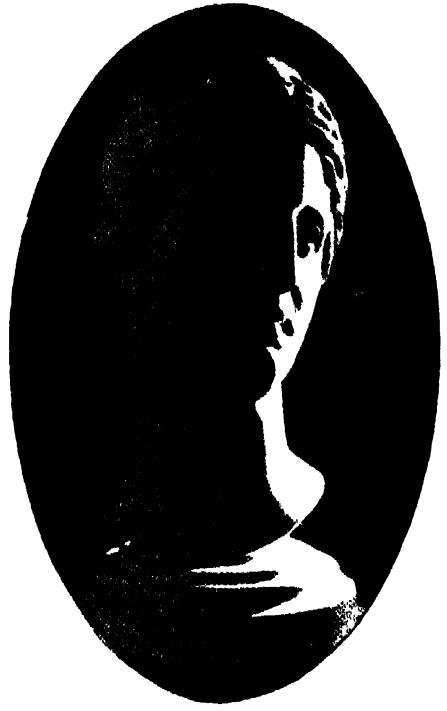
পাশে ও উপর থেকে আলো (এক দিকে দীপিকা।) ৬৬

পাশে ও পিছনে আলো (এক দিকে দীপিকা।) ৬৭

আনা ক্রাষ্টির একটি দৃশ্য।—আলোক সম্পাতের কৌশলে রজনী হয়ে উঠেছে হেমন্তের ঘন কুজ্ঝটিকায় ঢাকা

ইঞ্চি Gauze ব্যবহার করার চেয়ে অভিনেয় দৃশ্যপটের সামনে ও মাথার উপর খুব বড় জালিপর্দ্দা (Matte Screen) ঝুলিয়ে দেওয়াই অধিকতর সুবিধাজনক। সেই পর্দ্দার বাইরে যদি অভিনেতৃরা থাকে, তা'হলে তাদের উপর বেশ জোর আলোই পড়বে এবং পর্দ্দাবৃত থাকার দরুণ পটভূমিকা ও দৃশ্যস্থল অপেক্ষাকৃত স্বল্প আলো পাবে। আবার কোনো দৃশ্যে যদি পটভূমিকা ও দৃশ্যস্থল উজ্জ্বল রেখে নটনটীদের স্বল্পালোকের মধ্যে অভিনয় করানো প্রয়োজন মনে হয়, তা'হলে এমন কোনো একটি স্থান নির্ব্বাচন ক'রতে হবে যেখানে পারিপার্শ্বিক দৃশ্যাবলী বেশ রৌদ্রকরোজ্জ্বল কিন্তু অভিনয় স্থলে গাছপালা, ঘরবাড়ী বা পাহাড়েরই হোক—খানিকটা ছায়া এসে প'ড়েছে; যদি সে রকম ছায়াযুক্ত স্থান খুঁজে না পাওয়া যায় তাহ'লে কোনো রকম কৃত্রিম উপায়ে প্রাচীর খাড়া ক'রে সেখানে আলোটুকু আড়াল ক'রে নিতে হবে। অনেক সময় সেই জায়গাটুকুতে খুব ঘন কালো রং মাখিয়ে দিলে ক্যামেরার ভিতর দিয়ে ছায়ার মধ্যে অভিনয় করার ফল পাওয়া যায়। তারপর Reflector বা প্রতিফলনক অর্থাৎ যার উপর সূর্য্যালোক প'ড়ে আবার প্রতিবিম্বিত হয়, যেমন দর্পণ বা সোনালী ও রূপোলী পালিশ করা চক্‌চকে কোনো জিনিস ইত্যাদি—এই রকমের প্রতিফলনক বহির্দৃশ্যের ছবি তুলবার সময় ব্যবহার করা একেবারে অত্যাবশ্যকীয় হ'য়ে ওঠে। কারণ, চিত্রেয় দৃশ্যের প্রত্যেক অন্ধকার কোন্‌টি এবং অভিনেতৃদের অবয়বের যে অংশ আলোর বিপরীত দিকে থাকে সে সব সমান ভাবে আলোকিত ক'রে তোলবার একমাত্র উপায় হ'চ্ছে প্রয়োজনমত প্রচুর পরিমাণে এই 'Reflector' ব্যবহার করা। প্রয়োগশালার অভ্যন্তরে যেমন বৈদ্যুতিক আলোকের সাহায্যে বিভিন্নপ্রকার আলোর বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা চলে, ভিন্ন ভিন্ন ঔজ্জ্বল্যবর্দ্ধক Reflector এর সাহায্যে বহির্দৃশ্যেও ঠিক সেইরকমই আলোর বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা যায়। তবে, ঠিক তত সহজে এবং তেমন সূক্ষ্মভাবে করা যায় না!—কড়া আলো, নরম আলো, সামনের আলো, পিছনের আলো, মাঝের আলো, কোণা-কোণি আলো, পাশের বা ধারের আলো, সব রকম আলোই এই Reflector থেকে স্থূল ভাবে পাওয়া যেতে পারে বটে, যদি তার কৌশল জানা থাকে।

আমাদের এখানে প্রচুর সূর্য্যালোক! কিন্তু মুস্কিল এই যে সূর্য্যকে ঠিক এক জায়গায় অচল ভাবে অনেকক্ষণ পাওয়া যায় না। উদয়-অস্তের মধ্যে প্রতিমুহূর্ত্তে তার গতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আকাশের নীচেয় পৃথিবীর উপরও আলো-ছায়ার অবস্থান বদলে যায়। তা' ছাড়া এখানে মেঘেরও অভাব নেই, হুস্ ক'রে উড়ে এসে প'ড়লেই হ'লো! কুয়াসা, ধোঁয়া ও ধূলোর উৎপাত ত' আছেই। সুতরাং এ স্থলে সবচেয়ে নিরাপদ উপায় হ'চ্ছে দিনের বেলাতেও বহির্দৃশ্যের ছবি কৃত্রিম আলোর সাহায্যে তোলার ব্যবস্থা করা। তাহ'লে আর আলোর অভাবে ছবি খারাপ হ'য়ে গেলো ব'লে দৈবের দোষ দেবার দরকার হবে না। কিম্বা, কাজ ক'রতে ক'রতে আলো চলে গেলো দেখে ছবি তোলা বন্ধ ক'রতে হ'বে ভেবে আক্ষেপ করতে হবে না! কৃত্রিম আলোর ব্যবস্থা থাকলে সমস্ত দিনই কাজ করা চলবে।

রাতের দৃশ্যও আগে দিনের বেলাতেই তোলা হ'তো। তখন শুধু, ক্যামেরায় রাতের ছবি নেওয়া হ'তো একটু কম সময়ের মধ্যে Under expose করে, এবং সে ছবি ছাপা হ'ত নীল

রংয়ের ফিল্মের উপর। তাতেই কাজ চলে যেত!—কিন্তু আজকাল অনেক রকম আলোর সুবিধা হওয়াতে রাতের দৃশ্য রাত্রেই তোলা হয়। তাতে কাজেরও অনেক সুবিধা হয়। অল্প সময়ের মধ্যে ছবিখানি শেষ হ'য়ে যায়, রাত্রির অংশ আর পৃথক ক'রে ছাপতে হয় না। এবং রৌদ্রের তাত ও দিনের আলোয় কাজ করার শ্রান্তি ক্লান্তি থেকে অভিনেতা অভিনেত্রীগণ, তথা চিত্রকর ও পরিচালকও অনেকখানি অব্যাহতি পান।

আজকাল চলচ্চিত্রে আলোক-সম্পাতের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জটিল হ'য়ে উঠেছে। কারণ,—পূর্বেই বলেছি প্রত্যেক ছবি তোলবার সময় এখন একাধিক ক্যামেরা ব্যবহার করার রীতি প্রচলন হয়েছে, ক্যামেরাও হালে সব বদ্‌লে গেছে। এখন Tilting বা সব দিকে হেলানো যায় এমনতর ক্যামেরাগুলো ছবি তোলবার সময় যেন 'ভানুমতীর খেল্' দেখাবার মতো নড়ে' চড়ে' উল্টে-পাল্টে ডিগ্‌বাজী খেয়ে ছবি নেয়! কাজেই, তাদের সঙ্গে সমান ভাবে তাল রেখে আলোর চালটি দিতে পারলে তবেই ছবির 'কিস্তী' মাত করে দেবার আশা থাকে, নইলে সব মাটি! আলো নিয়ে এমনিতর ছিনিমিনি খেল্‌তে পারা কেবল তাদেরই পক্ষে সম্ভব যারা আলোক-বিজ্ঞানে ধুরন্ধর! সঙ্গীতজ্ঞের কাছে যেমন কোনো গানের পদে চোখ বুলাতে না বুলাতেই তার সুরের আভাসটিও মনের মধ্যে জেগে ওঠে, চলচ্চিত্রে সুদক্ষ আলোক-শিল্পীর কছেও তেমনি গল্পটি প'ড়তে প'ড়তেই তার কোথায় কী আলো ব্যবহার ক'রতে হবে—সে রহস্য আপনিই উদ্‌ঘাটিত হ'য়ে পড়ে—অবশ্য, যদি তাঁর সে সাধনা থাকে।

'সানরাইজের' একটি দৃশ্য—পশ্চাদ্‌ভূমিতে রাত্রের অন্ধকার আকাশে বিমানপোত দেখা যাচ্ছে। মধ্যে আলোকোজ্জ্বল 'ক্যাফে' এবং পুরোভূমিতে জনপথ। পথিকগুলিকে ছায়ামূর্তিতে দেখানো ৭১
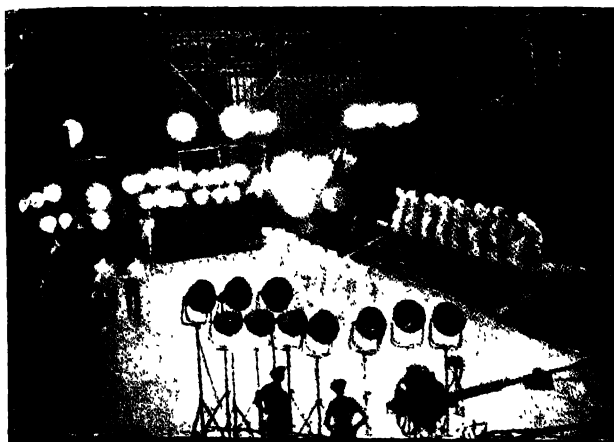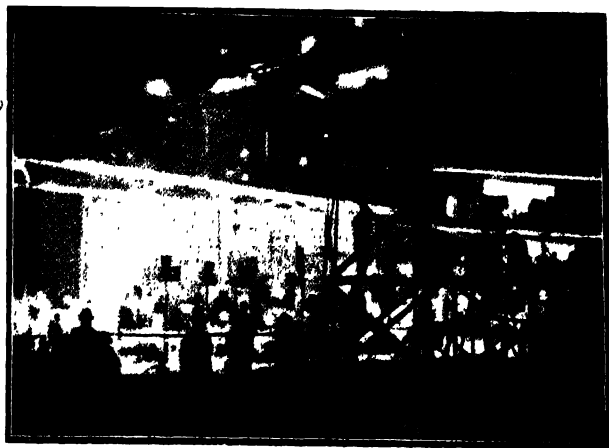
আলোক সংস্থান—'কিং অফ্‌ জাজের' একটি দৃশ্য তোলবার জন্য প্রয়োগশালার অভিনয় মণ্ডপে অসংখ্য আলোক সমাবেশ ক'রতে হয়েছে। ৭২

সংহত আলো—'লামাক্সের' একটি জটিল দৃশ্যে ঘটনার গুরুত্বের অনুকূল সংযত আলোকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৭৩
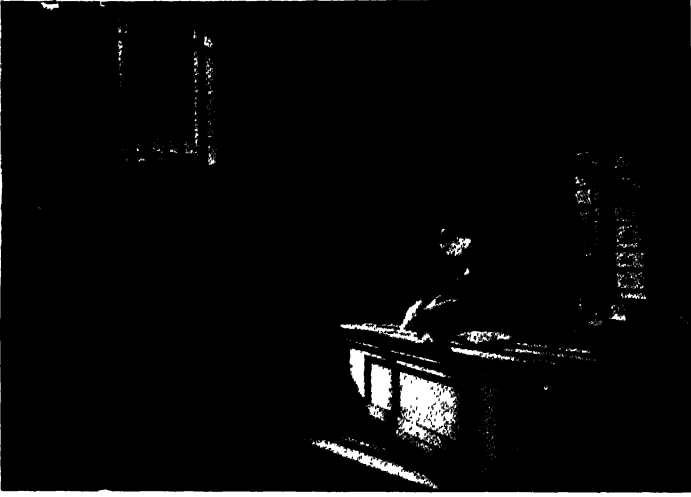
আঁধার কক্ষে হত্যা—'গ্যালান' চিত্রের এই দৃশ্যে নাট্যভূমি হত্যার উপযোগী অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন: অদূর বাতায়ন পথে ক্ষীণ আলোক রেখা এসে পড়ায় আঁধারের মধ্যেও হত্যাকাণ্ড দেখা যাচ্ছে। ৭৪

অনেকের মাঝে দু'জন—'লামাস্ত্রের একটি দৃশ্যে উপস্থিত বহুজনের মধ্যেও দু'টি নারী দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। আলোকপাতের কৌশলে সকলকেই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে কিন্তু তারই মধ্যে ওরা দু'জন যেন আরও স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। ৭৫

রাত্রের দৃশ্যে জোর আলো—'সানি সাইড্ আপের' একটি দৃশ্যে ঘটনা অনুকূল হওয়ায় রাত্রেও জোর আলো ব্যবহার করা হয়েছে। ৭৬
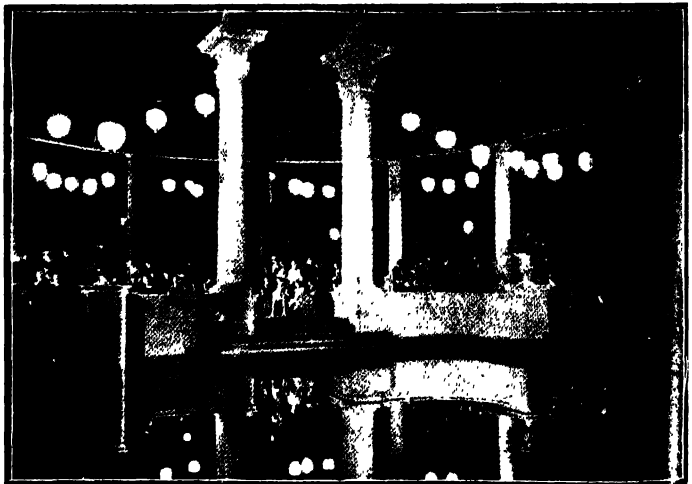
চলচ্চিত্রে রূপসজ্জা

প্রত্যেক অভিনেতা অভিনেত্রীর পক্ষে যে কোনো চরিত্র অভিনয়েই রূপসজ্জা বা 'Makeup' একটা অপরিহার্য্য ব্যাপার। 'রূপসজ্জা'কে যিনি অবহেলা করেন, তিনি যতবড় অভিনেতাই হোন না কেন, তাঁর অভিনয়ের অনেকখানি অঙ্গহানি ঘটে। অভিনেয় চরিত্রের সঙ্গে অভিনেতা যদি তাঁর আকৃতি ও বেশভূষার সামঞ্জস্য না রাখেন তাহ'লে সে অভিনয় কখনই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না। আবার কেবলমাত্র এই রূপসজ্জার গুণেই অনেক সাধারণ অভিনেতাও দর্শকদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রতে সক্ষম হন। অভিনেয় চরিত্রকে সকল দিক দিয়ে পরিস্ফুট ক'রে তু'লতে শিল্পীকে প্রধানতঃ সাহায্য করে তার নিখুঁত রূপসজ্জা।

এই রূপসজ্জার প্রয়োজন রঙ্গমঞ্চেও যেমন অস্বীকার করা চলে না, চলচ্চিত্র জগতেও যে তার আবশ্যকতা তেমনিই স্বীকার্য্য, এ কথা বলাই বাহুল্য। বরং রঙ্গমঞ্চের অভিনেতাদের চেয়ে চলচ্চিত্রের অভিনেতাদের রূপসজ্জা সম্বন্ধে অধিকতর অবহিত হওয়া দরকার। রঙ্গমঞ্চের শিল্পীদের রূপসজ্জার জন্য খুব বেশী পরিশ্রম ক'রতে হয় না, অল্প আয়াসেই তাঁরা রূপান্তর গ্রহণ ক'রতে পারেন, কিন্তু চিত্র-লোকের শিল্পীদের রূপসজ্জার জন্য প্রভূত পরিশ্রম ক'রতে হয়, কারণ, মানুষের চোখকে অতি সহজেই ঠকানো চলে, কিন্তু ক্যামেরার লেন্সের তীব্র দৃষ্টি যেমনি তীক্ষ্ণ, তেমনি সূক্ষ্ম! তাকে ঠকানো ভারি কঠিন! শিল্পীর রূপসজ্জায় যদি কোথাও খুব সামান্য ফাঁকিও থাকে, ক্যামেরার চোখে তৎক্ষণাৎ তা' ধরা পড়ে যাবে।

এই সোজা কথাটা মনে না রেখে—আমাদের দেশী ছবিগুলিতে অনেক অভিনেতাই রঙ্গমঞ্চের রূপসজ্জা নিয়ে অবতীর্ণ হয়ে ক্যামেরার সামনে অতি হাস্যাস্পদ রূপ ধারণ ক'রেছেন দেখতে পাই! যাত্রার দলের 'পরচুলো' আর ভাড়া ক'রে আনা পোষাকে বড়জোর একরাত্রি ইস্কুলের ছেলেদের সখের 'থিয়েটার' করা চ'লতে পারে, কিন্তু রূপ-দক্ষদের তা' নিয়ে 'অভিনয়' করা চলে না। 'রূপসজ্জা' ছেলেখেলা নয়। এটা শিখতে হ'লে—সাধনা করা দরকার, কারণ, শিল্প ও বিজ্ঞান এই উভয় বিষয়ে কিছুমাত্র জ্ঞান না থাকলে 'রূপ-দক্ষ' হওয়া অসম্ভব। 'হাঞ্চ্ব্যাক্ অফ্ নোতারডেম্' ছবিতে স্বর্গীয় রূপ-দক্ষ লোন্‌চ্যানী এমন জগৎ-জোড়া খ্যাতি অর্জ্জন ক'রতে কখনই পারতেন না,' যদি না রূপান্তর গ্রহণ করবার শিল্প-বিজ্ঞান-সম্মত সূক্ষ্ম তত্ত্বটি তাঁর জানা থাকতো! "A man of Thousand Faces" উপাধি পাবার যোগ্যতা তাঁর ছিল ব'লেই 'হাঞ্চ্ব্যাকে'র ভূমিকায় তাঁর রূপসজ্জা ও অভিনয় চরিত্রানুযায়ী অমন নিখুঁত হ'য়ে উঠতে পেরেছিল। সু-অভিনেতা শ্রীযুক্ত এমিল জ্যানিংস্ শুধু অভিনয়ে নয়, রূপসজ্জাতেও আসাধরণ নিপুণ! শ্রীযুক্ত জন ব্যরিমুরের রূপসজ্জাও প্রথম শ্রেণীর রূপদক্ষের উপযোগী! ফলে এই সকল অভিনেতা চলচ্চিত্র-জগতে সম্পূর্ণ সাফল্য অর্জ্জন ক'রে অপরিমেয় যশের অধিকারী হ'য়েছেন।

চিত্রলোকে সার্ব্ববর্ণিক পত্রী বা প্যান্‌ক্রোমেটিক্ ফিলম্ (Panchromatic Film) উদ্ভাবিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'রূপসজ্জা'রও রকম ব'দলে গেছে। আগে বর্ণভেদকপত্রী বা 'অর্থোক্রোমেটিক ফিল্‌মের (Orthocromatic Film) আমলে চিত্রলোকে যে রূপসজ্জা চ'লতো, এখন আর তা' একেবারেই চলে না। প্যানক্রোমেটিক্ ফিলমের বিশেষত্ব হচ্ছে এতে সব রকম রংয়েরই ছায়া ওঠে, অতএব এই ফিলম্ বা 'ছায়াবাহনে'র নাম দেওয়া যেতে পারে সার্ব্ববর্ণিক এবং 'অর্থোক্রোমেটিক্ ফিল্‌মের' নাম দেওয়া যেতে পারে বর্ণভেদক : কারণ, এই ফিল্‌ম বা ছায়াবাহনে সব রংই শুধু কালো হ'য়ে ওঠে! কোনো বর্ণই আর 'সবর্ণ' থাকে না!

সুতরাং 'সার্ব্ববর্ণিক পত্রী' প্রচলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিত্রলোকে 'সর্ব্ববর্ণাত্মক রূপসজ্জার'ও (Panchromatic Make-up) আমদানী হ'য়েছে। এই রকম রূপসজ্জার পদ্ধতি অনুসরন করলে চিত্র-নাট্যের অভিনেতারা এমন কতকগুলি বাঁধা-ধরা রংয়ের হিসাব ও ওজন পেতে পারেন, যা শুধুই বর্ণের সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য রক্ষা করে না, আধুনিক বিবিধ আলোকসম্পাতের বর্ণ-বিলোপক শক্তিকেও প্রতিহত ক'রতে পারে। এই ধরণের রূপসজ্জা আলোকচিত্রকরকেও নানা দিক দিয়ে সাহায্য করে।

রূপসজ্জার প্রধান গুণ হ'চ্ছে অভিনেতার মুখের আপত্তিজনক ক্ষত চিহ্ন, কাটা-পোড়া দাগ, কিম্বা মুখের উপরের কোনো বেমানান তিল, আঁচিল, জরুল বা আব এমন ভাবে ঢেকে ফেলা অথবা দাবিয়ে রাখা—যাতে ক্যামেরার লেন্‌সের সামনে মুখের কোনো দোষ না ধরা পড়ে! তা'ছাড়া মানুষের গায়ের যে স্বাভাবিক বর্ণ ক্যামেরায় তোলা ছবিতে ঠিক সেটা বোঝা যায় না, কিন্তু, রূপসজ্জায় নিপুণ নট অনুকূল অঙ্গরাগ ব্যবহার ক'রে—অতি সহজেই এ বাধা অতিক্রম ক'রতে পারেন। দেশ-দেশান্তরে ঘুরে রোদে জলে তেতে পুড়ে যাঁর মুখ বিবর্ণ হ'য়ে গেছে তিনি ইচ্ছা করলে ছবিতেও তাঁর মুখের সেই বর্ণবিকারের ছাপ হুবহু বজায় রাখতে পারেন যদি রূপসজ্জার কৌশল তাঁর জানা থাকে। রূপসজ্জার গুণে অভিনেতা তাঁর রূপের সকল ত্রুটীই সংশোধন ক'রে নিতে পারেন। আবার নিজের নির্দ্দোষ আকৃতিকে ইচ্ছামত বিকৃত ক'রেও তুলতে পারেন। অনেক্ষণ ক্যামেরার সামনে অভিনয় ক'রতে ক'রতে, বিশেষ আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অভিনেতৃরা ক্লান্ত হ'য়ে পড়েন। তাঁদের চোখেমুখে একটা অবসন্নতার ছাপ ফুটে ওঠে, বিরক্তি বা নিরানন্দের আভাস এসে পড়ে, একটা অবসাদ ও শ্রান্তির মালিন্যও দেখা দেয়। রূপসজ্জার প্রাথমিক ঔজ্জ্বল্যটুকুও ক্রমেই ক্ষীণপ্রভ হ'য়ে আসে। সুতরাং, অভিনয়ের ফাঁকে ফাঁকে দৃশ্য অনুযায়ী প্রত্যেক অভিনেতারই নিজ নিজ রূপসজ্জা মাঝে মাঝে চান্‌কে নেওয়া দরকার।

রূপসজ্জার কতকগুলো নির্দ্দিষ্ট বিধি নিয়ম থাকলেও প্রতিভাবান শিল্পী অনেক সময় নিজের মাথা খেলিয়ে নব নব রূপান্তর গ্রহণ করবার একাধিক সহজ ও নূতন উপায় উদ্ভাবন করে নিতে পারেন। যাঁরা এ ব্যাপারে একেবারেই অনভিজ্ঞ তাঁদের অবগতির জন্য গোটাকয়েক প্রচলিত প্রাথমিক সঙ্কেত এখানে দেওয়া যেতে পারে, যেমন—

১। প্রত্যেক অভিনেতার উচিত মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ মুণ্ডিত রাখা।

দিনেও আলোক ব্যবহার—দিনের দৃশ্যেও সকল চিত্রেই প্রয়োগ শালার মধ্যে কৃত্রিম আলোক ব্যবহার করা হয়। ৭৭
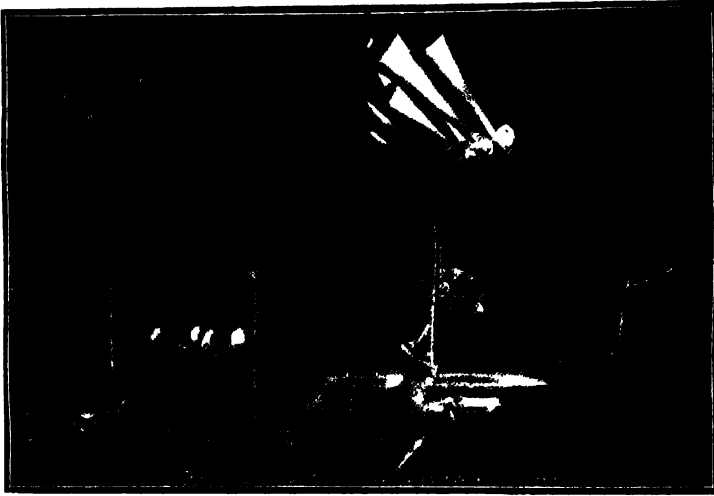
আকাশ প্রদীপ—উড়োজাহাজের আক্রমণ প্রভৃতি দেখাবার জন্য রাত্রে আকাশে আলোক নিক্ষেপের প্রয়োজন হ'লে এই আকাশ প্রদীপ যন্ত্রে সে কাজ নিষ্পন্ন হয়। ৭৮
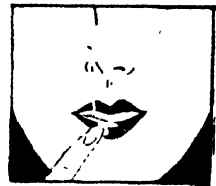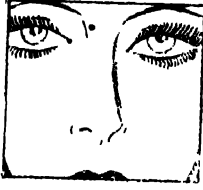
মুখে রং মাখা ৭৯

চোখের পাতায় রং মাখা ৮০

ঠোঁটে রং মাখা ৮১

১ হাই লাইট মেক আপ

আঁখি পল্লব আঁকা ৮২   (গাল নাক ও থুঁৎনি) ৮৪   ২ লোলাইট মেক আপ ৮৫

১ ২ ৩

১। স্বাভাবিক চোখের রূপ সজ্জা

২। ছোট চোখ বড় করা

নকল আঁখি পল্লব ৮৩   ৩। বুড়ো রসিকের চোখ।   ৮৯

১ ২

১ নাক (লো-লাইট মেক-আপ)   ৮৬

২ নাক (হাইলাইট মেক-আপ, বিশেষ চরিত্রাভিনয়ের রূপসজ্জা)   ৮৭

৩ নাক (মোটা নাক সরু করা, নাকের স্থূল অংশের দু-পাশে লো-লাইট)   ৮৮

১ ২ ৩ ৪

১। ঠোঁটের স্বাভাবিক রূপ সজ্জা

২। বড় ঠোঁট ছোট করা

৩। স্ফূর্ত্তিবাজের ঠোঁট

৪। দুঃখীর ঠোঁট   ৯০

২। রূপসজ্জা সুরু করার আগে মুখখানি বেশ ভাল করে সাফ্ ক'রে নেওয়া চাই। সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেললেই হবে।

৩। রং-মাখাবার আগে মুখে কোনো 'কোল্ড্-ক্রীম' মেখে নিতে পারলে ভাল হয়। যেমন 'হেজলীন' বা 'ভেনুয়ুশা' ক্রীম।

৪। তেলা-রংই (Grease paint) সর্ব্বদা ব্যবহার করা উচিত। রংয়ের টিউব থেকে সিকি ইঞ্চি পরিমাণ রং বামহাতের তালুতে নিয়ে ডানহাতের আঙুলের ডগা দিয়ে সেই রং মুখের চারদিকে তিলক ফোঁটার মতো লাগিয়ে নেবে। তেলা রং খুব কৃপণতার সঙ্গেই ব্যবহার করা উচিত, কারণ ও রং বেশী হ'য়ে গেলেই—সব 'মেক্‌আপ্' মাটি! তারপর হাতের তালু ও আঙুলের ডগা থেকে রং মুছে তুলে ফেলে, হাত দুটি' জলে-ভিজিয়ে নিয়ে সেই ভিজে হাতের আঙুল দিয়ে মুখের উপরের সেই তেলা রংয়ের তিলক ফোঁটা টেনে টেনে মুখময় সমানভাবে লেপ্‌টে লাগাতে হয়। লাগাবার সময় মুখের মাঝখান থেকে পাশের দিকে টেনে যাওয়াই নিরাপদ, কারণ রং কোথাও বেশী হ'য়ে গেলে ধারের দিকে টেনে এনে মুছে ফেলা চলে, কিন্তু মুখের মাঝখান থেকে মুছে ফেলা চলে না। আঙুল প্রতিবারই জলের বাটিতে ডুবিয়ে নেওয়া উচিত, তাহ'লে রং বেশ পাত্‌লা ও সমান হ'য়ে মুখে লাগিবে। কী রকম রং মাখতে হবে সেটা নাট্যোক্ত চরিত্রের রূপ বর্ণনা অনুযায়ী ঠিক ক'রে নিতে হবে।

৫। চোখের পাতার উপরও পাতলা ক'রে একপোঁচ রং টেনে দিতে হবে, যাতে চোখের উপর কোনো রেখা না দেখতে পাওয়া যায়। কেবলমাত্র চরিত্রোপযোগী চেহারা করবার সময় প্রয়োজনমত চোখের উপর কালো রেখা টেনে নিতে হয়। নইলে, সাধারণত চোখের পাতার উপর রং লাগাবার পর ভ্রূ আঁকবার 'অঞ্জনা লেখনী' (Dermatograph Pencil) দিয়ে শুধু চোখের পল্লবের কোল দিয়ে আঁখির প্রান্ত রেখাটুকু একটুখানি ঈষৎ টেনে স্পষ্ট ক'রে দিলেই যথেষ্ট।

৬। ঠোঁটে রং দেবার সময় ঠোঁটের ভিতর পিঠেও রং লাগানো উচিত, নইলে, হাঁচলে, কাশ্‌লে, হাসলে, হাঁ করলে রং মাখা ঠোঁট ধরা পড়ে যাবে। ঠোঁট সাধারণতঃ 'রুজ' (Rouge) ও লিপ্-ষ্টিক্ দিয়েই রং করে। মুখে পাউডার দেবার পর জিব দিয়ে যদি সন্তর্পণে ঠোঁটটি মুছে নেওয়া হয় তাহ'লে ভারি চমৎকার দেখায়।

৭। তেলা-রং লাগাবার পর চোখের কোল এবং ঠোঁটের কাজ শেষ হ'লে মুখময় থুপে থুপে পাউডার দিতে হয়। যতক্ষণ পাউডার মুখের তেলা-রংয়ের উপর সবদিকে সমানভাবে না ধরে যায় ততক্ষণ লাগানো দরকার। কোথাও যদি বেশী লেগে যায় কিছু ক্ষতি নেই, কারণ তারপরই পাউডার-ঝাড়া নরম ব্রাশ্ দিয়ে সমস্ত মুখখানি আস্তে আস্তে ঝেড়ে ফেলতেই হবে এতটুকু পাউডারের শুক্‌নো গুঁড়ো কোথাও না লেগে থাকে

৮। এইবার ভ্রূ আঁকার পালা! ভ্রূ আঁকার আলাদা পেন্সিল পাওয়া যায়। সেই ভ্রূ-লেখনী দিয়ে খুব সুন্দর ভ্রূ আঁকা হয়। পেন্সিলের সরু শিস্ ঠিক ভ্রূর চুলের মতো দাগ কাটতে পারে। তুলির সাহায্যে রং দিয়েও ভ্রূ আঁকা যেতে পারে, কিন্তু সে ঠিক স্বাভাবিক হয় না। ভ্রূ আঁকবার একরকম ছাঁচও পাওয়া যায়, তাতে বেশ ভালো কাজ হয় এবং শীঘ্রও

হ'য়ে যায়। ছাঁচের উপর তুলি দিয়ে রং মাখিয়ে সেই ছাঁচ ভ্রূর উপর চেপে ধরলেই চমৎকার ভ্রূ হয়ে যায়।

৯। তারপর, আঁখি-পল্লব নিয়ে পড়তে হবে। পুরুষ অভিনেতারা এটাতে কেউ বড় একটা মনোযোগ দেন না, দেবার তেমন দরকারও হয় না, কিন্তু মেয়েদের পক্ষে রূপসজ্জায় এটা একেবারেই অপরিহার্য্য! 'কস্‌মেটিক্' (Cosmetic) বা কান্তিপ্রলেপ দিয়ে আঁখিপল্লবকে দীর্ঘ অথবা ঘন যেমন ইচ্ছা করা যেতে পারে। কস্‌মেটিক্ একটা ছোট টিনের বাটিতে রেখে স্পিরিট ল্যাম্পে গরম ক'রে গুলে নিতে হবে। তার পর একটা কাগজের ফুঁপি কিম্বা দেশলাইয়ের কাঠি চেঁচে সরু ক'রে নিয়ে তাই দিয়ে সেই পাতলা কস্‌মেটিক্ তুলে চোখের পল্লবে লাগাতে হবে। প্রতি পল্লবটির মুখ যদি শিশির কণাযুক্ত বা ক্ষুদে পুঁথি পরাণোর মতো দেখতে হবে—এরকম করবার ইচ্ছা হয়, তাহ'লে প্রতি পল্লবের মুখে সেই গলিত কস্‌মেটিক্ ফুঁপি ক'রে তুলে বার বার লাগাতে হবে, যতক্ষণ না তার মুখে ছোট ছোট কস্‌মেটিকের দানা বাঁধে। দুটি তিনটি পল্লব কেশ একত্র ক'রে নিয়েও তার মুখে একটি ক'রে শিশির কণা বা মুক্তাবিন্দু লাগানোর মত কস্‌মেটিক্ দেওয়া চলে। প্রসাধনের দোকানে কৃত্রিম আঁখিপল্লবও অনেক রকমের কিনতে পাওয়া যায়। এইগুলি ব্যবহার করাই সবচেয়ে সুবিধাজনক। নীচের পাতা এবং ওপর পাতার প্রয়োজন মত কৃত্রিম আঁখিপল্লব কিনে এনে তাকে চোখের মাপে কেটে নিয়ে পল্লবের মুখে তুলি ক'রে গঁদ লাগিয়ে তার উপর এই কৃত্রিম আঁখিপল্লব এঁটে দিলে মানুষের চোখ ত' কোন্ ছার, ক্যামেরার লেন্‌সেও সে ছদ্ম রূপ ধরা পড়ে না!

১০। মুখের সঙ্গে হাতপায়ের মিল রাখবার জন্য ঘাড় ও গলা এবং আঙুলের ডগা থেকে আরম্ভ ক'রে কাঁধ পর্য্যন্ত হাতে এবং হাঁটু পর্য্যন্ত পায়ে ঠিক মুখের অনুরূপ রং জলে পাতলা ক'রে গুলে নিয়ে মাখা উচিত। সে রং সাবান জল দিয়ে ধুলেই উঠে যায়। মুখের তেলা রংও ভেসেলিন লাগালেই উঠে যায়। বেশ করে মুখে ভেস্‌লিন্ বা ক্রীম ঘসে ঘসে লাগিয়ে তেলা-রংটা আল্‌গা ক'রে তোয়ালে বা ঝাড়ন দিয়ে মুখটা মুছে ফেললেই পরিষ্কার হ'য়ে যাবে। তারপর একটু গরম জলে সাবান গুলে মুখটি আগে ধুয়ে নিয়ে তারপর ঠাণ্ডা জলে মুখটি ডোবালেই বেশ সুস্থ ও আরাম বোধ হবে। রূপসজ্জা করবার সময় যেমন ধৈর্য্যের সঙ্গে যত্ন নেওয়া উচিত, তোলবার সময়ও সেই রকম ধৈর্য্য ও যত্ন থাকা চাই।

বিশেষ কোনো নির্দ্দিষ্ট চরিত্র অভিনয় কররার সময় রূপসজ্জার দিকে খুব সতর্ক মনোযোগ দিতে ও বিধিমত যত্নবান হ'তে হবে। ইংরাজীতে যাকে বলে 'Character-part' এবং 'Type-part'—অর্থাৎ একটি বিশেষ কোনো মানুষের ভূমিকা—যার চরিত্রের এমন কতকগুলি গুণ ও দোষ আছে যা ঠিক সামান্য ও সাধারণ নয়,—যেমন 'ঔরঙ্গজেব' 'নাদিরশা' কিম্বা 'বুদ্ধদেব' কি 'শ্রীগৌরাঙ্গ' অথবা 'কৃষ্ণকান্ত' কি 'যোগেশ';—এদের 'Character-part' বলা চলে। Type বলে তাদের যাদের প্রকৃতি ও স্বভাব অথবা জীবনযাত্রা প্রণালী তাদের একটা কোনো দাগী বা ছাপ মারা নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ক'রে দিয়েছে! যেমন গ্যাঁড়াতলার গুণ্ডা, বা বাগ্‌দী ডাকাতের সর্দ্দার, গ্রাম্য চাষা, অথবা কয়লাখনির মজুর, বখাটে ছেলে, উচ্ছৃঙ্খল ও

১ ক্রেপ চুলের পাট খোলা ২ চুল আঁচড়ে নেওয়া ৩ চুল ছাটা ৯৩
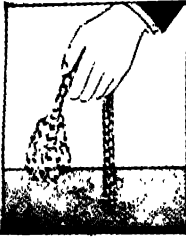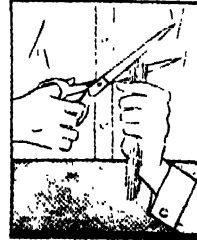
১ দাড়িতে চুল আঁটা ২ দাড়ি ছাটা ৩ সুসম্পূর্ণ দাড়ির মেক-আপ ৯৪

গোফ আঁটা ও ছাটা ৯৫
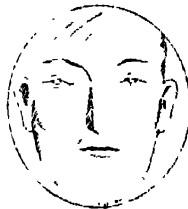
দু'চার দিন ক্ষৌরকার্য্যের অভাবে দাড়ির অবস্থা ৯৬

১ থুঁৎনি ও নাক (হাইলাইট মেক আপ) ২ থুঁৎনি ও গাল (লো-লাইট মেক আপ) ৯১
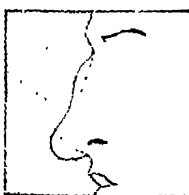
নাকের রূপান্তর ৯৭
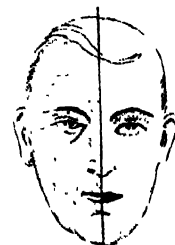
থুঁৎনির রূপান্তর ৯৮

যৌবনের জরায় রূপান্তর ৯২

সুন্দরের ভ্রূ ৯৯

শয়তানের ভ্রূ ১০০

ডাকাতের ভ্রূ ১০১

রাগীলোকের ভ্রূ ১০২

উদ্ধত অহঙ্কারীর ভ্রূ ১০৩

তোবড়ানো কাণের সরঞ্জাম ১০৪
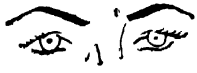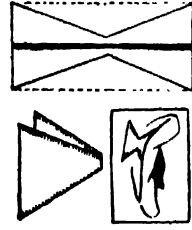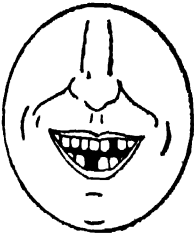
ফোগ্‌লা দাঁত ১০৫

জ্যাক ডেম্পসী (রূপ সজ্জা করছেন) ১০৬

অত্যাচারী জমীদার, পুলিশের দারোগা, জিপ্‌সি, বেদে, সাপুড়ে ইত্যাদি। এই সব ভূমিকা অভিনয় করতে হ'লে কি রূপসজ্জায়—কি অভিনয়ে কোথাও এতটুকু ফাঁকি দেওয়া চলবে না।

'Character part' অর্থাৎ কোনো 'বিশেষ চরিত্রের' ভূমিকা অভিনয় ক'রতে হ'লে অভিনেতার পক্ষে সেই চরিত্রটির সকল দিকের ভাব প্রকৃষ্টরূপে ধ্যান ধারণা করা প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। সে সম্বন্ধে প্রামাণ্য গ্রন্থাদি আলোচনা করা, চিত্রাদি অভিনিবেশ পূর্ব্বক দেখা, এক কথায় উক্তি চরিত্রের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে পরিচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। Type অর্থাৎ কোনো বিশেষ প্রকৃতির লোকের ভূমিকা অভিনয় ক'রতে হ'লেও অভিনেতাকে তাদের সম্বন্ধে সব কিছু জানতে হবে। তাদের জীবনের রীতি-নীতি, তাদের সমাজের আচার ব্যবহার তাদের কিরূপ মনস্তত্ব এ সম্বন্ধে অভিনেতাকে সম্পূর্ণরূপে অভিজ্ঞ হ'তে হবে। পুলিশের দারোগার সঙ্গে যদি তার পরিচয় না থাকে, খনির মজুরদের যদি সে কখনো না দেখে থাকে তাহ'লে তার সর্ব্বাগ্রে উচিত থানায় গিয়ে বা খনিতে নেমে এদের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করা, এদের 'প্রকৃতি' সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও গবেষণা করা। এদের চেহারা ও ধরণ ধারণ বিশেষ ভাবে ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য ক'রে হৃদয়ঙ্গম করা। এদের সঙ্গে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সে অভি-নেতার একটা একাত্মবোধ জন্মায় ততদিন পর্য্যন্ত সে এ ধরণের ভূমিকা অভিনয়ে কৃতকার্য্য হ'তে পারে না। কারণ, এই Type part অভিনয়ে নিখুঁত 'রূপসজ্জা'ও যেমন প্রয়োজন, নিখুঁত অভিনয়ও ততোধিক প্রয়োজন। এখানে সাজের সঙ্গে অভিনয়ের সামঞ্জস্য না থাকলে অভিনেতাকে হাস্যাস্পদ হ'তে হয়।

রঙ্গমঞ্চে দেখা যায়—সৈনিক, প্রহরী, দূত, পরিচারিকা, ভৃত্য প্রভৃতি ছোটখাটো অপ্রধান ভূমিকায় অভিনেতারা 'রূপসজ্জা' সম্বন্ধে মোটেই অবহিত নন। চলচ্চিত্রে কিন্তু তাঁদের এ অবহেলা বা আলস্য করা একেবারেই চলবেনা। ভূমিকা যতই ক্ষুদ্র হোক এবং ক্যামেরার সামনে থেকে যত দূরেই অভিনয় ক'রতে হোক 'রূপসজ্জা' সম্বন্ধে প্রত্যেক চলচ্চিত্রের অভিনেতাকে অবহিত হ'তে হবে। 'রূপসজ্জা'র খুঁটি-নাটী অনেক বটে, কিন্তু ছবিতে সেই সব খুঁটি-নাটি বা তুচ্ছ detiailএরও অনেক দাম। সুতরাং ওগুলো বাদ দিতে গেলেই ছবির ক্ষতি করা হবে।

রূপসজ্জায় রংয়ের বর্ণ-গাঢ়তার তারতম্য ঘটিয়ে মুখের উপর আলো ছায়ার বৈষম্য সৃষ্টির দ্বারা ইচ্ছানুরূপ রূপান্তর গ্রহণ করা যায়। রং মাখা মুখের যে যে অংশ উজ্জ্বল রাখা দরকার সেই সেই অংশ বাদ রেখে মুখের অবশিষ্ট অংশে মুখেরই রংয়ের অনুকূল অথচ অপেক্ষাকৃত গাঢ় রংয়ের পোঁচ সুকৌশলে টেনে দিলেই মুখের উপর আলোছায়ার সৃষ্টি করা যায়। একে বলে 'তীব্রালোকসজ্জা' বা high-light make-up. অনেক সময় মুখের অনেক ত্রুটী—যেমন খাঁদা নাক বা বড্ড বেশী বড়ো নাক, লম্বাটে থুঁত্‌নি, প্রকাণ্ড মুখের ফাঁদ, ছোট্ট চোখ, এ সমস্তই শুধরে নেওয়া যায় যদি কেউ রূপসজ্জায় মুখের উপর নিপুণভাবে আলোছায়ার কৌশল প্রয়োগ ক'রতে পারে।

গাল তুব্‌ড়ে বসে গেছে, চোখের কোল ঢুকে গেছে, দুই চোয়ালের গোড়া রগের কাছে

খাল হ'য়ে গেছে, এই ধরণের রূপসজ্জায় একটু কালো বা পাটকিলে রং তোবড়ানো জায়গায় লাগিয়ে, আশেপাশে যদি সাদা বা হলদে রংয়ের পোঁচ দিয়ে মুখের রংয়ের সঙ্গে শেষটা সব মিলিয়ে দেওয়া হয়, তাহ'লে সুন্দর ফল পাওয়া যায়। একে বলে 'মন্দালোকসজ্জা' বা low-light make-up। কালচে রং বলিছি বলে কেউ যেন ভাব'লে ভুষো বা খাঁটি কালো রং ব্যবহার না করেন। গ্রে, মেরুণ, বা গাঢ় ব্রাউন এই রকমের রং ব্যবহার করাই বিধেয়।

'নোজ্ পেষ্ট্' বলে এক রকম নরম প্ল্যাষ্টারের মতো পদার্থ পাওয়া যায়; এই জিনিষটির সাহায্যে নাকের চেহারা বদ্‌লে ফেলা যায়। খাঁদা নাককে উঁচু করা, ছোট নাককে বড়ো করা, সরু নাককে মোটা করা এই 'নোজ-পেষ্ট্' লাগিয়ে অনায়াসে ক'রে নেওয়া চলে। কিন্তু, মোটা নাক যদি সরু করতে হয় তাহলে নাকের মোটা অংশটুকু সুকৌশলে কাল্‌চে রংয়ের পোঁচ দিয়ে চাপা দিলেই নাক সরু দেখাবে। অবশ্য, তার আগে মুখের রংয়ের চেয়ে নাকের উপরের রং একটু হাল্‌কা করে মাখা চাই। অর্থাৎ এক্ষেত্রে hight-light make-up দরকার। নাক যদি একটু উপর দিকে ঠেলে উঁচু ক'রে তুলতে হয়, তাহ'লে নাকের নীচে দিকে নাসারন্ধ্রের মাঝখানে তেকোনা ক'রে কালচে রং টেনে দিলেই হবে।

চোখ হ'লো মানুষের মনের মুকুর! ভাবপ্রকাশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাহন। চোখ যার ভালো, চলচ্চিত্র অভিনয়ে তার সাফল্য লাভের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী। চোখের দিকে চেয়ে আমরা বুঝতে পারি সে বিষণ্ণ কি উৎফুল্ল? ক্রুদ্ধ না ভয়ভীত? ঘৃণা, লজ্জা, লালসা, লোভ, আশা, আগ্রহ, উৎসাহ, উত্তেজনা, আনন্দ, বিস্ময়—সব কিছুই পরিস্ফুট হ'য়ে দেখা দেয় মানুষের চোখের ভিতর! সুতরাং চিত্রাভিনেতাদের রূপসজ্জায় চোখের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। চোখের রং, চোখের গড়ন, চোখের অবস্থান, চোখের পল্লব ও ভ্রূ'যুগল এবং চোখের কোল হিসাব মতো চান্‌কে নিতে পারলে—চেহারা একেবারে ব'দ্‌লে যায়। Type part বা বিশেষ প্রকৃতির কোনো লোকের ভূমিকা অভিনয় ক'রবার সময় রূপকে পরিস্ফুট ক'রে তুলতে চোখই সবচেয়ে বেশী সাহায্য করে। চোখ দু'টি যদি নাকের বড্ড কাছাকাছি হয়, তাহ'লে সে চোখ সন্দেহজনক চরিত্রের লোককে চট্ করে চিনিয়ে দেয়। চোখ দুটি যদি নাকের কাছ থেকে আবার বড্ড দূরে অবস্থিত হয় তাহ'লে সে চোখ যে মানুষ আমার বন্ধু নয় এমন লোককে ধরিয়ে দেয় একেবারে চকিতের মধ্যে! চোখ যার খোলের ভিতর ঢুকে গেছে বা চোখের কোল যার বড্ড ব'সে গেছে, সে মানুষ যে সৎ ও বিশ্বাসী নয় এটা বুঝতে কারুর বিলম্ব হয় না। হিংস্র, ক্রুদ্ধ, রুগ্ন, ভয়ঙ্কর প্রকৃতি, কামুক, উচ্ছৃঙ্খল, শয়তান প্রভৃতি Type partএর রূপসজ্জায় এই রকম খোলের ভিতর ঢোকা বা বেশীরকম বসে যাওয়া চোখ খুব কাজে আসে। চোখ যার ছোট সে তা' অনায়াসে বড়ো করে নিতে পারে, কেবলমাত্র তার ছোট চোখের কিনারা ঘেঁসে যদি সে নিপুণভাবে একজোড়া বড়ো চোখের আদ্‌রা এঁকে নেয়!

কেবলমাত্র ঠোঁটের সাহায্যে মানুষ অনেক কিছু ভাব প্রকাশ ক'রতে পারে। দুঃখ, বেদনা, আঘাত, অভিমান, আনন্দ, ঘৃণা, প্রসন্নতা, প্রীতি, চিন্তা, ক্রোধ এ সবই দু'টি পাতলা ঠোঁটের রকমারি ভঙ্গীতে প্রকাশ করা যায়। ঠোঁটের সঙ্গে যদি চোখ যোগ দেয়—বাস্!

লোনচ্যানী (স্বাভাবিক মূর্ত্তি ও বিভিন্ন রূপান্তর) ইনি "শতমুখমানব" নামে খ্যাত ছিলেন

শ্রীমতী ফাজেন্দা (ইনি রূপসী কিন্তু চিত্রে নামেন কুরূপা সেজে) ১০৮

বেনটার্পিন—(স্বাভাবিক মূর্ত্তি ও গোফ সংযোগে রূপান্তর) ১১০

তাহ'লে কোনো অভিনেতাকেই মুখে আর কিছু ব'লে বোঝাতে হয় না! সে যা ব'লতে চায় তা' বলবার অনেক আগেই তার চোখমুখের ভঙ্গী সে কথা আমাদের জানিয়ে দেয়। মেয়েরা অতি সহজেই তাঁদের অধরোষ্ঠকে মদনের ফুলধনু করে তোলেন কেবলমাত্র রুজ্ ও লিপ্ ষ্টিক (ঠোঁটে মাখাবার রংয়ের বাতি) ব্যবহার ক'রে। যাঁদের ঠোঁট পুরু ও মোটা তাঁরা রংয়ের সাহায্যে সে ত্রুটি সংশোধন করে নেন। ঠোঁটের খানিকটা অংশও তাঁরা মুখের রং দিয়ে ঢেকে বাকীটুকুতে পরিপাটি করে রুজ দিয়ে সুন্দর ঠোঁট এঁকে নেন। আকর্ণ-বিশ্রান্ত অধরকে তাঁরা সুকৌশলে ঢেকে ছোট করে নেন, আবার ছোট্ট ঠোঁট দু'খানিকে তুলি ও রংয়ের টানে ইচ্ছামত বাড়িয়ে নিতে পারেন। পুরুষদের বড়ো একটা রুজ ব্যবহার করবার প্রয়োজন হয় না। যদি কেউ ব্যবহার করেন তা'হলে তাঁদের লক্ষ্য রাখা উচিত যেন মেয়েদের ঠোঁটের মত তাঁদের অধরোষ্ঠ মদনের ফুলধনু না হ'য়ে ওঠে। যাঁদের উপরের ঠোঁট নীচের চেয়ে বড়ো বা নীচের ঠোঁট সামনের দিকে বেশী ঝুলে পড়া তাঁদের মুখে রং মাখবার সময় বড় ঠোঁটের উপর একটু ঘন বা ঘোর রং মাখা উচিত এবং ছোট ঠোঁটে হাল্কা বা পাতলা রং লাগানো দরকার তাহলে আর এই ছোট বড়োর অসামঞ্জস্যটুকু থাকেনা, ঢাকা পড়ে যায়। যদি বেশ ফুর্ত্তিবাজ বা সদা-প্রফুল্ল ও সুরসিক লোকের ভূমিকা অভিনয় ক'রতে হয়, তাহ'লে অধর দেশের উভয় প্রান্তরেখা একটু বেঁকিয়ে ঈষৎ উপর দিকে তুলে দিলেই উক্ত চরিত্রের অনুকূল অতি চমৎকার একটা আকৃতিগত রূপান্তর ঘটে, আবার ওই অধরপ্রান্তই যদি নীচের দিকে ঝুলিয়ে নামিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে সে মুখ দেখলেই মনে হবে এ লোকটি জীবনযুদ্ধে পরিশ্রান্ত ক্লান্ত বেদনাজর্জ্জর বা নিতান্ত দুর্গত এক অভাগা।

মানুষের মুখের থুঁত্নী দু'তিন রকমের বেশী আর দেখতে পাওয়া যায় না। হয় উপরদিকে ঠেলে ওঠা, নয়ত' ভিতরদিকে চেপে বসা, অথবা মধ্যে একটি রেখা প'ড়ে দ্বিধাবিভক্ত, কিম্বা নীচের দিকে ঝুলে পড়া লম্বাটে থুঁত্নি। উপর দিকে ঠেলে ওঠা থুঁত্নি হয় ছুঁচ্লো, নয় চৌকো বা গোল-গাল গড়নের দেখা যায়। প্রয়োজনমত 'প্রসাধনপঙ্ক' অর্থাৎ 'নোজ পেষ্টের' সাহায্যে ছুঁচ্লো থুঁত্নিকে চৌকো বা গোল-গাল করে নেওয়া চলে, আবার চৌকো বা গোলগাল থুঁত্নিকেও ছুঁচ্লো ক'রে তোলা যায়। রং মাখবার সময় রং লাগাবার একটু মারপ্যাঁচ করতে পারলেও অভিনেতা তাঁর অভীষ্ট ফল লাভ ক'রতে পারবেন। ছুঁচ্লো থুঁত্নির ছুঁচোলো ভাগটুকু কাল্চে রংয়ে ঢেকে থুঁত্নিকে ইচ্ছামত রূপ দেওয়া যেতে পারে। আবার যাদের থুঁত্নি নেহাৎ ছোট, তারা যদি মুখের চেয়ে থুঁত্নির উপর রংটা আরও বেশী হাল্কা ক'রে লাগান তাহ'লেই সুফল পাবেন।

সাধারণতঃ বয়স বেশী দেখাবার জন্য অভিনেতাদের চোখেমুখে 'বলি-রেখা' আঁকতে দেখা যায়। 'বলি-রেখা' আঁকবার সহজ উপায় হ'চ্ছে মুখে রং মাখা হবার পরই মুখখানি বিকৃত ও সঙ্কুচিত করলেই বলিরেখার অবস্থান দেখতে পাওয়া যায়। সেই সেই অংশে পেন্সিলের দাগ দিয়ে নিয়ে পরে যদি গাঢ় রক্তবর্ণের কিম্বা পাট্কিলে রংয়ের আঁচড় টেনে দেওয়া হয়, তাহ'লেই মুখমণ্ডলে 'বলিরেখা' বেশ সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে।

গোঁফ অনেক সময় অনেক মানুষের প্রকৃতি ও চরিত্রের আভাস দেয়। যেমন—সৌখীন-

বাবুর গোঁফ প্রায় কার্ত্তিক ঠাকুরের মতো! অর্থাৎ দু'ধার বেশ তা' দিয়ে ঘুরিয়ে পাক দিয়ে রাখা। পরচুলের তৈরি গোঁফ টিপকল সংযোগে নাকের ডগায় না এঁটে বাজারে একরকম 'ক্রেপ' চুল পাওয়া যায় তাই এনে কাঁচি দিয়ে ছেঁটে কেটে 'স্পিরিটগাম্' দিয়ে ঠোঁটের উপর এঁটে দিলেই সে গোঁফ আর কৃত্রিম ব'লে মনে হবেনা। দাড়ির সম্বন্ধেও ঠিক এই ব'বস্থাই করা উচিত। 'নূর', 'ফ্রেঞ্চকাট্' দাড়ি, চাঁপ দাড়ি, গালপাট্টা দাড়ি, ঝোলা দাড়ি, লম্বাদাড়ি, ছাগলদাড়ি, খোঁচা দাড়ি (কামানোর অভাবে) মোগলাই দাড়ি, কাব্‌লি দাড়ি- তপস্বী দাড়ী প্রভৃতি যতরকম দাড়ি দেখতে পাওয়া যায়, সব রকমই ঐ 'ক্রেপ' চুলের সাহায্যে 'স্পিরিট্‌গাম্' দিয়ে এঁটে তৈরি করে নেওয়া যায়। দু'চারদিন না কামালে যেরকম অল্প অল্প দাড়ি হয় সেটা অনেক সময় দাড়িতে গ্রে-ব্লু বা রেড-ব্রাউন্ রংয়ের পোঁচ দিয়ে নিলেই হ'য়ে যায়। চুল ব্যবহার করবার দরকার হয়না। ফুটো ফুটো রবারের স্পঞ্জে পূর্ব্বোক্ত যে কোনোরকম একটা রং মাখিয়ে নিয়ে দাড়িতে ছাপ দিলেই দু'চারদিন দাড়ী কামানো হয়নি এই রকম দেখতে হয়। গোঁফ তৈরি ক'রে নেবার সময় বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা উচিত অভিনেয় চরিত্রটির দিকে। কারণ, পূর্ব্বেই ব'লেছি যে গোঁফ অনেক সময় মানুষের চরিত্র ও প্রকৃতির পরিচয় দেয়। গুণ্ডা পালোয়ানের গোঁফ, লোচ্চা বদমায়েসের গোঁফ, সাধু সচ্চরিত্রের গোঁফ, ইত্যাদির এমন একটা বিশেষ রূপ আছে যা দেখবামাত্রই মানুষটির ভিতরকার পরিচয় পাওয়া যায়।

ভ্রূ যেমন মুখের সৌন্দর্য্যকে বাড়ায়, তেমনি ভ্রূর গঠন মানুষের প্রকৃতিরও পরিচয় দেয়। রাগী মানুষের ভ্রূ, অহঙ্কারী মানুষের ভ্রূ, দস্যুর ভ্রূ, সয়তানের ভ্রূ, সুন্দরের ভ্রূ, সবেরই একটা বিশেষ ভঙ্গী আছে। ছবিগুলি দেখলেই তা' বোঝা যাবে।

মুখে কোনো আঘাতের চিহ্ন দেখাতে হ'লে দু'রকম উপায়ে তা করা যায়, 'নোজপেষ্ট' লাগিয়ে বা 'কলোডিয়ন্' ব্যবহার করে। আঘাতও দু'রকমের হয়, অস্ত্রক্ষত, কিম্বা মুষ্টাঘাত! অর্থাৎ কালশিরা-পড়া ফুলে ওঠা কিম্বা কাটা দাগ। ফুলেওঠা ও কালশিরার চিহ্ন ক'রতে হ'লে 'নোজপেষ্ট' লাগিয়ে তার উপর গ্রে-ব্লু রংয়ের পোঁচ দিলে সহজেই তা করা যায়। কাটাদাগ করতে হ'লে অনমনীয় অর্থাৎ শক্ত কলোডিয়ন (Non Flexible collodion) ব্যবহার করাই বিধেয়, কারণ, তাতে উক্ত ক্ষতচিহ্ন একবারে অবিকল স্বাভাবিক দেখায়। ক্ষতচিহ্ন গভীর দেখাবার প্রয়োজন হ'লে তিনচারবার কলোডিয়ন লাগাতে হবে। একবার লাগাবার পর সেটি সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেলে তবে তার উপর আর একবার লাগাতে হয়। এমনি ক'রে তিন চারবার বা যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রয়োজনমত গভীর দেখতে না হয়, ততবার তুলি দিয়ে মোটা কলোডিয়নের পোঁচ লাগালেই ক্ষতচিহ্ন স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে!

কাণ কারুর কারুর কাটা তোবড়ানো বা জোড়া দেখতে পাওয়া যায়। জোড়াকাণ কাটা দেখাতে হ'লে জোড়ের মুখে কাল্‌চে রংয়ের পোঁচ দিতে হয়। কাটা কাণ জোড়া ক'রতে হ'লে 'নোজপেষ্ট' দিয়ে কাটা অংশ জুড়ে নিলেই চলে। কিন্তু তোবড়ানো কাণ দেখাতে হ'লে একটু খাটতে হবে। এক ইঞ্চি কি দেড় ইঞ্চি লম্বা এবং আধ ইঞ্চি চওড়া একখানি পিস্‌বোর্ড ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে সেইভাবে কেটে নিতে হবে। মাঝখানে একটি

চেষ্টার কঙ্ক্লিন—স্বাভাবিক মূর্তি
ও রূপান্তর। ১১১

জ্যাক ডাফী—কেবলমাত্র দাড়ি ও
চোখের মেকআপে এই যুবকের
কী রূপান্তর ঘটে আধখানা
মুখে হাত চাপা দিলে
বোঝা যাবে। ১০৯

এ্যাল জন্‌সন—স্বাভাবিক মূর্ত্তি ও রূপান্তর। ১১৩

স্নাব পোলার্ড—স্বাভাবিক মূর্ত্তি
ও রূপান্তর। ১১২

মাথার কাঁটা লম্বা দিকে বসিয়ে আটা লাগানো ফিতে (adhesive tape) দিয়ে আটকাতে হবে। ফিতের দু'মুখ একটু একটু বেরিয়ে থাকা দরকার। এইবার পিসবোর্ডখানি ছবিতে যেমন দেখানো হ'য়েছে সেইভাবে মাঝামাঝি ভাঁজ করে মুড়ে নিতে হবে। তার পর সেই পিস্‌বোর্ডের অর্দ্ধেক মাথার সঙ্গে ও অর্দ্ধেক কাণের সঙ্গে এমনভাবে এঁটে নিতে হবে যাতে কাণটি কোণাকোণি তুবড়ে যায়। তারপর তার উপর 'নোজ-পেষ্ট' দিয়ে রং ক'রে, তোবড়ানো কাণটির চেহারা সম্পূর্ণ করে নিতে হবে।

খারাপ দাঁত অনেক সময় মুখের সৌন্দর্য্য নষ্ট করে। দাঁত যদি অসমান হয়, ফাঁক্ ফাঁক্ হয়, তা'হলে 'গাটাপার্চা' দিয়ে সে দোষত্রুটী সেরে নেওয়া চলে। দাঁত যদি দাগী ও কালো হয় তাহ'লে সাদা 'টুথ-এনামেলের' সাহায্যে তাকে মুক্তোর মত চক্‌চকে করে নেওয়া যায়। যদি ফোগ্‌লা দাঁত ক'রতে হয়, তাহ'লে কালো টুথএনামেলের সাহায্যে যে কোনো দাঁত ঢেকে ফেললেই দাঁত পড়ে গেছে বলে মনে হবে।

রূপসজ্জার জন্য নিম্নলিখিত উপকরণগুলি প্রত্যেক নট নটীরই হাতের কাছে রাখা দরকার। গ্রীজপ্যেণ্ট বা তেলা রং, লাইনিংয়ের রং বা মুখের জমীর রং, পাউডার, রুজ, লিপষ্টিক্, ফিঁকে রুজ, কোল্ড ক্রীম্, সাদা রং, ভূষো, নোজ-পেষ্ট, পাতলা রং, কালো মুখোসের ও সাদা মুখোসের রং, টুথ এনামেল (সাদা ও কালো), স্পিরিটগাম্, ক্রেপচুল, কলোডিয়ন, কাঁচি, ছুরি, তুলি, পাফ, প্যাড, চিরুণী, ব্রাস্, তোয়ালে, সাবান, তেল, গরমজল, তিলকমাটি, চন্দন, সিঁদুর, আলতা, কালি, সুরমা, ডারমেটোগ্রাফ পেন্সিল, কাগজের ফুঁপি, চকখড়ি, কাঁটা, সূতো, উল, তুলো ইত্যাদি।

চলচ্চিত্রের স্বরোদয়

ছবিও যে একদিন কথা কইবে এ কথা কে জানতো। দশ বছর আগেও এ রকম সম্ভাবনার ভবিষ্যদ্বাণীকে আমরা কল্পনা-বিলাসীর স্বপ্ন বলে উড়িয়ে দিতে একটুও ইতস্ততঃ করি নি। কিন্তু যা আমাদের ভাবনায় সেদিনও পর্য্যন্ত একান্তই অসম্ভব ছিল, প্রতীচ্যের বৈজ্ঞানিকদের পরীক্ষাগারে তা প্রত্যক্ষ সত্য হ'য়ে উঠেছিল তার অনেক আগেই।

যে ছায়া ছবি ছিল এতদিন একটি বোবা মেয়ে, তার মুখে প্রথম কথা ফোটালে কে?—এর অনুসন্ধান করতে বসলে আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, একাধিক বৈজ্ঞানিকের দীর্ঘকালের সাধনা ও তপস্যার ফলেই এই মূক মোহিনী আজ এমন মুখরা হ'য়ে উঠেছে! মাত্র একজনের চেষ্টায় এটা সম্ভব হয়নি।

১৮৫৭ খৃঃ অব্দে ফরাসী বৈজ্ঞানিক লেওন স্কট (Leon Scott) সর্ব্বপ্রথম 'স্বর-তরঙ্গ'কে (Sound-waves) তাঁর উদ্ভাবিত 'স্বতঃশব্দ লেখন' যন্ত্রে (Phonautograph) ধরে রাখতে সক্ষম হ'য়েছিলেন; কিন্তু তাঁর সেই যন্ত্র-লগ্ন ভুশো-কাগজের (Smoked paper) আঁধার বক্ষে শব্দ তরঙ্গ তার যে কম্পন-রেখা (wavy lines) এঁকে রেখে ছিল, স্কট্ তাকে কিছুতেই আর পুনর্ধ্বনিত (reproduce) করে তুলতে পারেননি। তারপর বিশ বৎসর বাদে এলেন বিজ্ঞানাচার্য্য এডিসন। ১৮৭৭ সালে তাঁর উদ্ভাবিত 'স্বর-লেখন' (Phonograph) যন্ত্রের সাহায্যে তিনি দেখালেন যে, যে কোনো শব্দকে শুধু ধরে বন্ধ করে রাখা নয়, তাকে আবার ইচ্ছামত পুনর্শব্দায়িত করে তোলাও যায়!

শব্দকে ধরে রাখা এবং তাকে ইচ্ছামত পুনঃপ্রকাশ করবার যে কৌশল মহর্ষি এডিসনের আয়ত্ত হ'য়েছিল, তারই প্রেরণা থেকে তিনি ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে, অর্থাৎ 'স্বর-লেখন' (Phonograph) যন্ত্র আবিষ্কারের পর প্রায় দশ বৎসর চেষ্টা করে চলচ্চিত্র দেখাবার উপযোগী যন্ত্র উদ্ভাবন করেছিলেন। তাঁর প্রাণপণ চেষ্টা ছিল যাতে শব্দকে শুধু শ্রবণেন্দ্রিয়ের সীমার মধ্যে আবদ্ধ না রেখে সঙ্গে সঙ্গে তাকে দর্শনেন্দ্রিয়েরও গোচর করা যায়, এমন কোন যন্ত্র উদ্ভাবন করা। তাঁর এ চেষ্টা অনেকখানি সফল হ'য়েছিল;—তিনি স্বরতরঙ্গকে বন্দী ক'রতে ও জড় প্রকৃতিকে সজীব করে তুলতে পেরেছিলেন, কিন্তু, উভয়ের অন্তরঙ্গ মিলন আশানুরূপ সুসম্পূর্ণ ক'রে তুলতে পারেন নি। তাঁর উদ্ভাবিত Kineto phone ('গতি-স্বরধর' যন্ত্র) এবং Cameraphone (ছায়া-স্বরধর যন্ত্র) কোনোটাই তাঁর Gramophone (স্বর-লেখন) যন্ত্রের মতো সাফল্য অর্জ্জন করে নি। শেষ পর্য্যন্ত তাঁর এই 'গ্রামোফোন'ই মূক চলচ্চিত্রকে মুখর হ'য়ে উঠতে সবিশেষ সাহায্য ক'রেছে। তা'ছাড়া, এডিসনের উদ্ভাবিত 'তাপ-জ্যোতির্দীপ' (Incandescent Lamp) বর্ত্তমান সবাক চলচ্চিত্র-যন্ত্রের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। এই

এমিল জ্যানিংস্—স্বাভাবিক মূর্তি। ১১৪

'ফাউষ্ট' চিত্রে—মেফিস্টো-ফেলিসের বেশে। ১১৬

'লাষ্ট কম্যাণ্ড' চিত্রে—রাশিয়ান সেনাপতির বেশে। ১১৭

'ভ্যাডেভিলে' চিত্রে—ব্যায়ামবীর বেশে। ১১৫

'লাষ্ট লাফ্' চিত্রে—বৃদ্ধ দ্বার্-রক্ষক। ১১৮

'নীরো'র ভূমিকায় ১১৯

১। ওয়ে অফ অল ফ্লেশ চিত্রে—বৃদ্ধ পিতা

২। এ্যান বলিন চিত্রে ১২০

স্বরতরঙ্গের ছায়াছবি (শব্দপত্রী)

(১) নারীর কণ্ঠস্বর

(২) ঐকতানবাদন শব্দ

(৩) দ্বিচক্র যানের ঘণ্টাধ্বনি ১২১
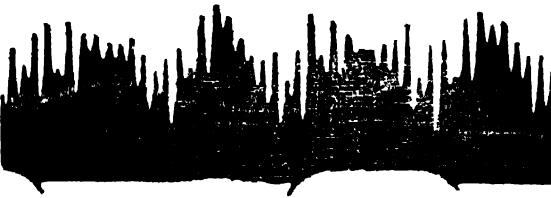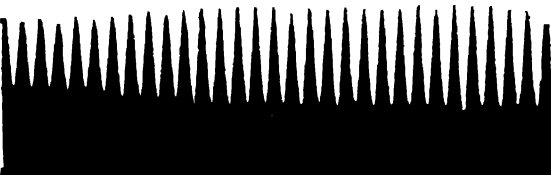
রকম নানা দিক দিয়ে এডিসন চলচ্চিত্রকে সবাক্ ক'রে তোলায় সাহায্য করেছেন বটে, কিন্তু সবাক্ চলচ্চিত্র সম্ভব হওয়ার পক্ষে সেইটুকুই যথেষ্ট বলা যেতে পারে না।

১৮৬৭ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডের বৈজ্ঞানিক ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল্ ভবিষ্যদ্বাণী ক'রেছিলেন যে, শীঘ্রই এমন একদিন আসবে, যখন বৈদ্যুতিক শক্তিকে বিনা-বাহনে প্রবাহিত করা সম্ভব হবে। ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে আমেরিকার শ্রীযুক্ত এ্যালেক্জাণ্ডার গ্রেহাম বেল 'টেলিফোন' (দুর-স্বরা) যন্ত্র উদ্ভাবন ক'রলেন। বৈদ্যুতিক তারের সাহায্যে দুরের লোকের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হ'লো। তারপর ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে জার্ম্মাণ বিজ্ঞান-সাধক হায়েনরিক্ হার্টজ্ (Heinrich Hertz) ম্যাক্স্ ওয়েলের ভবিষ্যদ্বাণী সফল করলেন। বিনা-বাহনে বিদ্যুৎ-তরঙ্গকে তিনি শূন্যপথে প্রবাহিত ক'রে বেতারের জন্ম সম্ভব ক'রে তুললেন। তখন ইটালীয়ান সাধক মার্কণী প্রভৃতি বিশিষ্ট বিজ্ঞান-সেবীদের ঐকান্তিক চেষ্টায় 'Radio' (বেতার-যন্ত্র) গড়ে উঠ্লো।

কিন্তু উপরোক্ত যন্ত্রগুলির কোনটাই তখনও কাজের হিসাবে সুসম্পূর্ণ হ'য়ে উঠবার শক্তি সঞ্চয় করতে পারে নি। 'টেলিফোন্' তখনও পর্য্যন্ত ঠিক দুরকে নিকট করতে পারে নি, নিকটকেই বরং নিকটতম ক'রে তুলছিল। 'ফনোগ্রাফ' তখনও পর্য্যন্ত কাণে কাণে অস্পষ্ট কথা বলছিলো। আর 'রেডিয়ো' তখনও পর্য্যন্ত সদ্যজাত শিশু! সবই ছিল তখন, কেবল ছিল না সেই শক্তিটুকু যার জোরে বলীয়ান হ'য়ে টেলিফোন্, ফনোগ্রাফ বা বেতার সর্ব্বজনের শ্রবণ-সাধ্য হয়ে উঠতে পারে!

এই সময় জার্ম্মাণীর জড়-বৈজ্ঞানিক এবং রসায়নাচার্য্যরা কেউ কেউ আবিষ্কার করেছিলেন যে 'সিলেনিয়ম্' নামক ধাতুর বিদ্যুৎবাহিকা শক্তি তদুপরি প্রতিফলিত আলোক শিখার ঔজ্জ্বল্যের তারতম্য অনুসারে বাড়ে ও কমে! এই রহস্য জানার ফলে 'সিলেনিয়ম-কোষ' (Selenium Cell) তৈরি হয়েছিল, যা এখনও ছবির রাজ্যে প্রভূত প্রয়োজনে ব্যবহার হয়। তারপর তৈরি হ'লো—Photo-electric Cell, (আলোক-বৈদ্যুতিক কোষ) একটি নিবাত গোলকের (Vacuum globe) খোলের ভিতর দিকে যদি একপুরু করে পটাসিয়ম (Potassium) অথবা ক্যেশিয়ম (Casium) প্রভৃতি ধাতুর পোঁছ লাগিয়ে নেওয়া যায় তাহ'লেই 'আলোক-বৈদ্যুতিক কোষ' তৈরি হয়। শব্দবিশ্বের বিপুল প্রসার এবং উহার সন্নবিরত ও বিচিত্র ক্রমবিকাশ পুনর্ব্যক্ত করবার সময় 'আলোক-বৈদ্যুতিক কোষ' নানা ভাবে সাহায্য করে, কাজেই, আজকাল 'সিলেনিয়ম কোষে'র পরিবর্ত্তে অধিকাংশ স্থলে 'আলোক-বৈদ্যুতিক কোষ'ই ব্যবহার হ'চ্ছে। 'আলোক-বৈদ্যুতিক কোষ' যখন প্রথম উদ্ভাবিত হ'লো তখন এর ভিতর আলোর দ্বারা উত্তেজিত হ'য়ে যে পরিমাণ তড়িৎশক্তি উদ্ভূত হ'তো তা' এত অল্প যে কোনো কাজেই লাগতো না। জন এম্ব্রোজ ফ্লেমিং নামে একজন ইংরেজ তখন Two-element Vacuum Tube (দ্বৈত-প্রকৃতির-নিবাত চোঙ্) উদ্ভাবন করেন এবং ফরাসী ডাক্তারলী ডি ফরেষ্ট্ তার প্রভূত উন্নতি সাধন ক'রে ঐ নিবাত চোঙ্কে ত্রয়োগুণ সম্পন্ন ক'রে তোলেন। ১৯০৬-৭ সালে এই লী ডি ফরেষ্টের 'শ্রবণী' (Audion) যন্ত্রই Radio-Telephone বা বেতার বার্ত্তার জন্য ব্যবহার করা হ'ত।

ত্রয়োগুণসম্পন্ন নির্বায়ু-চোঙ্ উদ্ভাবিত হবার ফলে যখন Amplifier (শব্দবর্দ্ধনী-যন্ত্র) সৃষ্টি

হ'লো তখন মানুষ তার নানা কাজে বিদ্যুতের সাহায্য পেয়ে তার কাছে যেন এক অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ হ'লো! এরই জোরে শক্তিশালী হ'য়ে বাংলার লোক আজ বোম্বাইয়ের বন্ধুর সঙ্গে টেলিফোনে কথা ব'লতে পারছেন। ১৯১৫ সালে প্রথম মানুষের কণ্ঠস্বর বেতার-আলাপে (Radio-Telephone) দেশ-দেশান্তরে ও সাগরপারে পর্য্যন্ত পাঠানো সম্ভব হ'লো। 'শব্দবর্দ্ধনী যন্ত্র' এসে শব্দের চরণ থেকে শিকলের বাঁধন খুলে দিলে। যার শক্তি ছিল সীমাবদ্ধ তার গতি হ'য়ে গেলো অসীম! একজন মানুষ খুব চেঁচালেও বেশী লোক তা' শুনতে পায় না। বিরাট সভা সমিতিতে গেলে মানুষের কণ্ঠস্বরের কতটুকু পর্য্যন্ত পৌঁছাবার শক্তি সেটা বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। বৈজ্ঞানিকেরা মেপে দেখে বলেছেন যে মানুষের কণ্ঠস্বরের শক্তি এক ওয়াটের' (Watt—বৈদ্যুতিক শক্তির পরিমাপ) দশলক্ষ ভাগের দশভাগ মাত্র! আমাদের ঘরে যে বিজলী বাতি জ্বলে, সাধারণতঃ তার এক একটির বৈদ্যুতিক শক্তির পরিমাপ হচ্ছে মাত্র ষাট ওয়াট্। সুতরাং এর সঙ্গে তুলনা করলে বেশ সহজে বুঝতে পারা যায় যে মানুষের কণ্ঠ স্বরের দৌড় কতদূর পর্য্যন্ত, অর্থাৎ, কত তুচ্ছ বা নগণ্য তার শক্তি! কিন্তু এই তুচ্ছ কণ্ঠস্বরকেই Radio Brooad-casting Co. (বেতার-আলাপ প্রচারক কোম্পানী) আজ শব্দবর্দ্ধনী-যন্ত্রের সাহায্যে দূর দেশান্তরেও ধ্বনিত ও শ্রুত হওয়া সম্ভব ক'রে তুলেছেন।

ধ্বনির ন্যায় চিত্র বা প্রতিকৃতিও বৈদ্যুতিক তারের সাহায্যে দূর দেশে পাঠানোর কল্পনা ১৮৪৭ খৃঃ অব্দের বৈজ্ঞানিকগণের মাথায় এসেছিল দেখা যায়; কিন্তু ১৯৯৮ সালের আগে এ ব্যাপার কার্য্যে পরিণত হয়নি! নরওয়ের বৈজ্ঞানিক ন্যুড্সেন্ (Knudsen) প্রথম তড়িৎ সঞ্চালনে দূরান্তরে চিত্র প্রেরণে সমর্থ হ'য়েছিলেন। আজ অবশ্য নিউইয়র্ক বা আমেরিকা যুক্তরাজ্যের অন্য যে কোনো বড়ো শহরের টেলিগ্রাফ অফিসে গিয়ে যদি একখানি ফটোগ্রাফ দিয়ে আসা হয় তাহ'লে দু'এক ঘণ্টার মধ্যে সে ছবি তারা প্রেরকের ইচ্ছানুযায়ী হাজার হাজার মাইল দূরের অন্য একটি শহরে পাঠিয়ে দিতে পারবে। এই যে টেলিগ্রাফে ছবি পাঠানো এটা শুনতে যত সহজ, কাজে তত সহজ নয়। এর জন্য অতি সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্ম্মাণ ক'রতে হয়েছে। সকলেই জানেন বোধহয় যে 'রেখা' হচ্ছে বিন্দুর সমষ্টি মাত্র! ছবি পাঠাবার সময় টেলিগ্রাফ্ অফিসকে চিত্রের প্রত্যেক রেখার প্রতি বিন্দুটি তড়িতবহ তারের সাহায্যে গন্তব্যস্থলে পাঠাতে হয়, সেখানে আবার ঐ বিন্দুগুলি ঠিক ছবির রেখার অবস্থান অনুযায়ী সমান ঘন হয়ে পরের পর বসা চাই। আলোক চিত্রের আলো বিদ্যুতে রূপান্তরিত করে নিতে হয় এবং সেই বিদ্যুৎপ্রবাহ তার-যোগে পাঠাবার পর গন্তব্যস্থানে পৌঁছলে তাকে আবার আলোয় পুনঃ পরিবর্ত্তন করে নেওয়া চাই। তবেই ছবি পাওয়া সম্ভব হয়।

এই যে Telephotography বা 'দূরালোকচিত্র' এর সঙ্গে বর্ত্তমান প্রবন্ধের খুব নিকট সম্পর্ক রয়েছে। কারণ, নীরব চিত্র সরব হ'য়ে ওঠার মূলে এই 'দূরালোকচিত্রের' প্রেরণা খুব বেশী কাজ ক'রেছে। ১৯২২ থেকে ১৯২৫ সালের মধ্যে অবাক্ ছবি 'সবাক্' হয়ে দেখা দিয়েছিল বটে, কিন্তু তখনও তার সম্পূর্ণ স্বরোদয় হয়নি। ডি ফরেষ্টের phonofilm (শব্দপত্রী) এবং জেনারেল ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানির Pallophotophone (স্বর-চিত্র চক্র) সে সময় সবাক ছবির পক্ষে সবিশেষ উপযোগী যন্ত্র বলে বিবেচিত হয়েছিল। তারপর ১৯২৬ সালের আগষ্ট
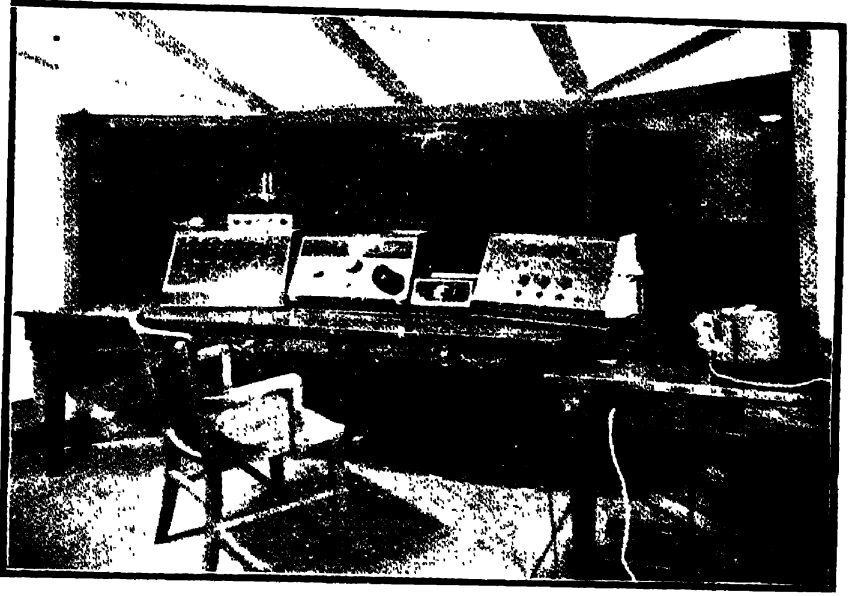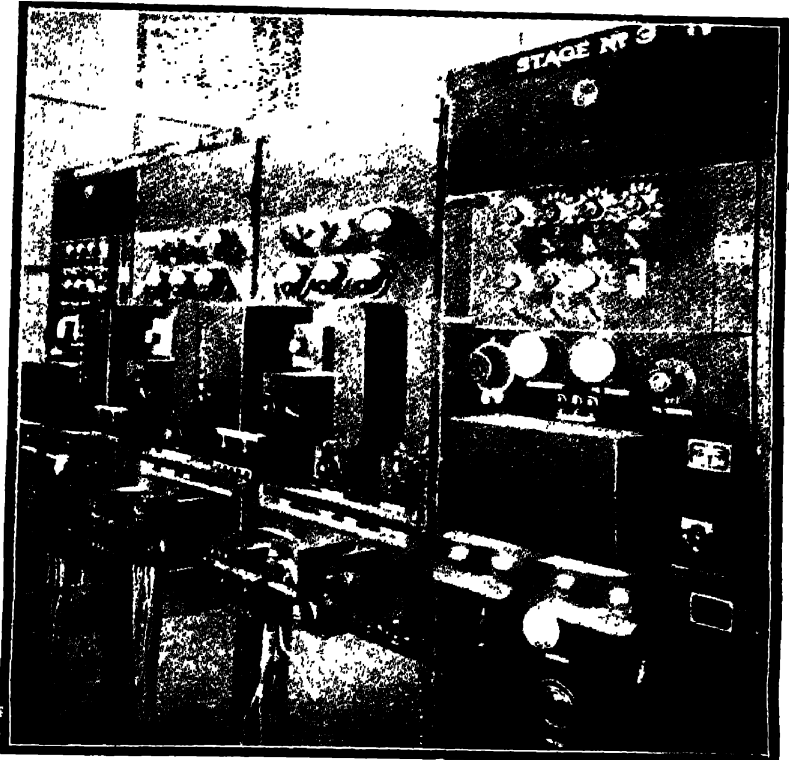
স্বরধর যন্ত্র। ১২৪
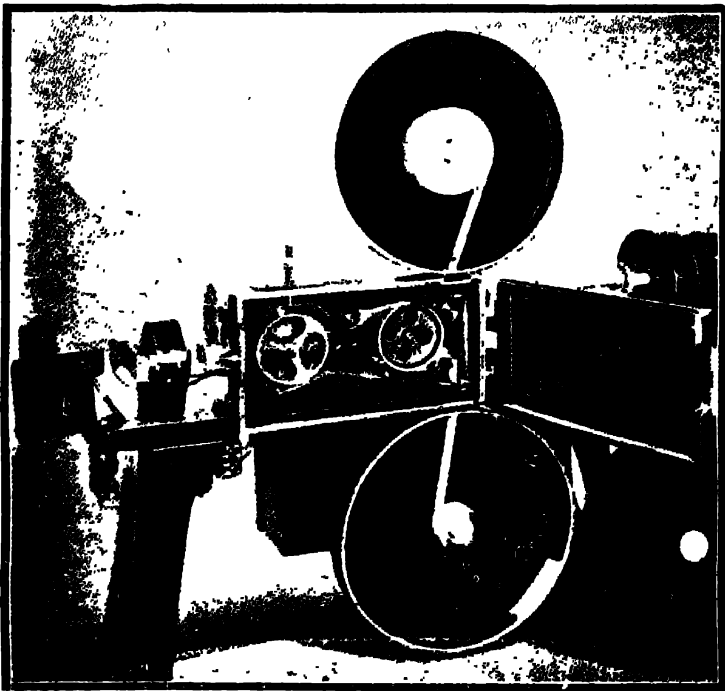
সম্মিলিত শব্দ ও ছায়াধর যন্ত্র ১২৫

মাসে ওয়ার্ণার ব্রাদার্স (Warner Brothers) এবং ভীটাফোন্ কর্পোরেশন (Vitaphone Corporation) মিলে নিউইয়র্কের ওয়ার্ণার থিয়েটারে সর্ব্বপ্রথম সম্পূর্ণ সবাক ছবি 'ডন জুয়ান' (Don Juan) দেখিয়েছিলেন। ছবির সঙ্গে সঙ্গে যে সুমধুর ঐক্যতান বাজানোর ব্যবস্থা হ'য়েছিল তাও শব্দপত্রীর সাহায্য নিয়েই। প্রকৃতপক্ষে সেই হচ্ছে প্রথম সবাক্ চলচ্ছবি যা লোকরঞ্জনে কৃতকার্য্য হ'য়ে ব্যবসা জগতে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করলে। তারপর থেকে আজ পর্য্যন্ত এর ক্রমেই উন্নতি হ'চ্ছে। ১৯২৭ সালে উইলিয়াম ফক্স উৎকৃষ্টতর সবাক্ চিত্র দেখাতে পেরেছিলেন। এই বছরেই 'ফক্স ম্যুভিটোন্' নাম দিয়ে সরব সংবাদ চিত্র (News reel) প্রদর্শনও সুরু হয়েছিল।

দেখতে দেখতে আমেরিকা ও য়ুরোপের চতুর্দ্দিকে সবাক্ চলচ্চিত্র অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। আমাদের দেশেও এর ঢেউ এসে লেগেছে এবং বাংলায়, হিন্দিতে, তামিলে ও উর্দ্দুতে সবাক্ চলচ্ছবি এখানেও তৈরী হচ্ছে! এখানে মূক ছবি তার পূর্ণ পরিণতি লাভ করবার আগেই কাঁচা অবস্থায় মুখর হ'য়ে উঠলো। তাই বারো বছরের মেয়ের মা' হওয়ার দুর্ভাগ্যের মতো সে কোনোদিক দিয়েই এখনো সার্থক হয়ে উঠতে পারেনি। সবাক্ ছবি তোলবার জন্য চলচ্চিত্র-বিদ্ সুদক্ষ কর্ম্মীর দল ছাড়া কয়েকজন সুপটু শব্দ-বৈজ্ঞানিকের সাহায্যও অত্যাবশ্যক। প্রথমেই দরকার একজন 'শব্দপরিচালক' (Director of Sound) এঁকে Chief Recording Engineer অর্থাৎ সর্ব্বপ্রধান স্বর-ধর যন্ত্রীও বলা হয়। শব্দ বিভাগের ইনিই প্রকৃত কর্ম্মকর্ত্তা। এঁর কাজ অনেক রকম। শব্দ ধরা যন্ত্রপাতি বসানো, স্বর পরীক্ষা এবং শব্দ সংক্রান্ত সমস্ত সরঞ্জাম ঠিক রাখা। শব্দ চিত্রের একটা Laboratory বা অনুশীলনাগার পরিচালনা তাঁর হাতে। কখন কখন ইনিই আবার ক্যামেরার কাজও নির্দ্দেশ করেন। এঁর সঙ্গে থাকেন Recording Supervisor অর্থাৎ—শব্দগ্রহণ-তত্ত্বাবধায়ক। এঁর তত্ত্বাবধানেই কণ্ঠস্বর 'শব্দ-চিত্রে' রূপান্তরিত হয়। এঁর আবার তিনজন সহকারী থাকেন। একজন প্রধান স্বর-ধর (first Recordist) এবং দু'জন সহকারী স্বর-ধর; (Assistant Recordists) সহকারীদের একজনকে থাকতে হয় অভিনয় ক্ষেত্রে এবং অন্যজনকে থাকতে হয় স্বরধর যন্ত্র পরিচালনের কাজে।

শব্দগ্রহণতত্ত্বাবধায়কের কাজ অনেকটা শব্দপরিচালকেরই অনুরূপ। স্বরধর-যন্ত্র সম্বন্ধে তাঁকেও সম্পূর্ণ ওয়াকিফ্‌হাল হ'তে হয়। তা ছাড়া, অভিনেতা অভিনেত্রীর গলার দৌড় জেনে এবং প্রযোজক ও পরিচালকের ইচ্ছা ও রুচি বুঝে শব্দ সঙ্কলনের আয়োজন ও ব্যবস্থা করার দায়িত্বটা সম্পূর্ণ তাঁরই। প্রধান স্বরধর এবং তাঁর দুই সহকারী নির্ব্বাচন করে নেন তিনিই। সহকারীদের মধ্যে কে থাকবে অভিনয়-মণ্ডপে এবং কে থাকবে স্বরধর-যন্ত্রগৃহে, সে ব্যবস্থাও তিনিই করেন। অভিনয় মণ্ডপে এক অথবা একাধিক Microphone (অনুশ্রুতি যন্ত্র) বসানো থাকে। অভিনয় কালীন অভিনেতাদের কণ্ঠস্বরের শব্দপ্রবাহ (Voice current) ঐ অনুশ্রুতি যন্ত্রের সাহায্যে স্বরধর-যন্ত্রগৃহে (Booth or Sound Truck) অবস্থিত Amplifier বা শব্দবর্দ্ধনী-যন্ত্র মধ্যে এসে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে তৎসংলগ্ন স্বরধর যন্ত্রে (Recording Machine) আবদ্ধ হয়ে যায় ও রূপান্তরকারী যন্ত্রের (converter) সাহায্যে শব্দ চিত্রে পরিণত হয়।

শব্দবর্দ্ধনী (Amplifier) যন্ত্রের কর্ণধার হ'য়ে প্রধান স্বরধর ব'সে থাকেন। তাঁর হাতেই তড়িতাঙ্কের মাপকাঠি। শব্দবর্দ্ধনী যন্ত্রের মধ্যে যে সব শব্দপ্রবাহ এসে পৌঁছায় তিনি সেগুলিকে সুশৃঙ্খলে সন্নিবেশ করেন। যেখানে একাধিক অনুশ্রুতি যন্ত্র (Microphones) ব্যবহৃত হয়, সেস্থলে এই প্রধান স্বরধর যন্ত্রী মিশ্রকের (Mixer) সাহায্যে বিভিন্ন শব্দবর্দ্ধনী যন্ত্রের উৎপাদিত স্বর-প্রবাহ সমূহের একত্র সমন্বয় সাধন করেন। তাঁর সহকারীদ্বয়ের সঙ্গে টেলিফোনের সাহায্য তাঁর অবিচ্ছিন্ন যোগ থাকে। কারণ শব্দ প্রেরণী যন্ত্রের (Transmitters) সঠিক সন্নিবেশের দায়িত্ব তাঁরই উপর ন্যস্ত। তিনি কখনও সহকারীদের সাহায্যে কখনো বা নিজেই অভিনয়-মণ্ডপের পরিচালকদের কাছে শব্দ সম্পর্কীয় নির্দ্দেশ পাঠান।

স্বরধর যন্ত্রীরা যদি গল্পের অন্তর্নিহিত সাহিত্যকলার সূক্ষ্ম-সৌন্দর্য্য, অভিনয় কৌশলের সবিশেষ তত্ত্ব ও চিত্রকারু সম্বন্ধে কতকটা অভিজ্ঞ হন তাহ'লে ছবিখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে খুব বেশী। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশতঃ এরকম লোক এ লাইনে বড় একটা পাওয়া যায় না। যাঁরা আছেন তাঁদের প্রাণপণ লক্ষ্য থাকে শুধু কি ক'রে কণ্ঠস্বর নির্দ্দোষ ও নিখুঁত ভাবে ধরা যায়। তাঁদের এই নিখুঁত স্বরের প্রতি অতি আগ্রহের ফলে অনেক সময় অভিনয়ের ঔৎকর্ষ ও আলোকচিত্রের সৌন্দর্য্য ছবির নানা স্থানে খর্ব্ব হ'তে বাধ্য হয়। অভিনয়-মণ্ডপে যে স্বরধর-যন্ত্রী থাকেন তাঁর কাজ হ'চ্ছে স্বরধর যন্ত্রগৃহের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা এবং অভিনয়ের শব্দের সঙ্গে অনুশ্রুতি যন্ত্রের (Mike) তাল রক্ষা করা। সুতরাং ধ্বনি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞান না থাকলে তাঁকে দিয়ে এ কাজ চলবে না।

স্বরধর যন্ত্রগৃহে যে সহকারী থাকেন তাঁর কাজ হ'চ্ছে স্বরধর যন্ত্রে শব্দপত্রী (Sound Film) সরবরাহ করা এবং উহা স্বরপূর্ণ হলে গুটিয়ে রাখা! সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে লক্ষ্য রাখতে হয়— যে, কাজের সময় 'কল' না বেগড়ায়। অনেক সময় মুখর চলচ্চিত্রের শব্দাংশ আশানুরূপ সন্তোষ জনক না হ'লে অথবা নূতন কোনো সঙ্গীত বা কথা যোগ করতে হ'লে আবার নূতন করে তা' গ্রহণ করা হয়, একে বলে Re-recoding 'পুনঃশব্দ-লেখন'। এ কাজটা বিশেষজ্ঞদের দ্বারাই করানো উচিত। অবশ্য, শব্দ তত্বাবধায়ক ও তাঁর সহকারীরা ধ্বনি-বিশেষজ্ঞকে এ বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করেন।

আগ্রাহিতানিরূপণ, (Sensitometry) ছায়াছবির মূল উপাদান সমূহের সুপরিমিত ব্যবহার, শব্দ-পত্রীর উপর শব্দ রেখার (Sound-tracks) রাসায়নিক পরিস্ফুটন এবং মুদ্রণ (Developing & Printing) ইত্যাদি, এ সমস্তই অভিজ্ঞ ধ্বনি তত্ত্ববিদের তত্ত্বাবধানে হওয়া দরকার; কারণ, খুব সযত্নে গৃহীত শব্দ রেখার মূল-ছবিও (Sound-Negatives) কেবলমাত্র রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ত্রুটী এবং মুদ্রণের দোষে একেবারে নষ্ট হ'য়ে যেতে পারে। সুতরাং প্রত্যেক চলচ্চিত্র কোম্পানীর উচিত ধ্বনি-বিজ্ঞান জানা একজন সুদক্ষ আলোক-চিত্রকর (Photographer) নিযুক্ত করা। আনাড়ি লোক নিয়ে অল্প খরচে ফাঁকি দিয়ে সবাকছবি তোলবার চেষ্টা করলে ঠকতে হবে। আমেরিকায় যে সব চিত্র প্রতিষ্ঠানের ছবি আজকাল সবচেয়ে ভালো সেই নামজাদা কোম্পানী গুলিতে ছবি তোলার সম্পর্কে

ছায়া ও শব্দপথ । ১২৬
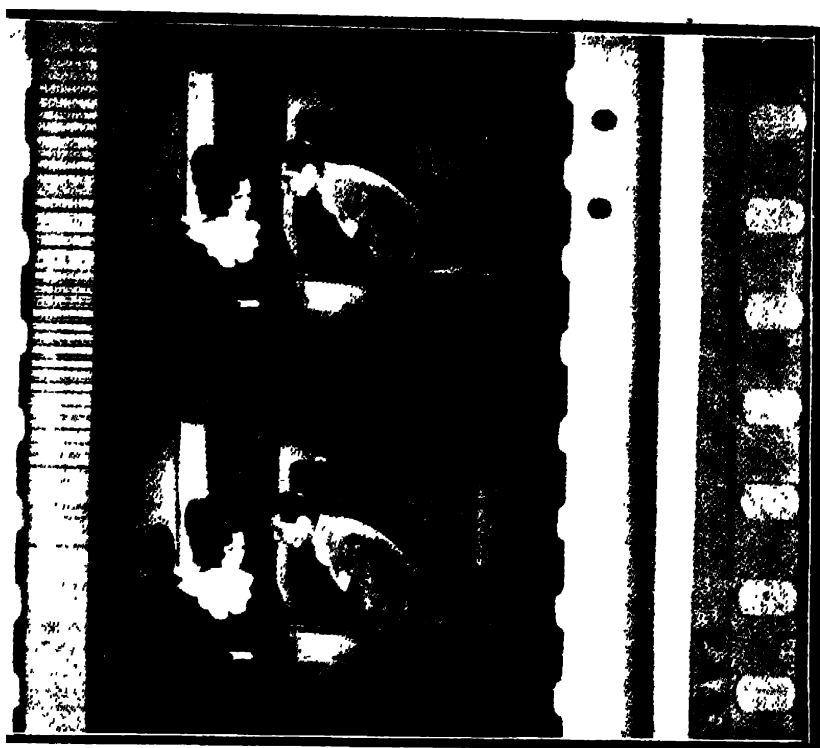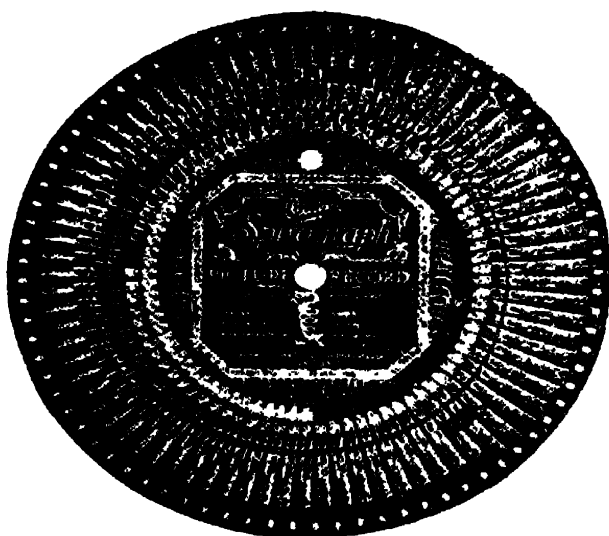
চিত্র-বহু চক্র

ছায়াধর ছই (এর ভিতর থেকে ছবি নিলে ক্যামেরার শব্দ বাইরে শোনা যায় না। সঙ্গে শব্দ সম্প্রসারক যন্ত্রদণ্ড) ১২৭

"আমার মর্ম্মগীতি" চিত্রের জন্য ব্যবহৃত একাধিক ছায়াধর যন্ত্র। ক্যামেরার খুট্‌খাট্‌ শব্দ নিবারণের জন্য প্রত্যেক ক্যামেরাটিতে খুব মোটা কম্বল চাপা দেওয়া হয়েছে। ১২৮

ক'জন ক'রে বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত আছেন শুনলে আমাদের দেশের চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীরা হয়ত' মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়বেন। ওয়ার্ণার ব্রাদার্সের প্রয়োগশালায় ১৯৩ জন লোক শুধু ক্যামেরা, আলো, ও স্বরলয় যন্ত্রপাতির কাজে নিযুক্ত আছেন। মেট্রো-গোল্ডউইন মেয়ার কোম্পানীতে আছেন ১৪৭ জন, প্যারামাউন্টে আছেন ১০৫ জন, য়ুনির্ভার্স্যালে আছেন ১০০ জন, ফক্সের ৭৭ জন ইত্যাদি।

চলচ্চিত্রের সঙ্গে শব্দের সংযোগ পূর্ব্বেই বলেছি, প্রথমটা আওয়াজ কলের (Gramophone) সাহায্যে ঘটেছিল। শব্দ লেখনচক্র (Disc record) ছিল গোড়ার দিকে স্বর-সঙ্কলনের একমাত্র উপায়। আজকাল ছায়া-পত্রীর (Photo-Film) ন্যায় শব্দপত্রীও (Sound-Film) উদ্ভাবিত হয়েছে। এবং তার আবার দু-রকম পদ্ধতি বেরিয়েছে। একটাকে বলে—Variable density recording অর্থাৎ শব্দের পরিবর্ত্তনীয় ঘনত্বের বিভিন্ন মাত্রা অনুপাতে স্বর-সঙ্কলন, এবং অন্যটিকে বলে Variable area recording অর্থাৎ শব্দের পরিবর্ত্তনীয় প্রসারের বিভিন্ন সীমানুপাতে স্বর-সঙ্কলন। কলিকাতার অধিকাংশ মুখর ছবি-ঘরে যে Western Elecrtic কোম্পানীর সবাক্-চিত্রযন্ত্র ব্যবহার হয় সেগুলি প্রথমোক্ত পদ্ধতিই অনুসরণ করে। দ্বিতীয় পদ্ধতির অনুরাগী হ'চ্ছে R. C. A Photophone কোম্পানী।

পূর্ব্বেই বলেছি অনুশ্রুতি যন্ত্রের (Microphone) সাহায্যে স্বর-তরঙ্গ (Sound waves) তড়িৎ-প্রবাহে (Electric waves) রূপান্তরিত হয়ে যায়। সেই তড়িৎপ্রবাহে রূপান্তরিত স্বর-তরঙ্গ আবার স্বর-বর্দ্ধনী যন্ত্রের সাহায্যে বহুগুণ প্রবলতর হয়ে নির্বায়ু নলে শক্তি সঞ্চার করে এবং তার ফলে স্বর-লেখন যন্ত্রের কার্য্য পরিচালিত হয়। স্বের-লেখন যন্ত্রের কার্য্য হ'চ্ছে ঐ বৈদ্যুতিক প্রবাহে-রূপান্তরিত স্বর-তরঙ্গকে আবার আলোক-ছায়ায় রূপান্তরিত করে ছায়া পত্রীর সঙ্গে সংযুক্ত করা। এই শব্দ ও ছায়ার সম্মিলিত পত্রীই হ'চ্ছে Talkie Film, অর্থাৎ মুখর ছায়াপট!

ছবিঘরের পর্দ্দার উপর যখন এই মুখর ছায়াপটের ছবি গিয়ে পড়ে তখন ছায়াছবির সঙ্গে সঙ্গে আলোছায়ায় রূপান্তরিত স্বর-তরঙ্গ আবার তড়িৎপ্রবাহের রূপ ধরে এবং সেই তড়িৎপ্রবাহ আবার শব্দ তরঙ্গে পরিণত হ'য়ে আমাদের শ্রুতিগোচর হয়। এরজন্য দরকার হয় প্রধানতঃ তিনটি যন্ত্র—একটি পুনর্নাদক যন্ত্র (Reproducer), একটি শব্দবর্দ্ধনী যন্ত্র (Amplifier), একটি উচ্চবাচক্ যন্ত্র (Loud Speaker)

পুনর্নাদক যন্ত্রের কাজ হ'চ্ছে শব্দলিপিকে (Sound Record) তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করা। শব্দবর্দ্ধনী যন্ত্রের কাজ হচ্ছে ঐ তড়িত শক্তির বল বৃদ্ধি করা এবং উচ্চবাচক্ যন্ত্রের কাজ হচ্ছে সেই তড়িৎ-শক্তিতে রূপান্তরিত শব্দলিপিকে ধ্বনিতে পরিণত করা! শব্দলিপিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করবার জন্য দরকার হয় একটি উত্তেজক দীপ (exciting lamp) এক প্রস্থ স্বচ্ছমণি (Lens) এবং আলোক-বৈদ্যুতিক কোষ (Photo Electric Cell)

ছবির সঙ্গে শব্দের সামঞ্জস্য বিধান করাকে ব'লে Synchronization বা যৌগপাদন।

অনেক ছবি আছে যা সম্পূর্ণ সবাক্ (Talkie) নয়, কতক অংশমাত্র মুখর। এই শ্রেণীর ছবির স্বর সঙ্কলন হয় শব্দ-লেখন চক্রের সাহায্যে (Disc Record) এই শব্দ লেখন চক্রকে ছায়াচিত্রের সহযোগী ক'রে তুলতে পারলেই ছবির সঙ্গে শব্দের সামঞ্জস্য বিধান অনেকখানি সহজ হয়ে ওঠে।

সাধারণতঃ দেখা যায় কোনো রঙ্গালয়ে বা ছবিঘরে দর্শকেরা যে গোলযোগ করে, অর্থাৎ তাদের ওঠা বসায়, চলা ফেরায়, গল্প গুজবে, আলাপ-আলোচনায় বা সাদরসম্ভাষণে যে শব্দ ওঠে সবাক্ চিত্রের শব্দাংশের ধ্বনি পরিমাণ তার চেয়ে অন্ততঃ চল্লিশভাগ বেশী না হ'লে প্রেক্ষাগৃহে কিছুই শোনা যায় না! খুব বড় কামানের শব্দের ধ্বনি-পরিমাণ যদি ১০০ ধরা যায়, তাহ'লে প্রেক্ষাগৃহের গুঞ্জন ধ্বনি তার তুলনায় হ'বে ৩০ ভাগ, কাজেই শব্দের ধ্বনি পরিমাণ হওয়া চাই অন্ততঃ ৭০ ভাগ। আবার মুখর ছবির এই সত্তর ভাগের মধ্যে দেখা যায় অভিনয় কালে পাত্র পাত্রী ফিস্-ফিস্ করে কথা কইলে যে শব্দ হয়—চেঁচিয়ে কথা বললে সে আওয়াজের পরিমাণ দাঁড়ায় তার চেয়ে—ত্রিশ ভাগ বেশী! ছবি তোলবার সময় এই সব হিসাবের দিকে লক্ষ্য রেখে ছবির স্বরব্যঞ্জনার সঙ্গে শব্দের তাল মান লয় সুসঙ্গত ক'রতে পারলে সে ছবি হ'য়ে ওঠে সুশ্রাব্য ও উপভোগ্য। ছবির পাত্র-পাত্রীরা কথা ব'লতে ব'লতে কোনো দৃশ্যে যখন কাছে এসে পড়ে বা দূরে সরে যায় তখন তাদের সেই অবস্থানের বা নড়াচড়ার অনুপাতে তাদের কণ্ঠস্বরের তারতম্যও যাতে সমতালে কম বেশী ও দূর বা নিকট হয়ে ওঠে সেদিকেও সবিশেষ সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। কণ্ঠস্বর যে পর্য্যন্ত না সহজ ও স্বাভাবিক করে তুলতে পারা যাবে, সবাক ছবির সাফল্য ততদিন এদেশে সুদূর-পরাহত।

দূরে কোনো ঘটনা ঘটছে দেখাবার সময় ছবিতে সেই দূরের ঘটনাকে দূরে রেখেই দর্শকদের কিন্তু তার খুব কাছে পৌঁছে দিতে হয়, তা না'হ'লে দর্শকদের কৌতূহল চরিতার্থ করা যায় না; এবং তাদের কৌতূহল চরিতার্থ না হ'লে সে ছবি দেখে তারা খুশী হ'তে পারে না। সুতরাং ছবির সাফল্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হ'তে হ'লে পরিচালককে দর্শকদের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে সর্ব্বদা সজাগ থাকতে হবে। দূরের ঘটনাকে দূরে রেখেই নিকটবর্ত্তী করে দেখাবার জন্য ছায়াধর-যন্ত্রীকে (Camera-man) যেমন দীর্ঘনাভ-মণির (Long Focus Lens) সাহায্য নিতে হয়, তেমনি দূরের শব্দকে দূরে রেখেই তাকে নিকটতর ক'রে শোনাবার জন্য' ছায়াধর-যন্ত্রের পদাঙ্ক অনুসরণ করে অনুশ্রুতি যন্ত্রের (Microphone) অবস্থানও সঙ্গে সঙ্গে বদলে সমান্তর ক'রে নেওয়া দরকার। যেখানে একই দৃশ্যে একই সময়ে close-ups (সান্নিধ্যচিত্র) Mid-shots, (মধ্যস্থচিত্র) Long-shots, (দূরস্থ চিত্র) নেওয়ার প্রয়োজন হয়, সে ক্ষেত্রে নট-নটীর অবস্থানের অনুপাতে এবং ছায়াধর-যন্ত্রের ব্যবধান অনুযায়ী একাধিক অনুশ্রুতি-যন্ত্র ব্যবহার করা আবশ্যক। তবে প্রতিবারেই একটিমাত্র অনুশ্রুতি যন্ত্রই ব্যবহার করা উচিত, অন্যগুলি বন্ধ ক'রে রাখা দরকার। অর্থাৎ চিত্রাভিনয়ে পটমণ্ডপের (Set) যে দিকের যে অনুশ্রুতি যন্ত্রটি যখন ব্যবহার করা আবশ্যক ব'লে মনে হবে, তখন কেবলমাত্র সেইটির

শব্দ পটাবৃত কক্ষ (Monitor room) এইখানে 'মিশ্রক' (Mixer) তাঁর কাজ করেন। ১৩০
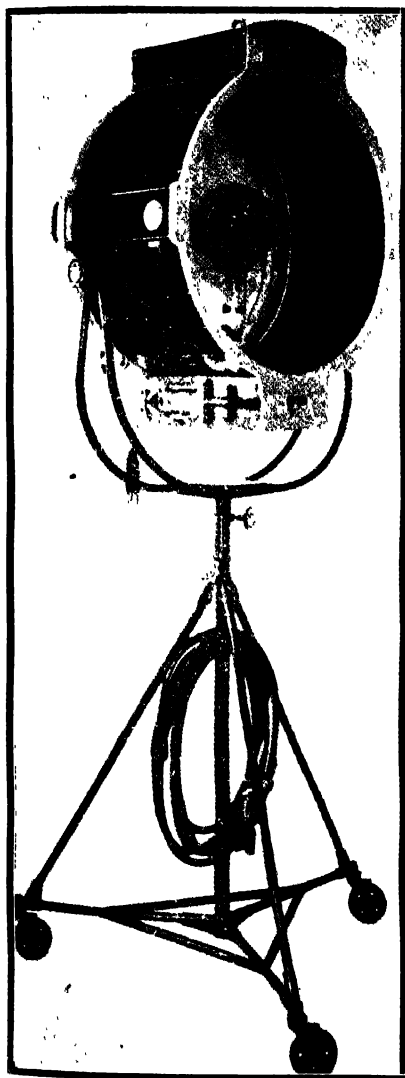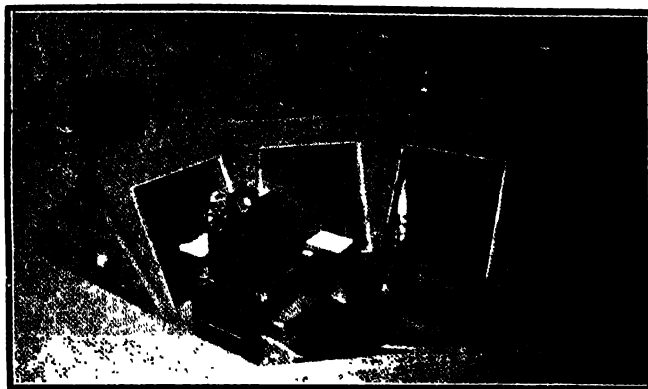
(Incandescent lamp) ১৩১
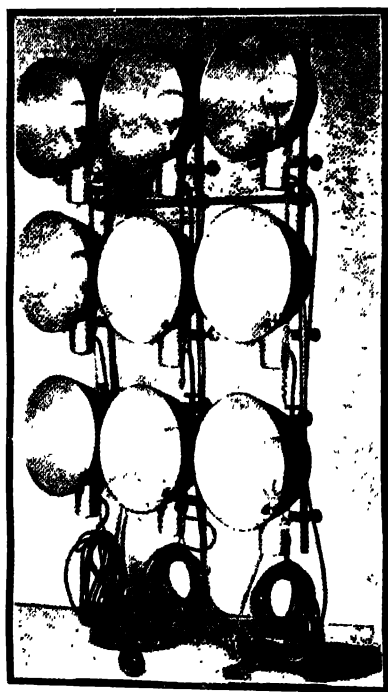
প্লাবন দীপ (Flood Light) (এই দীপের সাহায্যে পটমণ্ডপ অতি আলোকে দীপ্ত করিয়া রাখা যায়। ১৩৩

(অগ্রপশ্চাৎ ও বহু প্রসারী দণ্ড। এই যন্ত্রের সাহায্যে microphone যেদিকে ইচ্ছা সরাইয়া দেওয়া চলে)   ১৩৪
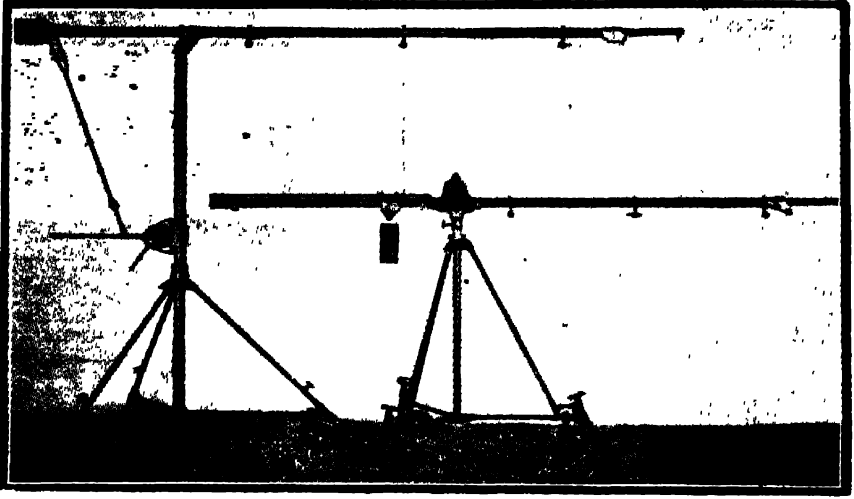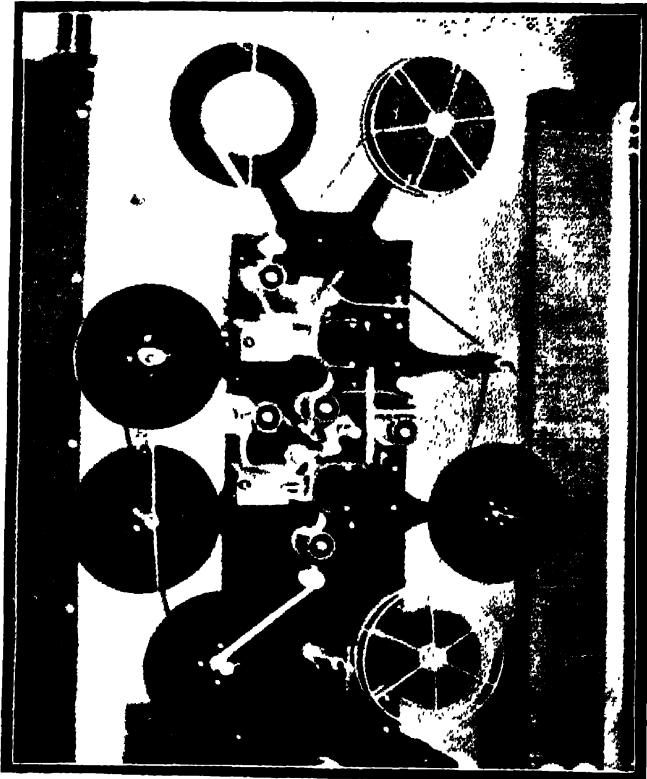
শব্দ ও চিত্রপত্রী একত্রে মুদ্রিত করিবার যন্ত্র।   ১৩৫

চাবি খুলে অন্যগুলির চাবি বন্ধ (Switchoff) রাখতে হবে। এরূপ স্থলে একাধিক ছায়াধর-যন্ত্রও ব্যবহার ক'রতে হয়। কারণ একই সময়ে বিভিন্ন দূরত্বের ও বিভিন্ন দিকের (different positions and different angles) ছবি নিতে হ'লে একটিমাত্র ছায়াধর-যন্ত্রে কাজের সুবিধা হয় না এবং ছবিও সন্তোষজনক হয় না। একাধিক ক্যামেরায় তোলা একই দৃশ্যের নানাদিকের ছবি মিলিয়ে দেখে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয়েছে ব'লে মনে হয় সেই অংশটুকু কেটে নিয়ে রাখা হয়; এমনি ক'রে সাগরপারের পরিচালকেরা চিত্রের শ্রেষ্ঠ অংশ (Cuts) গুলি একত্র জুড়ে একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ছবি তৈরী করে।

সবাক্‌ছবি তোলবার পটমণ্ডপ (Set) মূকছবির অনুরূপ হ'লে চলবে না। কারণ স্বর-স্পন্দনের (Sound vibrations) স্থান বিশেষে পার্থক্য (Variation) ঘটে, যেমন ঘরের ভিতর থেকে কেউ সাড়া দিলে সে আওয়াজ ঘরের বাইরে এসে কথা ব'ললে সে আওয়াজের সঙ্গে মেলে না। কাপড়ের তাঁবুর মধ্যে কথা কইলে যে স্বরস্পন্দন হয়, ইট বা পাথরের গাঁথা ঘরের মধ্যে কথা বললে সে স্বরস্পন্দন অন্যরকম হয়; আবার কাঠের তৈরী ঘরে বসে কথা ব'ললে সে স্বরস্পন্দন ভিন্ন প্রকার। সুতরাং সবাক্‌-ছবির পটমণ্ডপ এমন ভাবে তৈরী হওয়া দরকার যাতে এই স্বরস্পন্দনের স্বাভাবিক গতি বা প্রকৃতি বাস্তব দৃশ্যের যথাসম্ভব অনুরূপ হতে পারে।

অনেক স্থলে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কণ্ঠস্বরের পরিমাপ বা গ্রাম ঠিক একরকম হয় না। দু'জন অভিনেতার স্বরের যখন খুব বেশী রকম পার্থক্য থাকে তখন তাদের দু'জনের জন্য পৃথক পৃথক 'মাইক্‌' বা অনুশ্রুতিযন্ত্র ব্যবহার করাই উচিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, কিছুদিন পূর্ব্বে 'চিত্রায়' যে সবাক্‌ ছবি "দেনাপাওনা" দেখানো হ'ল, তাতে জীবানন্দরূপী দুর্গাদাসবাবুর কণ্ঠের স্বরগ্রাম অন্যান্য অভিনেতার অপেক্ষা অনেক বেশী উচ্চ, কিন্তু একই অনুশ্রুতি যন্ত্রে সকলের স্বর-সঙ্কলন করার ফলে দুর্গাদাসবাবুর কথা শব্দবর্দ্ধনী-যন্ত্রের ভিতর দিয়ে ঘুরে উচ্চবাচক্‌ যন্ত্রের (Loud speaker) সাহায্যে যখন দর্শকদের কাণে এসে পৌছালো, তখন সে স্বর অন্যান্য অভিনেতাদের তুলনায় কর্কশ চিৎকারের মত মনে হ'তে লাগলো। এখানে দুর্গাদাসবাবুর কণ্ঠস্বরকে নিয়মিত (Regulate) করতে গেলে অপর অভিনেতাদের কণ্ঠস্বর এত নেমে যাবে যে হয় ত শোনাই যাবে না,—সুতরাং এস্থলে শব্দ-পরিচালকের উচিত ছিল ছবি তোলবার সময় দুর্গাদাসবাবুর জন্য একটি পৃথক অনুশ্রুতি-যন্ত্র ব্যবহার করা। যিনি 'মিশ্রক' (Mixer) তিনি তখন অনায়াসে এই বিভিন্ন স্বরগ্রামের সমন্বয় সাধন করতে পারতেন। বলা বাহুল্য যে 'মিশ্রকের' কাজই হচ্ছে সবাক্‌ছবির স্বর-সমন্বয় করা।

অনেক স্থলে সবাক্‌ছবিতে স্বর-যোজনা (Scoring) চিত্র নেওয়ার আগে কিম্বা পরে করা হয়। সঙ্গীত এবং বাদ্য সম্পর্কেই বেশীর ভাগ এটা করা হয়; কিন্তু এই প্রাক্‌স্বর-যোজনার (Pre-scoring) বা উত্তর স্বরযোজনার (Post-scoring) একটা প্রধান অসুবিধা হয় এই যে, অভিনেতারা হয় স্বর-লেখন (Sound-record) সম্বন্ধে নয় ছায়া-লেখন (Film record) সম্বন্ধে এত বেশী সচেতন হ'য়ে ওঠেন যে, প্রাক্‌স্বরযোজনার ক্ষেত্রে অভিনয়ের প্রতি অমনোযোগী হ'য়ে পড়েন এবং উত্তর স্বরযোজনার ক্ষেত্রে চিত্রের দিকে

মনোযোগী হওয়ার ফলে স্বর-সম্বন্ধে অসতর্ক হ'য়ে পড়েন। অতএব চিত্র ও স্বর লেখন একই সময়ে নেওয়াই নিরাপদ।

মূকছবির ন্যায় মুখর ছবিও কেটে ছেঁটে বাদ দিয়ে সম্পাদন (Edit) ক'রে নিতে হয়। কতটা ছবি বাদ দিলে কতখানি কথা বাদ যায়, সে সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক না হ'লে মুখর ছবি সম্পাদন করা বিপজ্জনক হ'য়ে পড়ে। বিশেষ ক'রে যেখানে চিত্রের শব্দাংশ শব্দ-লেখন-চক্রে (Disc record) গৃহীত হয়, সেখানে চিত্র সম্পাদনের সময় ছবির স্বরাংশকে পুনঃ শব্দলেখন (re-recording) ক'রে নেওয়া ভিন্ন আর অন্য উপায় নেই।

মুখর
অভিনয় মণ্ডপ
১৩৬
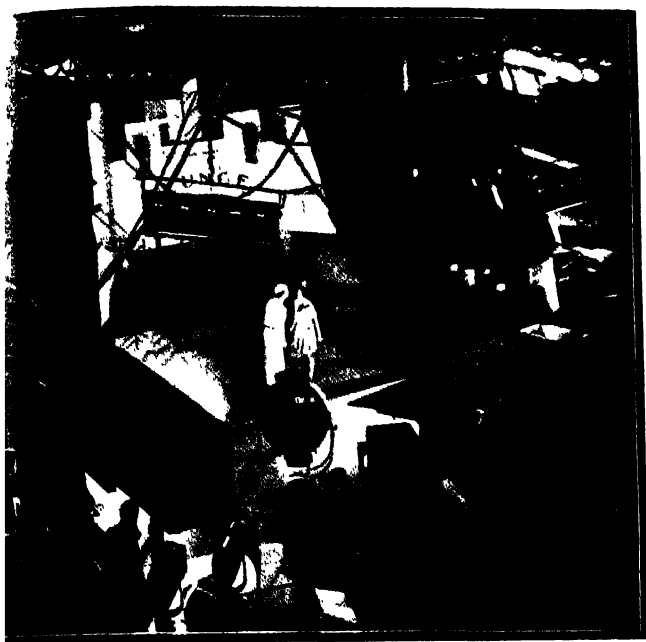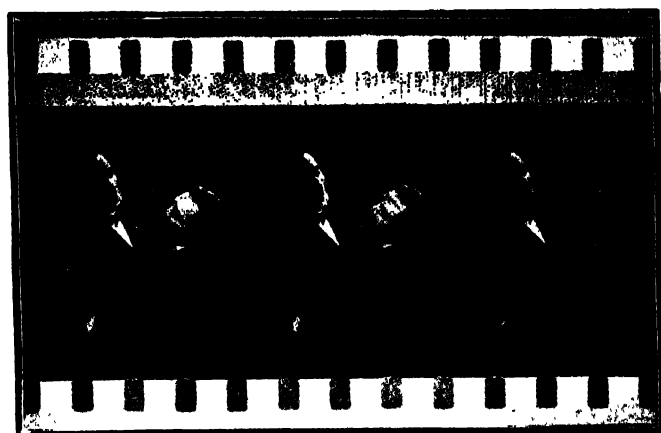
সবাক্ চিত্রে দ্বি-আলোকন (Double exposure on sound film)। ১৩৭
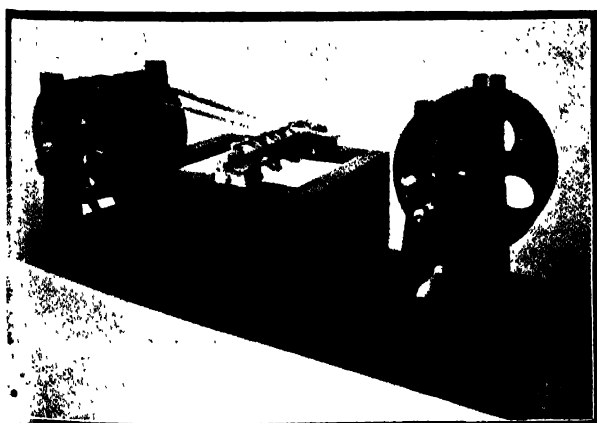
সবাকচিত্র সম্পাদন যন্ত্র (sound film editing machine)। ১৩৮
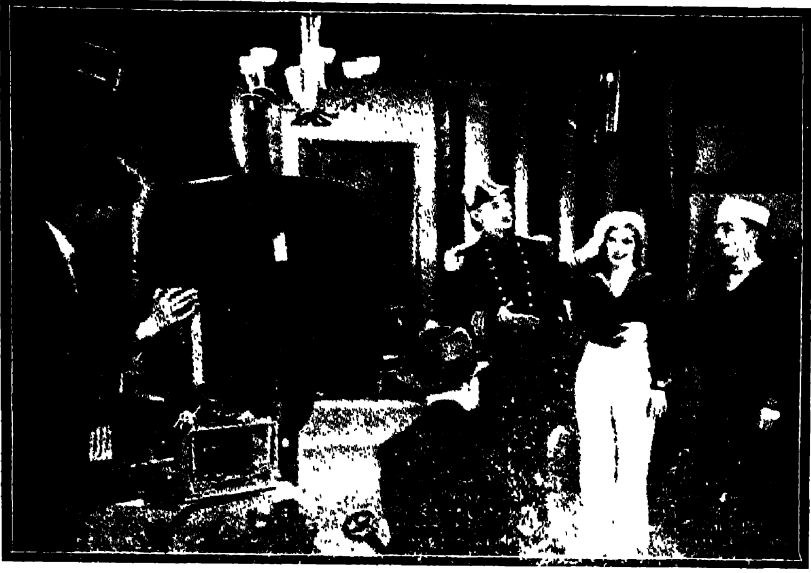
শব্দ-সংরোধক (ক্যামেরা পরিচালনে যে শব্দ হয়, তাকে বন্ধ করবার জন্য কম্বলের পরিবর্তে এই ধরণের ঢাকনা প্রচলিত হয়েছে।) ১৩৯

নাট্য চিত্র (The Broadway melody) ছবিতে চিত্রগড়ে তৈরী রঙ্গমঞ্চের একটি দৃশ্য। এই দৃশ্যপটের গায়ে গানের স্বরলিপি এঁকে, সুরের আবেষ্টন সৃষ্টি করা হয়েছে।) ১৪২

চিত্র-নাট্য

চলচ্চিত্রে স্বরোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে চিত্র্য-নাট্যের পদ্ধতিও পরিবর্তিত হ'য়েছে। মূক চিত্রের জন্ম যেভাবে চিত্রের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা প্রয়োজন ছিল, মুখর-চিত্রের কাজে তা অনেক-খানি বদলে গেছে। তখন যা ছিল শুধু ছবি এখন কথা এসে তাকে ক'রে তুলেছে চিত্র-নাট্য! একেবারে অবিকল রঙ্গালয়ে অভিনয়ের জন্ম রচিত নাটক না হ'লেও মুখর ছবির জন্ম 'নাটক'ই লেখানো হ'চ্ছে। 'Dialogue' অর্থাৎ কথোপকথন বেশ চিত্তাকর্ষক না থাকলে মুখর ছবি জনপ্রিয় হওয়া কঠিন। অনেক সময় নৃত্যগীতের প্রাচুর্য্যের দ্বারা বাক্‌চাতুর্য্যের অভাব পূরণ করা হয় বটে কিন্তু, সে ছবি তত বেশী জমেনা যতটা জমাট বাঁধে কথার মার-প্যাঁচের কায়দায়।

'চিত্র-নাট্য' সম্বন্ধে আলোচনা করবার পূর্ব্বে চলচ্চিত্র কত বিভিন্ন প্রকারের হ'তে পারে সে বিষয়ে কিছু বলা দরকার। মোটামুটি দেখা যায় চলচ্চিত্রকে বারোটি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত ক'রে ফেলা যেতে পারে, যেমন—

প্রথম—অবিমিশ্র চিত্র! (Abstract or Absolute Film.) অর্থাৎ কোনো গল্প বা ঘটনার সাহায্য না নিয়ে কেবলমাত্র গতিছন্দ, বর্ণ-বৈচিত্র্য, রূপান্তর, সৌন্দর্য্যাভিব্যক্তি, নিসর্গদৃশ্য, কাল্পনিক মায়া ইত্যাদি সৃষ্টি ক'রে দর্শকের মনোরঞ্জন করা ও তাদের চিত্তকে নাড়া দেওয়া, যেমন 'Film Studie' 'Liht & Shade' ইত্যাদি চিত্র।

দ্বিতীয়—কাব্য-চিত্র (Cine-poem or Ballad Film) অর্থাৎ কোনো প্রসিদ্ধ গাথা, কবিতা বা গানকে চিত্রে মূর্ত্ত ক'রে তোলা বা রূপ দেওয়া। যেমন La Marseillaise, Ænoch-Arden ইত্যাদি—

তৃতীয়—নাট্য-চিত্র (Cine-Drama or Play Film) অর্থাৎ চিত্রের পর চিত্র সাজিয়ে নৃত্যগীত ও বাদ্য সহযোগে ছবির ভিতর দিয়ে একটি অখণ্ড নাট্যরসকে জীবন্ত ক'রে তোলা। যেমন Rio-Rita, Love-Parade, Piccadily, Broadway ইত্যাদি—

চতুর্থ—কথা-চিত্র (Cine-Fiction or Story Film) অর্থাৎ প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের রচিত বা বিশেষভাবে চিত্রের জন্ম লেখানো কোনো গল্প বা উপন্যাস অবলম্বনে তার প্রতিপাদ্য বিষয়টি চিত্রের সাহায্য ফুটিয়ে তোলা। যেমন 'Uncle Tom's Cabin 'Scarlet Letter' 'Romola' ইত্যাদি—

পঞ্চম—রসচিত্র (Cine-Farce or Comic Film) অর্থাৎ চিত্রের সাহায্যে নানা

অদ্ভুত ঘটনার সমাবেশ ক'রে হাস্যরস সৃষ্টি করা। যেমন—Charlie Chaplin, Harold Lloyd, Buster Keaton এর ছবি।

ষষ্ঠ—উপ-চিত্র (Fantasy Film) অর্থাৎ ছবিতে কোনো আজগুবি গল্প, আষাঢ়ে কাহিনী ও ঠাকুরমা'র রূপকথাকে রূপ দেওয়া। যেমন—Trip to the moon, Thief of Bogdad ইত্যাদি—

সপ্তম—কৌতুক-চিত্র (Cartoon Film) অর্থাৎ শিল্পীর আঁকা কৌতুকাঙ্কনকে সজীব করে তোলা। যেমন Felix the Cat, Mickey Mouse,—

অষ্টম—ঐতিহাসিক চিত্র (Cine-Classic or Epic Film) অর্থাৎ কোনো ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক বিরাট চরিত্রের সুবৃহৎ ছবি। যেমন—King of Kings, Napoleon, ইত্যাদি—

নবম—শিক্ষা-চিত্র (Scientific, Cultural & Sociological Film) অর্থাৎ কোনো বিষয়ের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, তার শিক্ষার দিক এবং সমাজতত্ত্ব মূলক ছবি। যেমন The Birth of the Hours, The Mechanics of the Brain, Arctic Expeditions, The Miners ইত্যাদি—

দশম—কারু-চিত্র (Decorative or Art Film) অর্থাৎ ছবিখানি আদ্যোপান্ত উচ্চাঙ্গের কারুকলার আবেষ্টনের মধ্যে তোলা যেমন—Siegfried, Waxworks, ইত্যাদি।

একাদশ—ধর্ম্মমূলক চিত্র, (Church Film) অর্থাৎ—কোনো ধর্ম্মসংক্রান্ত ব্যাপারের ছবি। যেমন—Ten Commandments, Joan of Arc, ইত্যাদি।

দ্বাদশ—বিরাট চিত্র (Super Film) অর্থাৎ—যে কোনো বিষয়ের একখানি জাঁমকালো, দৃশ্যবহুল (Spectacular) সুদীর্ঘ ছবি। যেমন Metropolis, La Miserables ইত্যাদি।

এই দ্বাদশবিধ চিত্রের পার্থক্য মনে রেখে চিত্র-নাট্য রচনায় হস্তক্ষেপ করা উচিত। চিত্র-নাট্যের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করবার আগে মানসচক্ষে সমস্ত ছবিখানি কল্পনা ক'রে দেখা চাই। কারণ চিত্র-নাট্যের মধ্যে এমন কোনো দৃশ্য থাকা উচিত নয় যা ছবির আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে এগিয়ে দেয়না। অবান্তর বা অসঙ্গত কোনো ঘটনার স্থান নেই ছবির মধ্যে। চলচ্চিত্রে ছবি আঁকা হয়না—তৈরী করা হয়। এই চিত্র নির্ম্মাণ করাকে বলে 'প্রযুক্তি' (Montage) অর্থাৎ, অসংখ্য টুক্‌রো টুক্‌রো ছবিকে একসঙ্গে জুড়ে একখানি সম্পূর্ণ ছবি গড়ে তোলা হয়। প্রথমে গল্পাংশের নানা ঘটনার পৃথক পৃথক আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয়, তারপর সেগুলিকে বেছে বাদ সাদ দিয়ে কেটে-কুটে জোড়া লাগানোকেই বলে 'প্রযুক্তি' (Montage) তা'বলে 'প্রযুক্তি' বলতে কেবলমাত্র জোড়ালাগানো বুঝলে হবেনা। 'প্রযুক্তি' হ'লো—সৃষ্টি, সংগ্রহ ও সঙ্কলন এই ত্রিবিধ ব্যাপারের সমন্বয়ে চলচ্চিত্রের সংগঠন (Cine Organisation)

এই চলচ্চিত্র সংগঠনের প্রথম কাজ হ'চ্ছে গল্পাংশকে মনের মধ্যে ছবিরূপে কল্পনা

কথাচিত্র—(The Ghost that never returns
ছবির একটি midshot দৃশ্য ।)   ১৪৩
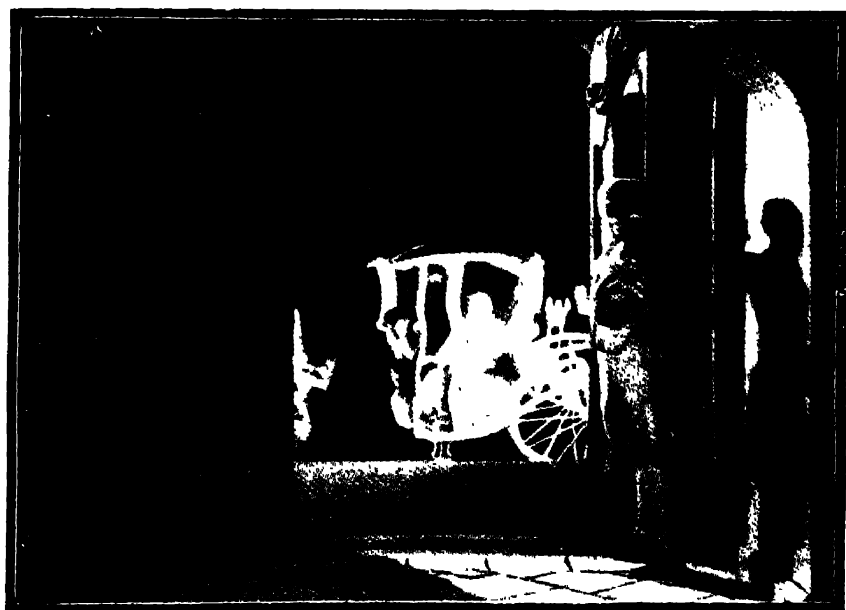
উপচিত্র—(Cindrella রূপকথার ছবির
Long-mid-shot দৃশ্য ।)   ১৪৪

কাব্যচিত্র—(Ségfried ছবির একটি দৃশ্য।
অরণ্য, পুষ্প, প্রস্রবণ সবই নকল।) ১৬৫
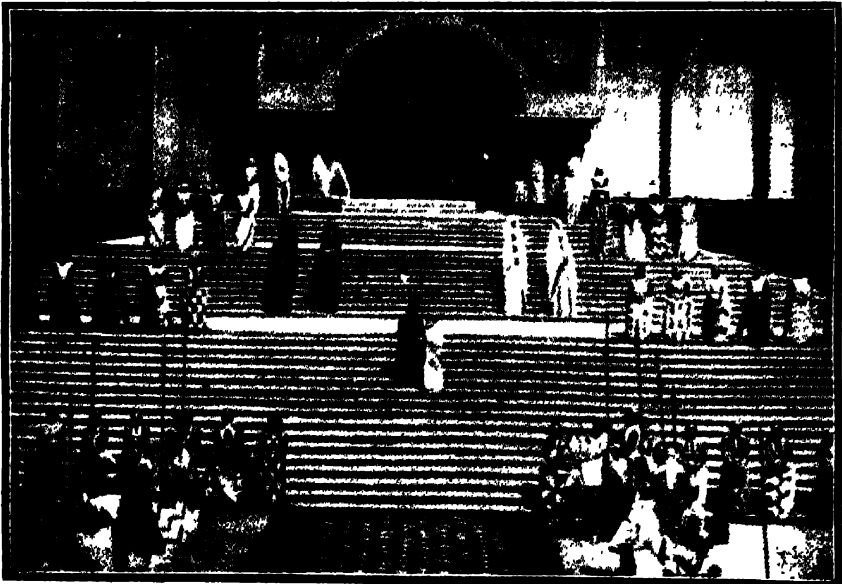
কাব্যচিত্র—(Nibelungen Sag
Long shot দৃশ্য।) ১৬৬

ক'রে পরের পর সাজিয়ে নিয়ে পরে চিত্র-নাট্যে লিপিবদ্ধ করা। দ্বিতীয় কাজ হ'চ্ছে ছবির যাবতীয় উপকরণ চিত্র-নাট্যের নির্দেশ অনুসারে সংগ্রহ ক'রে ফেলা। অভিনেতা অভিনেত্রী নির্বাচন এবং ছবির যে যে অংশ প্রয়োগশালায় (Studio.) তোলা হবে ও যে যে অংশ ছবির অনুকূল স্থান (Location) নির্বাচন ক'রে তোলা হবে—তা বাছাই ক'রে ভাগ ক'রে ফেলা। তৃতীয় কাজ হচ্ছে—ছবি নেওয়া (Taking) ও তার রাসায়নিক পরিস্ফুটন ও মুদ্রণ (Developing & Printing) চতুর্থ কাজ হচ্ছে চিত্রপটের টুকরাগুলিকে (Strips of Film) দেখে শুনে হিসাব ক'রে সাজিয়ে নেওয়া ও সম্পাদন করা। (Editing)

পূর্ব্বেই বলেছি 'পরিচালক' (Director) হ'চ্ছেন চিত্ররাজ্যের প্রধান কর্ণধার। চলচ্চিত্রের যা কিছু সংগ্রহ, সঙ্কলন ও সৃষ্টি অর্থাৎ চলচ্চিত্র সংগঠনের (cine-organisation) সম্পূর্ণ ভার তাঁর উপর। চিত্র-নাট্যকার, আলোক চিত্রকর, কলা নায়ক (Art Director) এবং মঞ্চ-স্থপতি (Architect) প্রভৃতি কর্ম্মীদের সাহায্যে তিনিই চলচ্চিত্র গ'ড়ে তোলেন। এঁরা প্রত্যেকেই পরিচালকের অধীন হ'য়ে তাঁর ইচ্ছা ও উপদেশ অনুযায়ী কাজ করেন। সুতরাং সুপরিচালক যিনি তিনি প্রথমেই খোঁজেন একখানি সুরচিত চিত্রনাট্য। সেই চিত্রনাট্যখানিকে তিনি আবার নিজের ইচ্ছানুরূপ পরিবর্ত্তন করে নেন। এমন কি কোনো প্রসিদ্ধ লেখকের বহু পরিচিত কোনো রচনাকেও তিনি ছবির উৎকর্ষ ও আকর্ষণের দিক থেকে বিচার ক'রে অনেক সময় আমূল পরিবর্ত্তন করে নেন। মিলনান্তক বহু গল্পই ছবিতে বিয়োগান্ত হ'য়ে দেখা দেয়, আবার বিয়োগান্ত কাহিনীও অনেক সময় হয়ে ওঠে মিলনের মাধুর্য্যে অপরূপ। মোট কথা—চলচ্চিত্রের বীজ নিহিত থাকে—চিত্র-নাট্যের মধ্যেই। কাজেই, চিত্র-নাট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে চলচ্চিত্রের প্রথম ও প্রধান উপকরণ।

ছবির জন্ত কোনো মৌলিক গল্প রচনা ক'রে চিত্র নাট্য প্রস্তুত করাই হচ্ছে সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায়, কারণ সে ক্ষেত্রে লেখকের কল্পনায় একটা অবাধ স্বাধীনতা থাকে। গল্পটি তিনি ছবিরূপেই ভাবতে ও লিখতে পারেন কিন্তু কোনো প্রসিদ্ধ লেখকের বিখ্যাত রচনাকে চিত্র-নাট্যে রূপান্তরিত করা একান্ত কঠিন। কারণ সেক্ষেত্রে গল্পটিকে শুধু ছবি ক'রে তুলতে পারলেই হবেনা; সেই প্রসিদ্ধ লেখকটির সেই বিখ্যাত রচনার যা কিছু বিশেষত্ব অর্থাৎ, যে কারণে সেই রচনা এত বিখ্যাত ও জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছে, সেটি সম্পূর্ণরূপে ছবির ভিতর ফুটিয়ে তোলা চাই। তবেই সে চিত্র-নাট্য ও তার ছবির সাফল্য অর্জ্জন করা সম্ভব হ'তে পারে।

চিত্র-নাট্য থেকে পরিচালক আবার তাঁর কাজের জন্ত একটি নক্সা (Scenario Plan) বা চিত্র-লিপি তৈরি ক'রে নেন। তাকে ব'লে 'Shooting Manuscript.' চলচ্চিত্রের ছবি নেওয়াকে বলে Shooting, তাই দূর থেকে নেওয়া ছবির আখ্যা হয়েছে Long Shot, মাঝামাঝি ব্যবধান থেকে নেওয়া ছবিকে বলে—Mid-Shot; ক্যামেরাকে গতির অনুগামী করে যে ছবি তোলা হয়, তাকে বলে—Track Shot ইত্যাদি। 'Closeup, Fadein, Fade out, Dissolve প্রভৃতি কথাগুলির তাৎপর্য্য আগেই লিপিবদ্ধ ক'রেছি, তার পর

জানা দরকার ছবির—Titles বা পরিচয় লিপি। পরিচয় লিপি তিন চার রকম—Titles, Sub-Titles, Grand Titles ইত্যাদি। এ গুলোর প্রয়োজনীয়তা জানা থাকলে চিত্র-নাট্য রচনা সহজ ও সম্পূর্ণ হ'তে পারে। মূকচিত্রে অবশ্য এ 'পরিচয়' নিপ্রয়োজন।

অনেক সময় কেবলমাত্র গল্পটুকু পেলেই পরিচালক তাকে চিত্রনাট্যে রূপান্তরিত ক'রে নেন। চলচ্চিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞ পরিচালক যেখানে স্বয়ং গল্প রচনা ও চিত্রনাট্য প্রস্তুত ক'রতে পারেন সেখানে ছবি প্রায়ই খুব ভালো উৎরে যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ শ্রীযুক্ত দেবকী-বসুর পরিচালিত 'অপরাধীর' উল্লেখ করা যেতে পারে। বাংলা ছবির মধ্যে এখানি সকলদিক দিয়ে অনেকটা এগিয়ে এসেছে ব'লতেই হবে। গল্পটির মধ্যে আগাগোড়া বিলাতী গন্ধ থাকলেও পরিচালক স্বয়ং সেটি রচনা করেছিলেন এবং তার চিত্ররূপ দেবার স্বাধীনতা পেয়েছিলেন বলেই—ছবিখানিও ভালো হবার সুযোগ পেয়েছিল।

যেখানে চলচ্চিত্র সম্বন্ধে সুবিজ্ঞ পরিচালক স্বয়ং সাহিত্য রচনায় তেমন সুপটু নন সেখানে তাঁকে চিত্র-নাট্যের জন্ম জনকয়েক সুলেখকের উপর নির্ভর করতেই হয়। এ যিনি না করেন – তিনি ঠকেন। সুসাহিত্যিকের সহযোগীতা ব্যতিত সুচিত্র প্রস্তুত করা তাঁর পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর নয়। এমন কি তিনি যদি প্রসিদ্ধ কোনো গল্পলেখক বা ঔপন্তাসিকের বিখ্যাত কোনো রচনা নিয়েও ছবি ক'রতে নামেন তা হ'লেও তাঁকে অকৃতকার্য্য হ'তে হয়। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অতুলনীয় রচনা 'শ্রীকান্ত' ছবির পর্দ্দায় যে শোচনীয় রূপ পরিগ্রহ করেছিল তার পর আর এ কথা আশা করি কাউকে ছ'বার বুঝিয়ে বলবার প্রয়োজন নেই। বাংলা ছবির প্রথম যুগে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 'মান-ভঞ্জনেরও' ঠিক্ এমনিই দুর্দ্দশা হ'তে দেখেছিলুম। সাহিত্য রসিকদের সহযোগীতার অভাবেই দেশী ছবির চিত্র পরিচয় (Titles) অবাক্ যুগে অপাঠ্য হ'য়ে উঠ্‌তো!

আবার খ্যাতি ও নামের মোহে ছবির জন্ম গল্প নির্ব্বাচন ক'রতে পরিচালকেরা অনেক সময় ভুল ক'রে ফেলেন। এ ভুলের পরিচয় আমরা সম্প্রতি পেয়েছি 'বিচারক' ও 'নটীর পূজায়'। এই 'বিচারক' এবং 'নটীর পূজাকে'ও ছবির পর্দ্দায় জয়যুক্ত ক'রে তোলা হয়ত সম্ভবপর হ'তে পারতো যদি এই ছবির পরিচালকেরা দুঃসাহসিকতার সঙ্গে এগুলির আবশ্যকীয় চিত্ররূপ দিতে বদ্ধপরিকর হ'তেন। অর্থাৎ—ইচ্ছামত অদল-বদল ক'রে নিতেন। যেমন ওদেশের পরিচালকেরা অনেকেই ক'রে থাকেন। স্পেনের বিখ্যাত লেখক শ্রীযুক্ত ব্লাস্কো আইবানেজ্ (Blasco Ibanez) তাঁর একখানি উপন্তাসের চিত্ররূপ দেখতে গিয়ে ক্ষেপে উঠেছিলেন একবারে! বইখানি তাঁর সেই বিখ্যাত—"The Four Horsemen of the Apocalypse." যিনি চিত্রনাট্য রচনা ক'রেছিলেন তিনি বার্ষিক বেতন পান ৭৫০০০৲ ডলার অর্থাৎ মাসিক প্রায় দু'হাজার টাকা! তিনি গম্ভীরভাবে আইবানেজ্‌কে বললেন—"দেখুন, আপনার নায়কের এ রকম অবৈধ প্রণয়ের প্রশ্রয় দেওয়া এদেশে চলবেনা।" আইবানেজ্ আপত্তি জানিয়ে বললেন—"কিন্তু, আমার গল্পে ও প্রেমের ব্যাপারটা থাকা দরকার যে, অবৈধ না হ'য়ে উপায় কি? স্ত্রীলোকটি যে বিবাহিত এবং তাঁর স্বামীও জীবিত।" চিত্রনাট্য রচয়িতা বললেন—"সেজন্ম ভাববেন না, ওঁর স্বামীকে

ঐতিহাসিক চিত্র — 'ন্যাপোলিঁয়ো বোনা
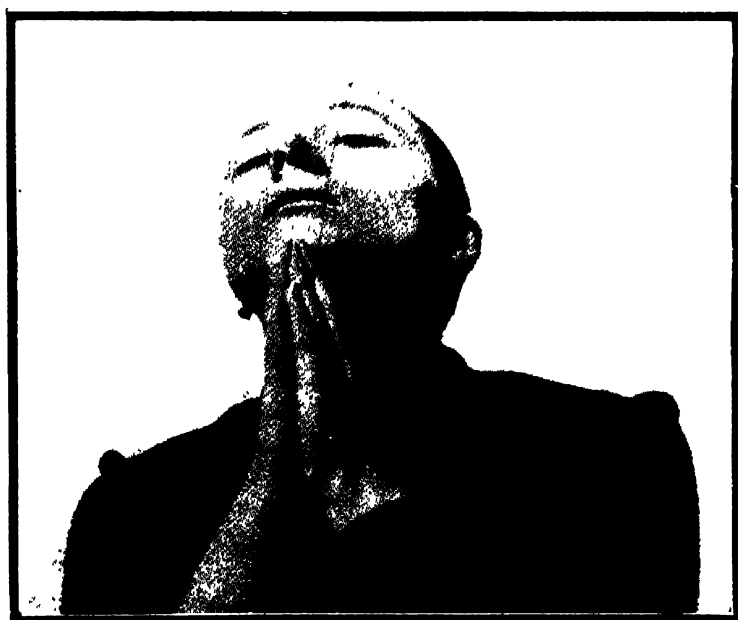
ধর্ম্মমূলক চিত্র—(জোয়ান অফ্ আর্ক্
ছবির দৃশ্য) (close up)

ধর্ম্মমূলক চিত্র—(জোয়ান্ অফ্ আর্ক্
ছবির আর একটি দৃশ্য)　　১২:

বিরাট চিত্র—(বিশ্ববিশ্রুত Metropolis
ছবির অপূর্ব্ব আলোক চিত্র)

আমি মারবই, নইলে ব্যাপারটা কিছুতেই বৈধ হয়না। তা'ছাড়া, আর একটা কাজও আমাকে ক'রতে হবে, ওই যুদ্ধ বিগ্রহের ব্যাপারটা একেবারে উড়িয়ে দিতে হবে।" আইবানেজ্ দুই চক্ষু কপালে তুলে বললেন, "বলেন কি? ঐ যুদ্ধ বিগ্রহের ভিত্তির উপরই'ত আমার গল্পটি গড়ে উঠেছে!" চিত্রনাট্য রচয়িতা আরও গম্ভীর হ'য়ে বললেন—"তা'হোক, ছবিতে সেজন্য কিছু আসে যায়না। আর দেখুন, ও-রকম ক'রে আপনার নায়কের মৃত্যু হ'লে চলবেনা! ওকে আমায় বাঁচিয়ে রাখতেই হবে!" আইবানেজ্ এবার চীৎকার করে উঠে বললেন, "কী সর্ব্বনাশ! খবরদার আপনি তা' ক'রতে পাবেননা! ওর মৃত্যুই যে আসল ব্যাপার! আমি এ বই লিখেছি শুধু ওর ঐ মৃত্যু অনিবার্য্য দেখাবার জন্যই!" চিত্রনাট্য রচয়িতা এবার একটু মৃদু হেসে বললেন,—"কিন্তু, তা'বলেত আমাদের ছবিখানির অকাল-মৃত্যু ঘটাতে পারিনি! আপনার নায়ক যদি এভাবে মরে, সঙ্গে সঙ্গে এ ছবিও মরবে!" আইবানেজ্ মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন—"কিন্তু, না না সে হ'তেই পারেনা—আপনি কি ক'রে ওকে বাঁচাবেন—তা'হলে যে সব মাটি হবে!" চিত্রনাট্য রচয়িতা বললেন—"বাঁচাবার ভার আমিই নিলেম, সেজন্য আপনি কেন অকারণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হ'চ্ছেন! আপনি বুঝতে পারছেননা—গল্পে ওকে মারা আপনার পক্ষে বেশ সহজ হ'য়েছে, স্বাভাবিকও কতকটা, কিন্তু, ছবিতে ও কিছুতেই মরতে পারেনা—ওকে মারা মানে—আমাদের আত্মহত্যা করা!" আইবানেজের বন্ধুরা এ গল্প শুনে অবাক হ'য়ে তাঁকে যখন জিজ্ঞাসা করলেন—"এ ধৃষ্টতা আপনি কি ক'রে সহ্য করলেন? আইবানেজ্ মৃদু হেসে বললেন—"না ক'রেই-বা উপায় কি?—চল্লিশ হাজার ডলার—অর্থাৎ প্রায় দেড় লক্ষ টাকা সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া গেল—এ কি সোজা কথা হে? এর জন্য লোকে খুন ক'রতে পারে যে!"

চলচ্চিত্র সম্বন্ধে যাঁর সবিশেষ অভিজ্ঞতা নেই তিনি সুসাহিত্যিক হ'লেও যে সুপরিচালক হ'তে পারেন না এ কথা বলাই বাহুল্য। সুতরাং দেখা যাচ্ছে কেবলমাত্র একজন পরিচালকের একার চেষ্টায় কোনো ছবিই সুন্দর হ'তে পারে না, যদি না তিনি একাধারে চলচ্চিত্রাভিজ্ঞ, সুসাহিত্যক, আলোকচিত্রে পটু এবং অভিনয়ে সুদক্ষ হন। এ ছাড়া পরিচালকের যে গুণটি সবচেয়ে বেশী থাকা দরকার সেটি হচ্ছে—চিত্রবোধ (cinema sense) এরূপ একাধারে সর্ব্বগুণ সম্পন্ন পরিচালক পাওয়া দুর্লভ ব'লেই প্রযোজকদের উচিত বিভিন্ন বিভাগের বিশেষজ্ঞদের সংগ্রহ করে একটি দল গঠন করা এবং তাদের নিয়ে একত্রে একযোগে কার্য্য করা। এই ভাবে কাজ ক'রতে না পারলে ভালো ছবি হওয়া সম্ভব নয়।

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরচ্চন্দ্রের একাধিক শ্রেষ্ঠ রচনাই পরের পর চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হ'তে দেখা গেলো, কিন্তু কোনটিই চলচ্চিত্র হিসাবে শ্রেষ্ঠ হ'য়ে উঠতে পারলে না। এই শোচনীয় ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে তাঁদের কোনো বইখানিরই 'চিত্র নাট্য' ঠিক্ চলচ্চিত্রের উপযোগী করে লেখানো হয় নি এবং এ সকল ছবির পরিচালকেরা রঙ্গালয়ের অভিনেয় নাটক এবং ছায়াচিত্রে অভিনেয় নাটকের পার্থক্য ও তাহার সম্পূর্ণ ভিন্ন অভিব্যক্তি স্বীকার করেন নি অথবা সে সম্বন্ধে তাঁরা অভিজ্ঞ নন!

যে সব বিখ্যাত লেখকের প্রসিদ্ধ গল্প ও উপন্যাস আমরা একদিন পড়েছি বা যে সব নামজাদা নাটকের অভিনয় আমরা রঙ্গমঞ্চে দেখেছি, ছবিতে এতদিন আমরা সেই সব গল্প উপন্যাস ও নাটকই সজীব চিত্রে রূপান্তরিত হ'য়ে উঠ্‌ছে দেখছিলুম, কিন্তু, আজকাল দেখা যাচ্ছে– ছবির জন্য বিশেষ ক'রে আলাদা গল্প উপন্যাস ও নাটক লেখা হ'চ্ছে! এর কারণ আর কিছুই নয়, জগতের সাহিত্যে অসংখ্য উপন্যাস ও নাটক থাকলেও তার সবগুলি ঠিক ছবির উপযুক্ত নয়। যে গল্পের মধ্যে কথার চেয়ে ছবিই ফুটে ওঠে বেশী, চলচ্চিত্রে কেবলমাত্র সেই ধরণের গল্পই রূপান্তরিত হওয়া সম্ভব। তাই ছবির জন্য বিশেষ ভাবে আজ সেই রকম গল্পই লেখাবার প্রয়োজন হ'য়েছে যার ভাষা—কথা নয় · চিত্র! অর্থাৎ, ছবির পর ছবি দিয়ে যে গল্প দর্শকের চ'খের সামনে জীবন্ত ক'রে তোলা যায়, সেই গল্পই চিত্রনাট্যের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত। ছবির জন্য বিশেষ করে এই ধরণের গল্প উপন্যাস নাটক প্রহসন প্রভৃতি রচনা করা সুরু হ'য়ে গেছে, যা ইতিপূর্ব্বে কোনো মাসিক পত্রে বা পুস্তকাকারে কেউ পড়েনি এবং রঙ্গমঞ্চের উপর অভিনয় হতেও দেখেনি। অদূর ভবিষ্যতে আশা করা যায় 'চিত্র-সাহিত্য' ব'লে সাহিত্যের একটা বিশেষ বিভাগ গ'ড়ে উঠবে।

রঙ্গালয়ের জন্য যেভাবে নাটক রচিত হয়, ছবির পর্দ্দার জন্য ঠিক সেভাবে চিত্র-নাট্য লেখালে চলবে না একথা পূর্ব্বেও বলেছি, আবার বলছি। এবং চিত্রাভিনয়ও যদি রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ের অনুসরণ করে তাহ'লে চলচ্চিত্র হিসাবে সে যে ব্যর্থ হবেই এ সম্বন্ধেও পুনরুক্তি করা বাহুল্য মাত্র। 'চিত্র-নাট্য' কী-ভাবে রচিত হওয়া উচিত, আমি এখানে শরচ্চন্দ্রের একটি গল্প অবলম্বনে তার বিশেষত্বটুকু পরিস্ফুট ক'রে দেখাবার চেষ্টা ক'রছি। গল্পটি—

কাশীনাথ

চুম্বক

(Synopsis)

কাশীনাথ শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন। মাতুলালয়ে আনাদরে অযত্নে প্রতিপালিত। বয়স আঠারো। টোলে পড়াশুনা করে। সুখে দুঃখে নির্ব্বিকার।

মাতুল মধুসূদন পূজারী ব্রাহ্মণ। মাতুলানী মুখরা - মমতাহীনা। মাতুলপুত্র হরিচরণ কাশীনাথের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন। মাতুলগৃহে সকলেই কাশীনাথকে অশ্রদ্ধা করে, কেবল মাতুল কন্যা বিন্দুবাসিনী তাকে স্নেহচক্ষে দেখে। কাশীনাথ তাই বিন্দুবাসিনীর অনুগত।

জমীদার প্রিয়নাথবাবু অপুত্রক। একমাত্র আদরিণী কন্যা কমলাই তাঁর সব। অত্যধিক আদরে কমলা স্বেচ্ছাচারিণী। কন্যা বিবাহযোগ্যা। প্রিয়নাথ সুপাত্র সন্ধান ক'রছেন। গুরুদেব কাশীনাথের সন্ধান দিলেন। প্রিয়নাথ তাকে মনোনীত করে কন্যার সঙ্গে বিবাহ দিলেন এবং 'ঘরজামাই' করে রাখলেন।

কমলা স্বামীর প্রকৃতি ঠিক বুঝতে পারলে না। ফলে উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্যের সূত্রপাত হ'লো।

নাট্য চিত্র—(Piccadily ছবির নায়িকারূপে
Anna May Wong) ১৫০
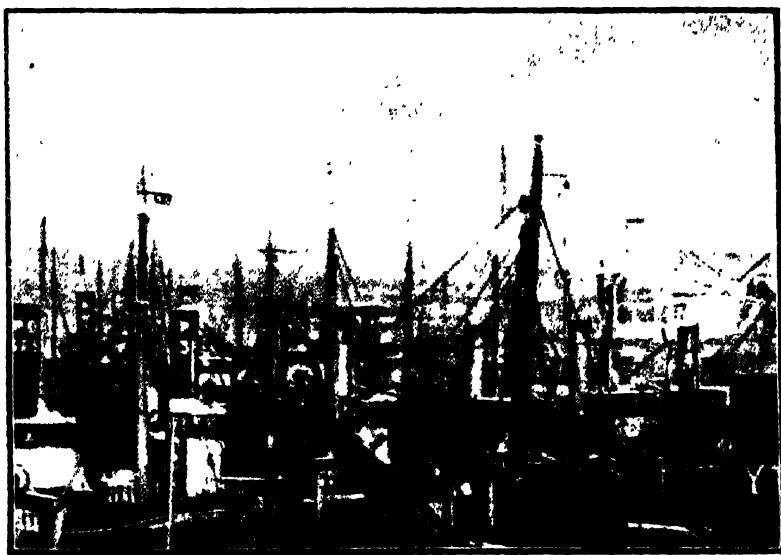
শিক্ষাচিত্র—('Drifters' ছবিতে
ধীবর নৌবাহিনী) ১৫২
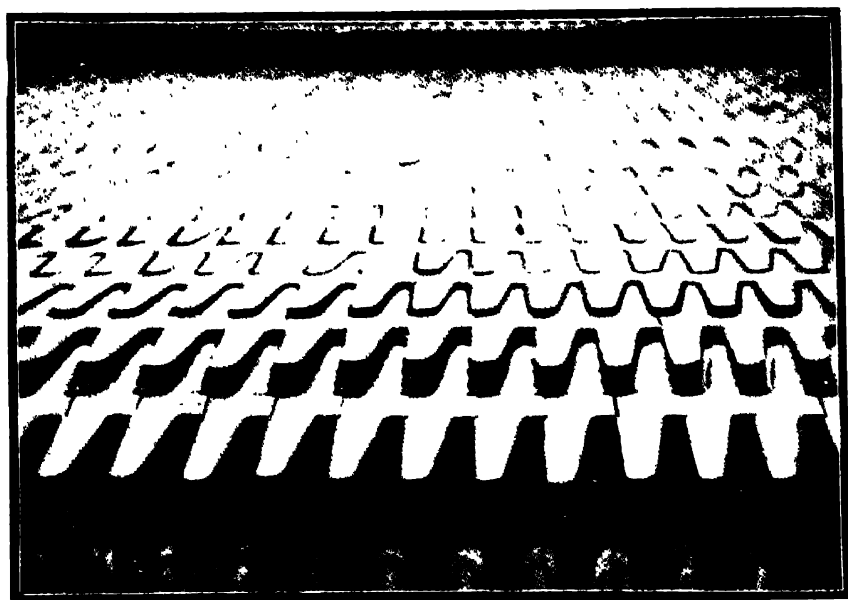
নিছক চিত্র—(La Marche Des Machines ছবিতে কলকব্জার রূপ) ১৫৫

অসীমের রূপ !—(Old & New ছবিতে একটি নিসর্গ দৃশ্য) ১৫৪

অল্পদিন পরেই প্রিয়নাথবাবু অসুস্থ হয়ে পড়লেন। উইল ক'রে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি কন্যা ও জামাতাকে সমানভাগ করে দিলেন। কমলা এতে প্রবল আপত্তি জানিয়ে পিতার সমস্ত সম্পত্তি নিজের নামে লিখিয়ে নিলে।

প্রিয়নাথবাবুর মৃত্যুর পর কমলার বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণ করছিল কাশীনাথ। কিন্তু মধ্যে বিন্দুবাসিনীর চিঠিতে তার স্বামীর অসুস্থতা ও তাদের অর্থাভাবের বিষয় জানতে পেরে কাশীনাথ কিছু টাকা নিয়ে বিন্দুবাসিনীকে সাহায্য ক'রতে গেলো। কমলা এ ব্যাপারে কাশীনাথের উপর বিরক্ত হ'য়ে একজন নূতন ম্যানেজার রেখে নিজেই বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করতে সুরু করে দিলে।

কাশীনাথ ফিরে এসে দেখলে যে সে বাড়ীতে তার আর স্থান নেই। নূতন ম্যানেজার ও পত্নী কমলার কাছে বার বার অপমানিত হ'য়ে কাশীনাথ যেদিন গৃহত্যাগ করলে সেইদিনই রাত্রে পথের মাঝখানে লাঠিয়ালদের হাতে মার খেয়ে কাশীনাথ আহত হ'য়ে পড়ে রইল। বিন্দুবাসিনীর স্বামী সেরে উঠে বিন্দুকে নিয়ে কাশীনাথের সঙ্গে দেখা ক'রতে আসবার সময় পথের মাঝে কাশীনাথকে আহত অবস্থায় পড়ে আছে দেখে তুলে নিয়ে গেলো।

এই ঘটনায় কমলা অত্যন্ত অনুতপ্ত হ'য়ে পড়লো. ফলে স্বামী স্ত্রী মধ্যে পুনর্মিলন ঘট্‌লো।

(শেষ)

গল্পের এই সংক্ষিপ্তসার থেকেই বোঝা যাচ্ছে চলচ্চিত্রে এ কী রূপ নেবে এবং ছবির দিক দিয়ে এর সম্ভাবনা কতখানি। এটি যে 'কথা চিত্র' শ্রেণীর ছবি হবে একথা বলাই বাহুল্য, সুতরাং এই গল্পটির 'চিত্রনাট্য' রচনা ক'রতে হ'লে গল্পের প্রতিপাদ্য বিষয়টুকু যাতে ছবির মধ্যে ফুটে ওঠে এবং প্রসিদ্ধ লেখক শরচ্চন্দ্রের রচনার বিশেষত্বও যাতে কোথাও ক্ষুণ্ণ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে কলম ধ'রতে হবে। প্রত্যেক চিত্র-নাট্যের গোড়ায় গল্পের সারাংশ দিতে হয় এবং পাত্র-পাত্রীদের একটি কোষ্ঠীপত্র বা পরিচয় লিপি লিখে দিতে হয়। তাতে প্রত্যেক চরিত্রের মোটামুটি একটা বর্ণনা থাকা চাই। যেমন—

কাশীনাথ—সুন্দর যুবা, বয়স আঠারো। বয়সের তুলনায় ধীর গম্ভীর। শান্তপ্রকৃতি। সৎস্বভাব, সুখে দুঃখে নির্ব্বিকার-চিত্ত, দৃঢ়মনা, অশেষ সহ্যগুণ। সহজে বিচলিত হয় না। বিপদে স্থির। সঙ্কল্পে অটুট। আত্মমর্য্যাদা সম্বন্ধে সজাগ, রুদ্ধ অভিমানী।

কমলা—চির আদরে লালিতা তরুণী ধনীর দুলালী। রূপ ও আভিজাত্যগর্ব্বিতা, অহঙ্কারে পরিপূর্ণ মন, উদ্ধতস্বভাবা, স্বাধীনা প্রকৃতি, দুর্ব্বিনীতা, কোপন-স্বভাবা। উগ্র, চঞ্চল, অস্থির মতি, দুর্জ্জয় অভিমানিনী।

প্রিয়নাথবাবু—উদার মহৎপ্রাণ সদাশয় জমীদার, স্নেহপ্রবণ পিতা, অনুরক্ত স্বামী। বয়সে প্রৌঢ়। সৌম্যকান্তি। বিচক্ষণ ও বিষয়ী।

এইভাবে মধুসূদন, মধুসূদনের স্ত্রী, হরিচরণ, বিন্দুবাসিনী, গুরুদেব, নূতন ম্যানেজার প্রভৃতি চিত্র-নাট্যের অন্তর্গত প্রত্যেক চরিত্রের কিছু কিছু বর্ণনা সহ একটি তালিকা দিতে হবে। তারপর চিত্র-নাট্য সুরু করা চাই।

গল্পে আমরা পাচ্ছি কাশীনাথ শৈশবে পিতৃমাতৃহীন, মাতুলালয়ে অযত্নে অনাদরে প্রতিপালিত। মাতুলানী তার প্রতি মমতাশূন্য। মাতুলপুত্র হরিচরণ. বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন। একমাত্র মাতুলকন্যা বিন্দুবাসিনী তার প্রতি স্নেহশীলা—সুতরাং এখানে চিত্রনাট্য সুরু করা উচিত প্রধান চরিত্র বা নায়কের শৈশব ঘটনার একটি করুণ দৃশ্য থেকে। কারণ এতে দর্শকদের মনটি গোড়া থেকেই নায়কের প্রতি সহানুভূতিতে ভরে উঠবে ফলে ছবিখানি সুরু থেকেই তাদের চিত্ত স্পর্শ ক'রে একটা আকর্ষণ জাগিয়ে তুলতে পারবে।

অতএব এ চিত্র-নাট্যখানি সুরু ক'রতে হবে ঐ রকম একটি প্রস্তাবনা (Prologue)—দিয়ে। প্রস্তাবনায় যে ক'টি দৃশ্য থাকা প্রয়োজন ভেবে নিয়ে তার একটি তালিকা ক'রে ফেলা চাই। তারপর গল্পটির দিকে লক্ষ্য রেখে মূল নাটকের দৃশ্যাবলীরও একটি তালিকা প্রস্তুত ক'রতে হবে। তাহলে চিত্রনাট্য রচনা করা সহজ সাধ্য হ'য়ে উঠবে এবং পরিচালকেরও কাজের অনেক সুবিধা হ'য়ে যাবে। গল্পটিকে ছবির ভিতর দিয়ে দেখবার চেষ্টা করলেই দৃশ্যবিভাগ আপনা হতেই পরের পর মনে আসবে। লেখক তাঁর কল্পনা-শক্তিকে জাগ্রত ক'রতে পারলে ছবিখানির আরও অনেক সৌন্দর্য্য সম্পাদন ক'রতে সক্ষম হবেন।

আমার মনে হয় প্রস্তাবনাটি এইরকম ক'রলে মন্দ হবে না। অবশ্য, যিনি 'পরিচালক' তিনি আলোক চিত্রকরের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ইচ্ছামত এর পরিবর্ত্তন ক'রে নিতে পারবেন।

তুঙ্গ শৃঙ্গের চিত্র—(Great Medow ছবিতে ক্যামেরা নিয়ে
দশ হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের চূড়োয় উঠে
তুঙ্গ শৃঙ্গের দৃশ্য তোলা হচ্ছে।)
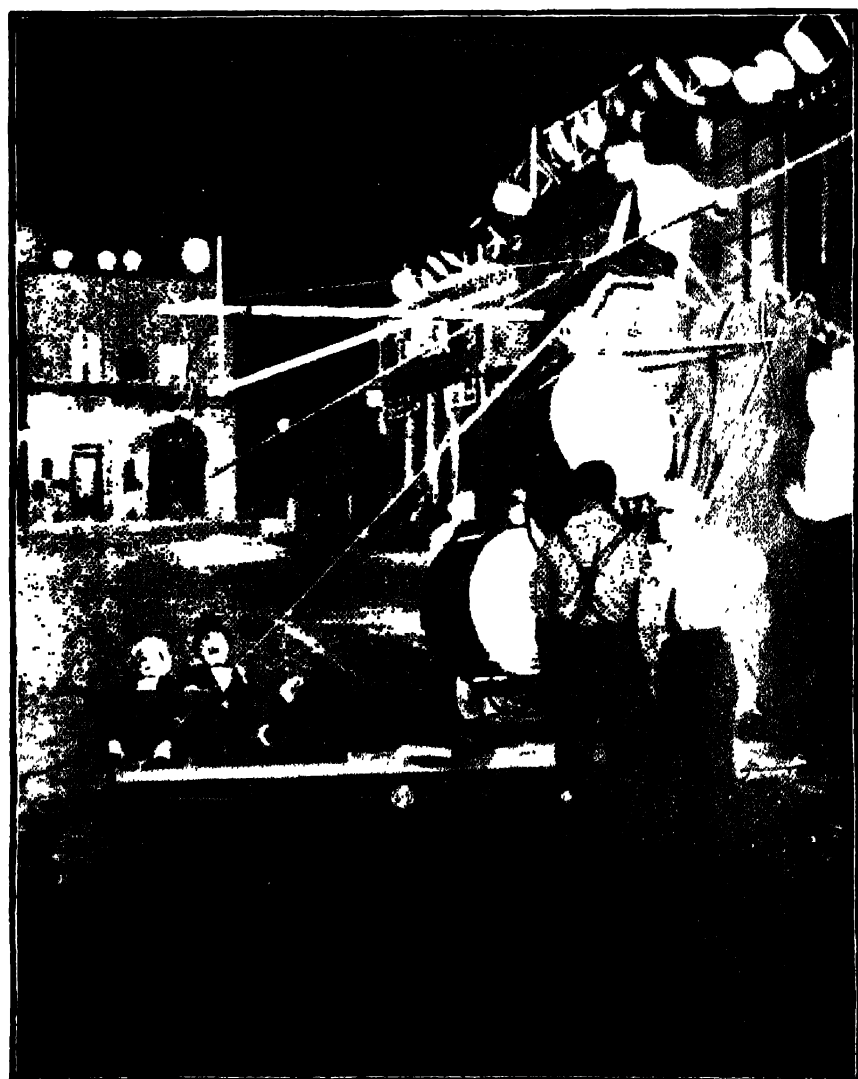
পিছলিয়ে বাড়ী যাওয়া—(Fifty Million French men ছবিতে,
প্যারীর পথ দিয়ে পিছলিয়ে বাড়ী ফেরার একটি দৃশ্য তোলা
হচ্ছে,—হলিউডের চিত্রগড়ে। সমস্ত অভিনয় সাজ
যন্ত্রপাতি লোকজন সব একটি গড়ানে মাচার
উপর তুলে ছবি নেওয়া হয়েছে ?)

THE PROLOGUE

—প্রস্তাবনা—

Grand-Title :—The Advent of Poojah in the Village

পল্লীতে শারদীয়া পূজা

Time—শারদ-প্রভাত

Properties—প্রতিমা, পূজার সরঞ্জাম, ঢাক ঢোল কাঁসর ঘণ্টা

Costume—সকলের নব বস্ত্রাদি উৎসব বেশ

Sub-Title :—"আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে !"

The whole Village is delighted with the joy of the Pujah

Accompanying Music—আগমনী গানের সুর

Scene I,—পল্লীদৃশ্য—(Panorama)

Truck shot leads to

Scene II জনৈক পল্লীবাসীর চণ্ডীমণ্ডপে

Business :—দশভূজার পূজা

Long shot মহাসমারোহে পূজারতি চলছে, ঢাক ঢোল কাঁসর ঘণ্টা বাজছে, দলে দলে ছেলে মেয়ে স্ত্রী পুরুষ এসে প্রতিমা দর্শন ও প্রণাম করছে,

Close up অদূরে যূপকাষ্ঠে ছাগ শিশু বাঁধা

Dissolved into

Scene III—পূজাবাড়ীর প্রবেশদ্বার

Business নহবৎখানায় নহবৎ বাজছে,

Mid shot পূজাবাড়ী প্রবেশের জন্য নরনারী বালক বালিকারা ভীড় করে আসছে,

Long mid পথপার্শ্বে মেলা ব'সেছে, বিবিধ দোকানপাট ; খেলনা পুতুল বিক্রী হ'চ্ছে

Fade out—

Time—same as before

Properties—নহবতের বাদ্য যন্ত্রাদি, আম্র-পল্লব, কদলী বৃক্ষ, সশীর্ষ ডাব, পূর্ণ কুম্ভ, দোকান ; খেলনা পুতুল ইত্যাদি

Costume—উৎসববেশ

Grand Title—A Lonely Orphan

একটি নিঃসঙ্গ অনাথ শিশু।

Subtitle—Kasinath at his uncles place.

মাতুলালয়ে কাশীনাথ

Deprived of all affection and care which a child needs most.

আশৈশব সকলের স্নেহ যত্নে বঞ্চিত!

Time—Same

Properties—ফুটো বালতি, কুয়োর দড়ী,

Costume—ছিন্ন মলিন বস্ত্রে কাশীনাথ—

Fade in—Scene IV মধুসূদনের কুটীর প্রাঙ্গন। প্রাঙ্গণের একপাশে বড় একটি চাঁপা গাছ। চাঁপাগাছের পাশ দিয়ে বাগানের পথ! পথের ধারে সারি সারি ফুলগাছ। চাঁপাতলায় বাঁধানো কূপ

Business কাশীনাথ অতিকষ্টে বাল্‌তি ক'রে কূপ হ'তে জল তুলছে।

mid shot সেই জলের বাল্‌তি দু'হাতে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে ফুলগাছে জল দিচ্ছে'

close up হাঁপিয়ে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ছে!

Lap Dissolve into ···Scene. I

Fadeout—

closeup—যূপকাষ্ঠে ছাগশিশু বাঁধা

Fade in—scene II পূজাবাড়ীর প্রবেশ দ্বার—

Time—Same

Properties—দ্বারপালের হাতে লাঠি

Costume—দ্বারপালের উর্দ্দিপরা, ভিখারি মেয়ের ছিন্ন মলিন বেশ

Business—দ্বারপালেরা উৎসব বেশধারীদের প্রবেশ ক'রতে দিচ্ছে, কিন্তু, দুঃখী ভিখারীদের যেতে দিচ্ছে না।

close up—একটি মেয়ে—কাঙ্গালিনী—করুণ নেত্রে দ্বারে দাঁড়িয়ে!

Sub-Title—"হের ঐ ধনীর দুয়ারে দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে!"

Fade out—

Revive scene IV

Time—Same

Propertis—বাল্‌তী, বাঁশী, পুতুল, সন্দেশের থালা. ফুল, মালা গাঁথার ছুঁচ সুতা,

Costume—উৎসব বেশে বিন্দু ও হরিচরণ, ছিন্ন মলিন বেশে কাশীনাথ

Business—জল সেচনে ক্লান্ত কাশীনাথ পূজার স্বপ্ন দেখ্‌ছে।

Close up বাল্‌তি হাতে কাশীনাথ কুয়োর পাড়ে বসেছিল; নূতন জামা-কাপড় প'রে

বাঁশী ও পুতুল হাতে বালক হরিচরণ এসে তাকে আপনার সাজসজ্জা ও সম্পদ দেখালে, কাশীনাথ মুখ ফিরিয়ে নিয়ে উঠে প'ড়লো এবং জল তুলে গাছে দিতে গেল।

mid shot ফুটো বাল্‌তী থেকে জল ফিন্‌কী দিয়ে এসে হরিচরণের নতুন জামা কাপড় ও জুতো ভিজিয়ে দিলে। হরিচরণ রাগে ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠে কাশীনাথকে খুব মারলে।

mid shot কাশীনাথ জলের বাল্‌তি তুলে হরিচরণকে মারতে যাচ্ছিল; কিন্তু মামী আসছে দেখে উদ্যত বাহু নামিয়ে নিলে।

সন্দেশের থালা হাতে মামী এসে হরিচরণকে সন্দেশ খেতে দিলে—হরিচরণ মা'র কাছে কাশীনাথের নামে লাগালে যে সে তার নতুন জুতোজামা ভিজিয়ে দিয়েছে। মামী কাশীনাথকে ব'কলে ও সন্দেশ না দিয়ে চলে গেল।

close up হরিচরণ খুসী হ'য়ে কাশীনাথকে তার সন্দেশ দেখিয়ে ভেঙ্‌চে চলে গেলো, কাশীনাথ জলের বাল্‌তি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

mid shot এমন সময় বালিকা বিন্দুবাসিনী এসে তা'কে কাঁদতে দেখে আঁচল দিয়ে তার চোখ মুছিয়ে দিলে।

Grand Title—The solitary Sympathiser.

Sub-Title—The only joy of his Childhood !—

"তার দুঃখের দুখী ব্যাথার ব্যথী শৈশবের একমাত্র সঙ্গিনী !"

বিন্দু নিজের হাতের সন্দেশ তাকে খাইয়ে দিলে। বাবাকে বলে কাশীনাথের জন্য নূতন পূজার কাপড় কিনে দেবে বললে। কাশীনাথ তবুও ম্লান মুখে বসে রইল দেখে তার হাত ধ'রে টেনে তুলে চাঁপাফুল পেড়ে দিতে বললে। কাশীনাথ চোখ মুছে মালকোঁচা বেঁধে গাছে উঠে ফুল পাড়তে লাগলো, বিন্দুবাসিনী কুড়িয়ে জড়ো করতে লাগলো।

long shot আঁচল ভরে উঠ্‌তেই কাশীনাথকে গাছ থেকে নেমে আসতে বললে। কাশীনাথ নেমে আসতে তার কাণে একটি ফুল পরিয়ে দিয়ে তার হাত ধরে টেনে কুয়োর ধারে নিয়ে গিয়ে বসালে এবং নিজে তার পায়ের কাছে ব'সে মালা গাঁথতে সুরু করলে।

close up দু'জনে গল্প ক'রতে লাগলো।

Sub-Title—A constant menace !

চির-শত্রু !

হরিচরণ এসে একটু দেখলে তারপর কাশীনাথের কাণের ফুল কেড়ে নিলে ও বিন্দুর আঁচলের ফুল সব ছড়িয়ে ফেলে দিলে !

Dissolved into—Scene V. মধুসূদনের বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপ

Time—Afternoon

Properties—মহাভারত

Costume—আটপৌরে ধুতি সাড়ী

Business সিঁড়ির উঁচু ধাপের উপর বসে কাশীনাথ মহাভারত পড়ছে ;

mid shot [illegible] কাছে নীচের ধাপে বিন্দু-বাসিনী বসে শুনছে।

close up হরিচরণ কাছে দাঁড়িয়ে মুখভঙ্গী করে দেখছে—

Double Exposure (The Boys & girl slowly transformed into grown ups) হরিচরণ একটু পরে কাশীনাথের হাত থেকে মহাভারতখানা কেড়ে নিয়ে টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেলো।

mid shot কাশীনাথ বিরক্ত হয়ে—সেদিকে চেয়ে রইল।

বিন্দু উঠে বইখানি কুড়িয়ে নিয়ে এসে কাশীনাথকে দিতে যাচ্ছিল এমন সময় মামী এসে মেয়েকে সেখান থেকে চলে যেতে ব'ললে।

বিন্দুর হাত থেকে বইখানি মাটিতে পড়ে গেল।

Close-up সে ধীরে ধীরে অপ্রসন্ন নতমুখে বাড়ীর ভিতর চলে গেলো। মামী কাশীনাথকে তীব্র ভর্ৎসনা ক'রে চলে গেলেন।

Sub-Title—A grown up young man who never earns a penny, ought to be ashamed of living upon others, and running after girls.

বুড়ো মদ্দ ছেলে, এক পয়সা রোজগার করবার নাম নেই, কেবল ব'সে ব'সে গিলবে, আর কুণো বেরালের মত মেয়েদের আঁচল ধরে পড়ে থাকবে!—লজ্জা করেনা একটু!

close up কাশীনাথ অপমানের রুদ্ধ ক্ষোভে ভূলুণ্ঠিত বইখানার দিকে চেয়ে বসে রইল।

fade out—

এইখানে প্রস্তাবনা শেষ করে এইবার মূল গল্পের চিত্রনাট্য সুরু করা উচিত। মূল গল্পটি অনুসরণ ক'রলে ছবির হিসাবে দেখা যাবে ৪১ খানি ছবির মধ্যে গল্পটিকে ফুটিয়ে তোলা যায় যেমন:—

Shots ছবির সংখ্যা	Details ছবির বিবরণ
১, জমীদার প্রিয়বাবুর বাড়ী	(১) ঘটনাচক্রে কাশীনাথের সঙ্গে কমলার ক্ষণিকের দেখা। প্রিয়বাবু তাঁর গুরুদেবের সহিত পরামর্শ ক'রে কাশীনাথের সঙ্গে কমলার বিবাহ দেওয়া স্থির করলেন।
২, মধুসূদনের বাড়ী	(২) মধুসূদনের বাড়ী গিয়ে কথা পাকা ক'রে এলেন। মধুসূদন ও তার স্ত্রী হরিচরণের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব ক'রলে। প্রিয়বাবু অসম্মত হলেন।
৩, কাশীনাথের সঙ্গে কমলার বিবাহ	(৩) কাশীনাথের সঙ্গে কমলার বিবাহ হ'লো—

৪, দরিদ্র কাশীনাথের জমীদারের জামাতায় রূপান্তর

(৪) দরিদ্র ভট্টাচার্য্যের পুত্র কাশীনাথের একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে বাবু সাজতে হ'লো। তার বাথরূমে স্নান, তার জুড়ী চড়ে সান্ধ্যভ্রমণ, তার চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় আহার, তার দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যায় শয়ন, তার সুবৃহৎ লাইব্রেরী, ক্রমাগত তাকে তার পূর্ব্বে দুরবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে লাগলো। কাশীনাথ অসাচ্ছন্দ্য বোধ করে।

৫, নবপরিণীত দম্পতী

(৫) কাশীনাথের মনে সুখ নেই দেখে কমলা তার জন্য চিন্তিত, কাশীনাথ বিরক্ত।

৬, কাশীনাথের মাতুলালয়ে যাত্রা

(৬) কাশীনাথ মাতুলালয়ে চললো, পথে দ্বারবান সঙ্গে যাচ্ছে দেখে কাশীনাথ তাকে ফিরে যেতে ব'ললে, দ্বারবান তার অবাধ্য হ'ল।

মাতুলালয়ে কাশীনাথ

(৭) কাশীনাথ মাতুলালয়ে গিয়ে বিন্দুবাসিনীর কাছে মনের দুঃখ বললে। হরিচরণ এসে জমীদারের ঘরজামাই ব'লে বিদ্রূপ ক'রে গেলো। কমলাকে বিন্দু দেখতে চাইলে। কাশীনাথকে নিতে জমীদার বাড়ী থেকে গাড়ী এলো। সেই গাড়ীতে বিন্দুকে কাশীনাথ নিয়ে যেতে চাইলে, হরিচরণ আপত্তি করলে।

৮, কাশীনাথ ও কমলা

(৮) কাশীনাথ ফিরে কমলাকে মামার বাড়ীর ঘটনা জানালে—

৯, মাতুলালয়ে কাশীনাথ

(৯) পরের দিন আবার বিন্দুকে আন্‌তে গিয়ে শুনলে বিন্দুর স্বামী অত্যন্ত পীড়িত—'তার' পেয়ে বিন্দু চলে গেছে।

১০, প্রিয়বাবু ও কমলা

(১০) প্রিয়বাবু পীড়িত, কমলার সেবা।

১১, কাশীনাথ ও কমলা

(১১) কাশীনাথের মনোকষ্ট ও অসুস্থতা, কমলা কারণ জানতে ব্যগ্র, কাশীনাথের স্বীকারোক্তি যে এ বিবাহে সে সুখী হ'তে পারে নি।

১২, প্রিয়বাবু ও কাশীনাথ	(১২) প্রিয়বাবু কাশীনাথের উপর জমীদারীর ভার দিলেন।
১৩, উকীল ও প্রিয়বাবু	(১৩) উকীলকে ডেকে উইল ক'রে সমস্ত সম্পত্তি কন্যাজামাতাকে সমান ভাগ ক'রে দিলেন ; কমলা আপত্তি ক'রে সমস্ত সম্পত্তি নিজ নামে লিখিয়ে নিলে।
১৪, প্রিয়বাবুর মৃত্যু	(১৪) প্রিয়বাবুর মৃত্যু।
১৫, কাশীনাথ ও দেওয়ান	(১৫) দেওয়ানকে নিয়ে কাশীনাথের জমীদারী সম্বন্ধে আলোচনা ও উইলের বিষয় অবগত হওয়া।
১৬, কমলা ও পরিচারিকা	(১৬) কমলা স্বামীর উদাসীনতার জন্য দুঃখিত। পরিচারিকার কাছে অভি-যোগ, পরিচারিকার কাশীনাথের পক্ষ সমর্থন।
১৭, কমলার পীড়া	(১৭) কমলার পীড়ায় কাশীনাথের একাগ্র সেবা যত্ন।
১৮, জমীদার কাশীনাথ	(১৮) জমীদার কাশীনাথের লোকপ্রিয়তা।
১৯, কাশীনাথ ও কমলা	(১৯) কাশীনাথকে কমলার অশ্রদ্ধা, পরি-চারিকার কর্ম্মচ্যুতি নিয়ে স্বামীর অবাধ্যতা।
২০ কলিকাতায় কাশীনাথ	(২০) বিন্দুর চিঠি পেয়ে কাউকে কিছু না ব'লে কাশীনাথের কলিকাতা যাত্রা।
২১, কমলা ও দেওয়ানজী	(২১) কমলার দেওয়ানজীকে ব'লে নূতন ম্যানেজার নিয়োগ।
২২, দেওঘরে কাশীনাথ	(২২) বিন্দু ও তার স্বামীকে নিয়ে ডাক্তারের পরামর্শে কাশীনাথের দেওঘর যাত্রা।
২৩, নূতন ম্যানেজার ও কমলা	(২৩) নূতন ম্যানেজারকে কমলার কার্য্যভার প্রদান।
২৪, কাশীনাথ ও নূতন ম্যানেজার	(২৪) তিনমাস পরে ফিরে এসে কাশীনাথ বুঝলে এ বাড়ীতে তার স্থান নেই। নূতন ম্যানেজার তাকে মানে না।

২৫, কমলা ও কাশীনাথ	(২৫) কমলার কাছে কাশীনাথের অভিযোগ। কমলার ম্যানেজারের পক্ষ অবলম্বন।
২৬, কাশীনাথ ও ব্রাহ্মণ প্রজা	(২৬) ব্রাহ্মণপ্রজার কাশীনাথের কাছে নূতন ম্যানেজারের বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগ।
২৭, কমলা ও কাশীনাথ	(২৭) কমলাকে কাশীনাথের সেকথা বিজ্ঞাপন। কমলা এবারও নূতন ম্যানেজারের পক্ষ নিলে।
২৮, বারবাড়ীতে কাশীনাথ	(২৮) কাশীনাথ অন্তঃপুর ত্যাগ করে বার-বাড়ীতে অশ্রয় নিলে।
২৯, কমলা ও নূতন ম্যানেজার	(২) কমলাকে নূতন ম্যানেজার কাশীনাথের বিরুদ্ধে অনেক কথা বললে।
৩০, কাশীনাথ দুঃস্থ	(৩০) বিন্দুর চিঠি পেয়ে কাশীনাথ নিজের ঘড়ীচেন বেচে বিন্দুকে ৫০০৲ টাকা পাঠালে। ব্রাহ্মণ-প্রজাদের নালিশ করতে বললে এবং নিজে তাদের পক্ষে সাক্ষী দেবে জানালে।
৩১, কমলা ও নূতন ম্যানেজার	(৩১) নূতন ম্যানেজার কমলাকে জানালে কাশীনাথের বিরুদ্ধ সাক্ষ্যের জন্য মামলায় হার হয়েছে।
৩২, কাশীনাথ ও কমলা	(৩২) কমলা কাশীনাথকে এইজন্য তীব্র তিরস্কার ও অপমান করলে।
৩৩, কাশীনাথের গৃহত্যাগ	(৩৩) কাশীনাথ গৃহত্যাগ করে চলে গেল।
৩৪, কমলা ও ম্যানেজার	(৩৪) কাশীনাথকে জব্দ করবার জন্য কমলা নূতন ম্যানেজারকে হুকুম দিল।
৩৫, পথের মাঝে কাশীনাথ আহত	(৩৫) ম্যানেজার লোক সঙ্গে নিয়ে পথের মাঝে কাশীনাথকে মেরে রেখে গেল।
৩৬, বিন্দু ও তার স্বামীর কাশীনাথকে পাওয়া	(৩৬) বিন্দু ও তার স্বামী দেশে আসবার পথে তাকে কুড়িয়ে পেলো।
৩৭, কমলা ও পরিচারিকা	(৩৭) পরিচারিকার মুখে কমলা কাশীনাথের অবস্থা শুনে মর্ম্মাহত হ'ল।
৩৮, গ্রামে হুলস্থূল	(৩৮) গ্রামে এই নিয়ে হুলস্থূল প'ড়ে গেল।

৩৯, ডাক্তার, কাশীনাথ, বিন্দু, কমলা, পুলিশ	(৩৯) ডাক্তার বাঁচবার আশা দিয়ে গেল। কমলা ও বিন্দুর সেবা। পুলিশ এই দুর্ঘটনার অনুসন্ধানে কাশীনাথের ও ম্যানেজারের জবানবন্দী নিতে এলো। কমলার ভয়। কে মেরেছে জেনেও পুলিশের কাছে এজেহারে কাশীনাথ তা প্রকাশ করলেনা।
৪০, সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় কাশীনাথ, বিন্দু, কমলা	(৪০) বিকারের ঘোরে কাশীনাথের মুখে সেকথা প্রকাশ হ'লো, অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। ডাক্তার এসে ভালো করলে, বিন্দুর ও কমলার সেবা। কাশীনাথের আরোগ্য লাভ।
৪১, কাশীনাথ, কমলা।	(৪১) কমলার কাশীনাথের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা। কাশীনাথ কমলাকে প্রশান্ত মনে ক্ষমা করলে।
(শেষ)	(শেষ)

এই ছবির তালিকা ধরে পরের পর ঠিক এই গল্পের প্রস্তাবনার অনুরূপ ক'রে দৃশ্যগুলি সাজিয়ে লিখতে পারলেই একখানি মূক ছবির জন্য সুসম্পূর্ণ 'চিত্র-নাট্য' রচিত হবে। এর মধ্যে 'পরিচালক' ইচ্ছা ক'রলে অনেক কিছু পরিবর্ত্তন পরিবর্জ্জন ও পরিবর্দ্ধন করতে এবং একাধিক দৃশ্যে 'প্রতীক' বা Symbol ব্যবহার করতে পারেন। প্রতীক্ অনেক ছবিকে সুন্দর ক'রে তুলতে পারে। এ ছবিখানির প্রস্তাবনায় 'যূপকাষ্ঠে বাঁধা ছাগ শিশুকে' আমি অসহায় কাশীনাথের অবস্থার 'প্রতীকরূপে' একবার ব্যবহার ক'রেছি। মূল ছবির চতুর্থ দৃশ্যে যেখানে দরিদ্র ভট্টাচার্য্যের পুত্র কাশীনাথ ধনী জমীদারের জামাতা হ'য়ে সুখী হ'তে পারছে না – সেখানে অরণ্যতরুকে তুলে এনে টবের চারায় পরিণত করার প্রতীক ব্যবহার হ'তে পারে। এমনি ক'রে অনেক খুঁটিনাটি বাড়িয়ে ছবিখানিকে বেশ উপভোগ্য ক'রে তোলা যায়। পরিচালক এই ছবি সম্পাদন করবার সময় কোথায় কোথায় এ ছবির উপযোগী বিরাম কাল (cuts) পাওয়া যেতে পারে বিবেচনা ক'রে একে তিন অংশে (Parts) বা চার অংশে ভাগ ক'রে ফেলতে পারেন।

'কাশীনাথ' গল্পটি 'মূক-ছবি' না হয়ে যদি 'মুখর চিত্র' রূপে গৃহীত হয় তাহ'লে এ 'চিত্রনাট্য থেকে সে ছবি নেওয়া চলবে না। মুখর চিত্রের জন্য নূতন ক'রে 'চিত্র-নাট্য' রচনা করা চাই। কিন্তু, লক্ষ্য রাখতে হবে সে যেন ষ্টেজের নাটক না হয়। কথায় অনেক কিছু বোঝানো যায় বলে—পরিচালক ইচ্ছা করলে 'মুখর চিত্রে ছবিখানিকে ক্ষতিগ্রস্ত না ক'রেও

ছবির অংশ অনেক কমিয়ে ফেলতে পারেন, কিন্তু সেদিকে ঝোঁক দেওয়া কোনো পরিচালকের উচিত নয়, কারণ চিত্র মুখর হ'লেও—সে ছবি! সুতরাং, ছবির সংখ্যা কমানো মানেই ছবিকে হত্যা ক'রে রঙ্গমঞ্চের নাটককে পর্দ্দায় টেনে আনা! তবে ছবির রসমাধুর্য্য নিবিড়তর করে তুলতে ও গল্পের সঙ্গতি (Tempo) রক্ষা কল্লে প্রয়োজনবোধে অবশ্যই ছবির সংখ্যা কমাতে ও বাড়াতে পারেন।

মুখর 'চিত্রনাট্য' করবার সময় 'কাশীনাথ' ছবিতে প্রস্তাবনা অংশ রাখবার প্রয়োজন নেই। কারণ যে দৃশ্যে কাশীনাথ কমলার কাছে বিন্দুবাসিনীর কথা বলবে সেই দৃশ্যে সে তার শৈশবের দুরবস্থার বর্ণনা করবার সুযোগ পাবে সুতরাং মুখর চিত্রনাট্য একেবারে 'প্রিয়বাবুর বাড়ী' থেকে কমলার বিবাহের কথাবার্ত্তা নিয়ে সুরু করলেই হবে। এবং ৩, ৯, ১০, ১৪, ২৪, ২৯, ৩০, ৪০ প্রভৃতি, দৃশ্যগুলি অনায়াসে বাদ দেওয়া চলবে। শরৎ সাহিত্যে 'Conversation' 'dialogue' আলাপ ও বাক্‌চাতুর্য্য অতি অপূর্ব্ব এবং উপভোগ্য, সুতরাং চিত্রনাট্যে দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্য রচয়িতাকে 'কথা' তৈরী করবার জন্য মাথা ঘামাতে হবে না, বই থেকেই সব পাওয়া যাবে। মুখর চিত্রনাট্যের আর একটা মস্ত সুবিধা 'Titles' বা চিত্র পরিচয়ের বড় একটা প্রয়োজন হয় না। কথা শুনে গল্প বোঝা যায়। কেবলমাত্র যেখানে 'সময়' বোঝাবার দরকার অর্থাৎ একটা ঘটনার পর দীর্ঘকাল কেটে গেছে, ছবিতে যখন তার পরের ব্যাপার দেখানো হবে—তখন ছবির Continuity বা পারম্পর্য্য রক্ষার জন্য 'Caption' বা ছেদ-পুরা' ব্যবহার করা আবশ্যক। অতএব, মুখর ছবির 'চিত্র-নাট্য' ষ্টেজের নাটক না হ'য়ে যাতে ছবিরই 'নক্সা' হয় সেদিকে সবিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার।

মুখর চলচ্চিত্রের গল্প-গঠন ও চিত্র-নাট্য রচনা

কোনো প্রসিদ্ধ গল্প বা উপন্যাসকে চিত্র-নাট্যে রূপান্তরিত করা যে কত কঠিন তা' পূর্ব্বেই বলেছি। রঙ্গালয়ে অভিনীত জনপ্রিয় নাটককে 'চিত্র-নাট্য' ক'রে তোলা আরও শক্ত। কারণ, 'ষ্টেজের' প্রভাব বড্ড বেশী রকম এসে পড়ে সে নাটকের মধ্যে। এই সব নাটক উপন্যাস বা গল্পকে চিত্রনাট্যে রূপান্তরিত ক'রতে হ'লে আগে চার পাঁচবার সেইটি পড়ে নিয়ে তারপর স্মৃতি থেকে 'চিত্র-নাট্য' লেখবার চেষ্টা করা উচিত। তাহ'লে লেখকের কল্পনা-শক্তি অনেকখানি বাধা-মুক্ত হয়ে কাজ ক'রতে পারবে। রঙ্গমঞ্চের রঙীন আবহাওয়া এবং উপকথার অলীক মোহের আবেষ্টন থেকে আত্মরক্ষা করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে কেবলমাত্র আখ্যান-বস্তুটুকু বেছে নিয়ে তাকে ঠিক নবরচিত গল্প বা কাহিনী মনে ক'রে তার চিত্র-নাট্য সুরু করা; কারণ প্রত্যেক চিত্র-নাট্যেরই প্রধান উপকরণ হচ্ছে ওই গল্প বা আখ্যান-বস্তু। ইংরাজীতে যাকে বলে Plot! লেখকের মনে সর্ব্বাগ্রে উদয় হওয়া চাই এই 'প্লট'—তারপর চরিত্র, তারপর ঘটনা ও তদনুকুল কথা।

চিত্র-নাট্য রচয়িতাদের মনে রাখা উচিত যে তাঁদের কাজ গল্পকে ছবিতে রূপান্তরিত করা, নাটক রচনা করা নয়। ছবির ভিতর দিয়ে গল্পটিকে পরিস্ফুট ক'রে তুলতে পারলেই তাঁরা সাফল্য লাভ করবেন। কিন্তু ছবির একটা অসুবিধা হ'চ্ছে, সে পাত্র পাত্রীদের মনোভাব— তাদের উদ্দেশ্য, আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা বা কল্পনাকে রূপায়িত ক'রে তুলতে পারে না। অথচ গল্পের প্রাণই হ'চ্ছে এই মনো জগতের লীলা বৈচিত্র্য!

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে—যা ছবিতে এঁকে বোঝানো যায় না, তাকে ছবিতে পরিস্ফুট ক'রে তোলা যাবে কেমন ক'রে? এই সমস্যার সমাধান করতে পারবেন যিনি, চিত্র-নাট্য-রচনায় সিদ্ধিলাভ করা তাঁর পক্ষে সহজ হ'য়ে যাবে। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে যে কারণ ব্যতীত কোনো কার্য্য হয় না। মানুষ যা কিছু করে তার পিছনে একটা চিন্তা বা যুক্তি থাকেই। ক্যামেরার চোখে তার সে চিন্তা বা যুক্তির ছবি ধরা পড়ে না বটে, কিন্তু তার কাজটা দেখা যায়। তখন তার সেই কাজ দেখে আমরা তার মনের খবর পেতে পারি। অতএব চিত্র-নাট্যে পাত্র পাত্রীদের মনোভাবের পরিচয় দিতে হ'লে রচয়িতাকে নানা ঘটনার (situations) সমাবেশ করতে হবে—যার মধ্যে তাদের কার্য্য-কলাপ ও অভিনয়-ভঙ্গী (Actions) তাদের মনোজগতের চিত্রখানিকেও আমাদের চোখের সামনে মেলে ধরবে! সুতরাং, মনে রাখতে হবে যে গল্পকে ছবি করে তুলতে হ'লে চিত্র নাট্যের প্রধান অবলম্বন হ'চ্ছে ঘটনার পর ঘটনার ভিতর দিয়ে পাত্র পাত্রীদের নানা কার্য্যকলাপ দেখিয়ে যাওয়া।

অনেকে হয়ত মনে ক'রতে পারেন যে আজকের এই মুখর চিত্রের যুগে আমরা যখন
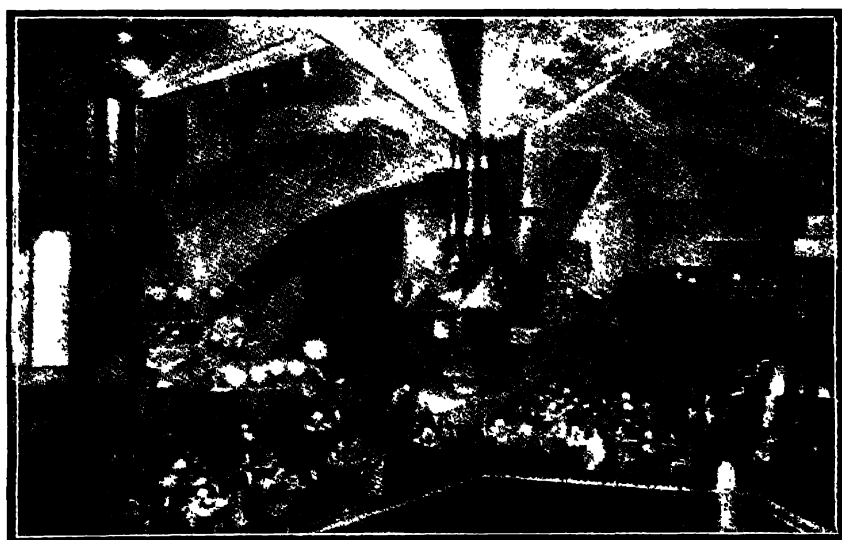
নন্দালোক সন্ধান
(Soft focus)
১৫৯

মধ্যম দূরব্যাপক চিত্র—Medium long shot, দেবী আইসিসের উপাসনা।) ১৬০

ছবির মুখে ভাষা দিতে পেরেছি, তখন ছবিতে পাত্র পাত্রীর কার্য্য-কলাপ দেখাবার জন্য ঘটনার বাহুল্য না রেখে, 'কথা' দিয়েই ত' কাজ সারতে পারি! অবশ্য, তা যে তাঁরা পারেন না এমন কথা কেউ ব'লবে না; কিন্তু এটা ঠিক, যে তাহ'লে সে ছবি কোনো দিনই 'চলচ্চিত্র' হিসাবে শ্রেষ্ঠ ব'লে গণ্য হবে না। কারণ, ছবিকে শুধু কথা কওয়ালেই চলবে না—ছবিকে ঠিক্ ছবি ক'রেও তোলা চাই।

এই দু'টি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য না রাখার ফলেই—কি বাংলার—কি বোম্বাইয়ের কোনো দেশী ছবিই এদেশে অনেক দিন পর্য্যন্ত দেখবার যোগ্য হ'য়ে উঠতে পারেনি। কেবলমাত্র কয়েকজন নরনারী ছবিতে উঠে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে এবং পর্দ্দার উপর গল্পের বিষয়টি পাতার পর পাতা অক্ষরে লিখে দেখানো হ'চ্ছে—এই ছিল এতদিন এদেশে পার্শি কোম্পানীর তোলা বাংলা ছবি! একটা বিস্ময় ও কৌতূহল নিয়ে এ দেশের চিত্রানভিজ্ঞ হাজার হাজার দর্শক ভীড় করে গিয়ে সপ্তাহের পর সপ্তাহ সে ছবিও দেখেছে; কিন্তু আজ আর সে ছবি দেখে তারা ভুলবে না, হোলিউডের কৃপায় তারা একাধিক ভালো ছবির স্বাদ পেয়েছে—তার সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের মর্ম্ম গ্রহণ করতে শিখেছে; এখন দেশী ছবি অযোগ্য হ'লে সপ্তাহকালের অধিক আর দর্শক আকর্ষণ করতে পারে না। এটা অতি সুলক্ষণ নিশ্চয়।

এই যে সুদূর আমেরিকার চলচ্চিত্রশালায় গড়ে তোলা অসংখ্য ছবি আজ শুধু বাংলার নগরে নগরেই নয়—পৃথিবীর সকল দেশেই এতটা সমাদর পাচ্ছে, এর কারণ কি? একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে যে প্রত্যেক ছবিতেই তারা এমন একটি বিশ্ব-মানবের চিত্তাকর্ষক সার্ব্বজনীন গল্প বেছে নিয়ে রূপায়িত ক'রেছে যা সহজেই বিশ্বের নরনারীর অন্তর স্পর্শ করে। ব্যবসায়ের দিক দিয়ে সাফল্যলাভ করার পক্ষে এর প্রয়োজনীয়তা এত বেশী যে প্রত্যেক চিত্র-নাট্য- রচয়িতার প্রথম কর্ত্তব্য হ'চ্ছে এমন একটি গল্প তার চিত্র-নাট্যের জন্য বেছে নেওয়া যার মধ্যে একটা universal appeal—বা বিশ্বজনীন আবেদন আছে।

এমন কতকগুলি চিত্ত বৃত্তি আছে যা সকল দেশের সকল জাতির মানব প্রকৃতির মধ্যে স্বভাবতঃই স্ফুর্ত্তিলাভ করে। জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে তার প্রভাব ধনী নির্ধন সভ্য অসভ্য সকল মানুষের উপরই সমভাবে বিস্তৃত দেখা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে যৌন-ধর্ম্মের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই যৌনধর্ম্মের প্রভাবে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যে একটা সহজাত আকর্ষণ অনুভূত হয়, তাই থেকেই তাদের মধ্যে—হয় জঘন্য লালসা—নয়ত প্রগাঢ় প্রেমের উৎপত্তি হ'তে দেখা যায়; এবং তারই ফলে তাদের পরস্পরের প্রাণে একটা মিলনাকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে। এই মিলানাকাঙ্ক্ষা তাদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে। তারা সংসার পাতে, সন্তান-সন্ততি লাভ করে; জীবনে সুখী হয়। কিন্তু, যেখানে এই মিলনে বাধা আছে—তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাব আছে—হিংসা বিদ্বেষ আছে—সেখানে বেদনার সৃষ্টি, জীবন দুর্ব্বহ ও দুঃখময়। বাধা দূর করবার জন্য মানুষ অসাধ্য সাধনে অগ্রসর হয়, জীবন তুচ্ছ ক'রে বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে, প্রেমের জন্য সে ক'রতে পারে না এমন কাজ নেই! আবার প্রেম যখন অন্তর্হিত হয়, তখন সাজানো সংসার শ্মশান হ'য়ে যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে মানুষের জীবনকে তোলপাড় করে দিতে পারে এই প্রেম! সাধুকে শয়তান করে, দস্যুকে দেবতা,

কাপুরুষকে বীর—ভীরুকে দুঃসাহসী, অলসকে উদ্যমশীল ক'রে তোলে। অতএব মানব-জীবনে প্রেমের প্রবল প্রাধান্য আমরা স্বীকার করে নিতে বাধ্য। সুতরাং, যে গল্পের ভিত্তি মানবের চিরন্তন যৌন-আকর্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তারই ছন্দানুসরণে পুষ্ট ও পরিণত হ'য়ে ওঠে, তার মধ্যে একটা বিশ্বজনীন আবেদন নিহিত থাকেই। এমনিতর আরও কতকগুলি সাধারণ মানব-মনোবৃত্তির সন্ধান রাখা চাই যার সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম অস্বীকার করা যায় না—যেমন জনন-ধর্ম্ম। এর মধ্যে আছে মাতৃত্বের ক্ষুধা, পিতৃত্বের পিপাসা, মাতৃস্নেহ, পিতৃস্নেহ, সন্তানবাৎসল্য, সোদরপ্রীতি, মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি, পুত্র শোক, কুপুত্রের কৃতঘ্নতা, কন্যাদায়, পুত্র-কন্যার অবাধ্যতা, বিদ্রোহাচরণ, উচ্ছৃঙ্খলতা, অধঃপতন ইত্যাদি। এ ছাড়া আরও কতকগুলো ব্যাপার আছে যা সকল মানব-সমাজেই বিদ্যমান ব'লে মানুষকে সে কাহিনী আকৃষ্ট করে, যেমন—বন্ধুত্ব, দাক্ষিণ্য, অর্হত্ব, আদর্শবাদ, শক্তি বা বীর্য্য, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, উৎসাহ, উদ্যম, কর্ত্তব্য-পরায়ণতা, মহৎ আকাঙ্ক্ষা, কৃতজ্ঞতা ইত্যাদি সংগুণ, এবং ঘৃণা, বিদ্বেষ, হিংসা শত্রুতা, পরশ্রীকাতরতা, লালসা, লোভ, দারিদ্র্য, পীড়া, নেশা, মোহ, উন্মত্ততা, অহঙ্কার, নৃশংসতা, চুরি, কপটতা, বিশ্বাসঘাতকতা, অধর্ম্ম, অন্যায়, ব্যভিচার ইত্যাদি মানবের সনাতন পাপ ও দৌর্ব্বল্য।

এর মধ্যে যে কোনও একটা ব্যাপারকে গল্পের ভিত্তি (Theme) ক'রে আখ্যানবস্তু (Plot) গড়ে তুলতে পারলে সে ছবি সকল দেশে সমাদৃত হবে। গল্পের এই গঠন প্রণালীর (Treatment) উপরই কিন্তু ছবির ভালো মন্দ সম্পূর্ণ নির্ভর করে। গল্পের গঠন-প্রণালী যেখানে যত বেশী স্বাভাবিকতার অনুসরণে বাস্তব ভঙ্গীর অনুগামী হয়, সেখানেই তা' তত নির্দ্দোষ ও পরিপাটি হ'য়ে ওঠে। দ্বন্দ্ব ও জটিলতা গল্পকে অধিকতর চিত্তাকর্ষক ক'রে তোলে। বাধা ও বিপদ উত্তীর্ণ হ'য়ে, বন্ধন ও মুক্তির ভিতর দিয়ে চিত্রের নায়ক নায়িকা যখন অগ্রসর হয়, দর্শকের মন রুদ্ধ নিঃশ্বাসে তাদের অনুবর্ত্তী হ'য়ে চলে। পর্দ্দার উপর প্রতিফলিত সেই দুটি প্রাণীর সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা আনন্দ ও বেদনা তখন দর্শকদের আপন অনুভূতির সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে ওঠে। সে ছবি তারা তন্ময় হ'য়ে দেখে এবং তৃপ্ত হ য়ে বাড়ী ফেরে। সুতরাং চিত্র-নাট্য-রচয়িতাকে এ কথা মনে রেখে দক্ষতার সঙ্গে লেখনী পরিচালনা ক'রতে হবে। কথা যত কম ব্যবহার করা যায় ততই ভালো। ঘটনার বাহুল্য ও কার্য্যকলাপের প্রাচুর্য্য ছবির পক্ষে দোষ না হ'য়ে বরং গুণই হ'য়ে ওঠে। কিন্তু বেশী আলাপ ও বাক্‌চাতুর্য্য (Conversations & Dialogue) উপন্যাসের পক্ষে হয়ত খুব ভালো : কিন্তু, ছবির পক্ষে তা যথাসাধ্য বর্জ্জন করাই বাঞ্ছনীয়।

গল্পের ঘটনাগুলির স্থানকাল সম্বন্ধে সর্ব্বদা সতর্ক থাকা আবশ্যক। দেড়'শো বছর আগের কলিকাতা সহরের কোনো ঘটনা যদি দেখানো দরকার হয়, তাহ'লে মনে রাখতে হবে তখন এ শহরে ইলেক্‌ট্রিক আলো ত' দূরের কথা গ্যাসের আলোও ছিল না। মটোর-কার্ তো দূরের কথা ঘোড়ার ট্রামও ছিল না। হাবড়ার পুল তখনও হয়নি, হাবড়া ষ্টেশনেরও অস্তিত্ব ছিল না। গঙ্গায় ষ্টীমল্যাঞ্চ্ দেখা দেয়নি। উইল্‌সন্ হোটেল, মনুমেণ্ট্, জেনারেল পোষ্ট অফিস, হাইকোর্ট, মিউজিয়ম্, পরেশনাথের মন্দির এ সব ছিল না। তখনকার দিনের

পোষাক পরিচ্ছদ আজকের দিনের সাজসজ্জার সঙ্গে মেলে না। এ ছাড়া, গল্পের মধ্যে যে সকল ঘটনা ঘটুছে তারও একটা সময়ের পারম্পর্য্য নির্দ্দিষ্ট থাকা উচিত। একই লোককে একই সময়ে যাতে দিল্লী ও বোম্বাই শহরে দেখতে না পাওয়া যায় সে বিষয়ে সবিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। দিল্লী থেকে বোম্বাই যেতে হ'লে যে সময়টুকুর ব্যবধান থাকা দরকার সেটুকু দিতে যেন ভুল না হয়। এমন কি উপর থেকে নীচেয় আসবার বা এ ঘর থেকে ও-ঘরে যাবার জন্য যে সময়টুকু লাগে তারও হিসাব মনে রাখা চাই। 'মিশ্রণ' এবং 'বিকাশ' ও 'বিলয়ের' সাহায্যে চিত্রে এই সময় নির্দ্দেশ করা যায়। তা'ছাড়া এইমাত্র একটা কাজে যাকে বাড়ীর বাইরে যেতে দেখা গেলো, পরক্ষণেই তাকে আবার যেন ড্রয়িংরুমে দেখতে না পাওয়া যায়। এ বিষয়েও সতর্ক থাকতে হবে।

চিত্র নাট্যে নায়ক নায়িকা ছাড়া আর যে কটি চরিত্র থাকবে তারা যেন কেউ অবান্তর না হয়। গল্পটিকে গ'ড়ে তোলবার জন্য যে ক'জন লোক একেবারে না হ'লে নয়, তার চেয়ে আর একটিও অনাবশ্যক চরিত্র বাড়ানো উচিত নয়। পূর্ব্বেই বলেছি গল্পের একটি চুম্বক (Synopsis) এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি চরিত্রলিপি (cast) বা পাত্র পাত্রীর পরিচয় (List of characters) লিখে তারপর গল্পটিকে গড়ে তুলতে হবে তার প্রত্যেক দৃশ্যের খুঁটিনাটি বর্ণনা (Details) দিয়ে। এই বর্ণনা থেকে পরে চিত্র-নাট্য প্রস্তুত করতে হবে। কিন্তু তার আগে গল্পের প্রত্যেক দৃশ্যের প্রত্যেক ছবির (Shots) এক একটি ধারা (Sequences) বা ক্রম-বিভাগ ক'রে ফেলা দরকার। ক্রম-বিভাগ করবার নিয়ম হ'চ্ছে, একই স্থানে একই সময়ের মধ্যে ঠিক পরপর যে-সব ঘটনা ঘটে সেগুলিকে গল্পাংশের এক একটি ধারা হিসাবে একত্র করা ; অর্থাৎ তার মধ্যে আর স্থানকালের পরিবর্ত্তন বা ব্যবধান থাকবে না। স্থানকালের পরিবর্ত্তন ঘটলেই তখন আবার সে দৃশ্যগুলিকে দ্বিতীয় ধারার ছবি ব'লে ধরতে হবে। "বর্ষকালপরে" কিম্বা "তারপর দেখতে দেখতে পাঁচটি বৎসর কেটে গেছে !" এই ধরণের পরিচয়-লিপি ব্যবহার হ'লেই, তারপর থেকে দ্বিতীয় ধারার ছবি (shots) একত্র করা হয়। যে ছবিতে সুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত কোথাও স্থানকালের পরিবর্ত্তন ঘটেনা, সেখানে ছবির ধারা বিভাগ ক'রতে হয় গল্পের চিত্তাকর্ষক অংশ নির্দ্দেশ করে। অর্থাৎ গল্পের যে যে অংশ চিত্রকলা হিসাবে সল্প পরাকাষ্ঠায় (minor climax) পৌঁছেচে সেই সেই স্থান চিহ্নিত করে। ছবিতে গল্পের রস যেখানে পূর্ণমাত্রায় জমে ওঠে, তাকে বলে— Climax ! অর্থাৎ চিত্রকলার চরম পরাকাষ্ঠা !

যদিও 'চিত্র নাট্য' অবলম্বনে পরিচালক নিজের ব্যবহারের জন্য একখানি 'ছবির নক্সা' (Shooting Script or Scenario plan) তৈরি ক'রে নেন, তবু, চিত্র-নাট্য রচয়িতাকে এমন ভাবে গল্পটি সাজিয়ে লিখতে হবে যেন পরিচালক একটি নিরেট্ মূর্খ, এ বিষয়ে তিনি একেবারে কিছুই জানেন না ! ছবিখানির কোথায় কি ক'রতে হবে, কখন কোন্‌খানে ক্যামেরা বা ছায়াধরযন্ত্র কি ভাবে কাজ করবে, কোন্ দৃশ্যে কি আলোক থাকা চাই, কি সঙ্গৎ (Music) কোনখানে বাজাতে হবে, দৃশ্যপট (Set) কোথায় কেমনতর হবে, অভিনয় (Action) কোন্‌খানে কি ভাবে হওয়া উচিত, পাত্র-পাত্রীরা কোথায় কি

বেশে (costume) দেখা দেবে, কোন্ কোন্ দৃশ্যের পটভূমিকায় (back-ground)—পুরোভূমিকায় (Fore-ground) মধ্যাংশে (centre), কি কি সরঞ্জাম (Properties) থাকবে তা' নির্দ্দেশ করে দেবে। ছবিতে প্রত্যেক চরিত্রটির কার্য্যকলাপ (Business) চিত্রনাট্যে উল্লেখ করা চাই। কোন্ দৃশ্যে কি রকম পট (Shots) কতক্ষণ এবং কতখানি নেওয়া হবে, কি ভাবে সে ছবি নেওয়া সুরু হবে—এবং কি ভাবে শেষ হবে, পরের দৃশ্যে কেমন ক'রে গিয়ে পৌছুতে হবে, এ সমস্তই চিত্র-নাট্যকারকে লিখে দিতে হবে। অর্থাৎ চিত্রনাট্যখানি হওয়া চাই একেবারে ছবির কোষ্ঠি-পত্র!

সুতরাং সুপরিচালককে যেমন চলচ্চিত্র সম্বন্ধে সব কিছু ব্যাপারেই অভিজ্ঞ হ'তে হয়, চিত্রনাট্য-রচয়িতারও সেইরূপ চলচ্চিত্রের সকল বিভাগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়া দরকার, বিশেষতঃ ছায়াধরযন্ত্রের ব্যবহার তাঁর ভালরকমই জানা থাকা চাই। প্রথমতঃ কোন্ দৃশ্যে কতদুর থেকে ছবি নিলে দর্শকদের চোখে দেখতে বেশ ভালো হয় এবং তার নাটকীয় রস নিবিড় হ'য়ে ওঠে, ও গূঢ় অর্থ পরিস্ফুট ক'রে তোলা যায় সেটি জানা ও শিক্ষা করা দরকার। আজ পর্য্যন্ত দৃশ্যপট বা অভিনয় ক্ষেত্র থেকে ছায়াধর যন্ত্রের দূর'ত্বর সাতটি বিভিন্ন অবস্থান আবিষ্কৃত হয়েছে, যথা—

১। Long-Shot—দূর ব্যাপক চিত্র, অর্থাৎ অভিনেয় দৃশ্যটির যতটা সম্পূর্ণ ছবি নেওয়া যেতে পারে সেই উদ্দেশ্যে ছায়াধর যন্ত্রটি যথাসম্ভব দূরে রেখে ছবি তোলা।

২। Medium Long-Shot—মধ্যম দুর ব্যাপক চিত্র, অর্থাৎ ছায়াধর যন্ত্রটিকে আরও একটু কাছে এনে অভিনেয় দৃশ্যটির কতক অংশের বা জনকতক অভিনেতৃর সম্পূর্ণ ছবি তোলা।

৩। Medium Mid-Shot—মধ্যম-অর্দ্ধাংশ ব্যাপক চিত্র, অর্থাৎ ছায়াধর যন্ত্রটিকে দ্বিতীয় অবস্থানের চেয়ে আরও একটু কাছে সরিয়ে এনে কেবলমাত্র একজন কোনো অভিনেতার বা দৃশ্যপটের অথবা একটা কোনো বিশেষ সরঞ্জামের তিন চতুর্থাংশ ছবি।

৪। Mid-Shot—অর্দ্ধাংশ ব্যাপক চিত্র, অর্থাৎ ছায়াধরযন্ত্রটিকে তৃতীয় অবস্থানের চেয়ে আরও কাছে সরিয়ে এনে কোনো দৃশ্যের বা অভিনেতার অপেক্ষাকৃত বড়ো বা অর্দ্ধাংশ ছবি তোলা।

৫। Medium Close-up—মধ্যম সন্নিধ-চিত্র, অর্থাৎ, অভিনেতৃদের মাথা থেকে স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত ছবি নেওয়া, কাজেই ছায়াধর যন্ত্রকে আরও কাছে সরিয়ে আনতে হয়।

৬। Close-up—সন্নিধ চিত্র, অর্থাৎ ছায়াধর যন্ত্রকে খুব কাছে এগিয়ে এনে কেবলমাত্র মুখখানির ছবি তোলা। বা বড় করে কোনো জিনিষ দেখানো।

৭। Big Close-up—বৃহত্তর সন্নিধ চিত্র, অর্থাৎ কেবলমাত্র চোখদুটি, বা একটিমাত্র চোখ, অথবা শুধু অধরপুট বা করপদ্ম বা চরণকমলের পর্দ্দা জোড়া প্রকাণ্ড ছবি!

দূরব্যাপকচিত্র (Long shot) (ধীবর ও দৈত্য)   ১৬২
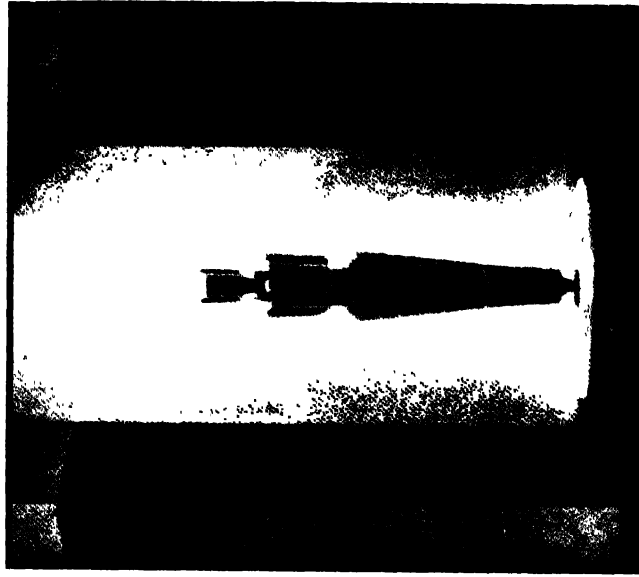
অতি আধুনিক দৃশ্যপট

(Modern design)   ১৬১

আয়না চিত্র (Reflection) (আয়নায় প্রতিবিম্ব) ১৬৩

শিসপট (Glass shot)

(নকল জলের ছায়া) ১৬৪
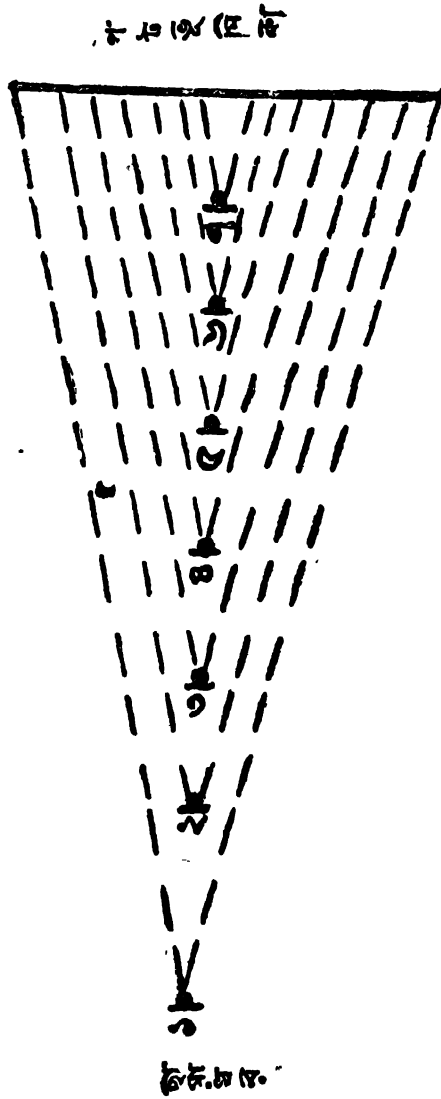
কেবলমাত্র মুখখানি বা চোখ দুটির ছবি ব'লছি বলে এমন যেন কেউ না মনে করেন যে নট-নটী ভিন্ন অন্য কোনো কিছুর ছবি এ-ভাবে নেওয়া চলবে না। বোঝবার সুবিধা হবে বলেই আমি মানুষের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছি, মানুষ, জীবজন্তু, তৈজসপত্র, আস্বাব, সরঞ্জাম সব কিছুরই প্রয়োজন মত সন্নিধ চিত্র (Close-up) ও বৃহত্তর সন্নিধ চিত্র—(Big Close-up) নেওয়া যেতে পারে—যেমন একগ্লাস জলে বিষ মিশিয়ে দেওয়া হ'চ্ছে দেখাবার জন্য জলপূর্ণ গেলাসের কেবলমাত্র কানার সীমানায় জলের সঙ্গে বিষের ধীর-সংমিশ্রণ দেখানো যেতে পারে। কোনো সংবাদপত্রের একটি বিশেষ সংবাদের প্রতি বা কোনো চিঠির একটি বিশেষ শব্দের দিকে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার আবশ্যক হ'লে এই সন্নিধ চিত্র ও

'বৃহত্তর সন্নিধ চিত্র' কাজে লাগে! কাণের দুলের একটি মুক্তা—হাতের আংটির একটি অক্ষরকেও ছবিতে এইভাবে তোলা চলে।

ছায়াধর যন্ত্রের এই সব নির্দ্দেশ চিত্রনাট্যে কি ভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে সেটা চিত্রনাট্যের গল্পের ও ঘটনাবলীর উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। যেমন, ধরুন যদি এমন একটি গল্পের চিত্রনাট্য লিখতে সুরু করে থাকেন যার গোড়াতেই আছে' এক দরিদ্র গৃহের বধূ,—তাহ'লে দারিদ্র্যের একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করবার জন্য সে দৃশ্যপট বা রঙ্গস্থল (Set) হওয়া উচিত—ভাঁড়ার বা রান্নাঘর! কারণ, এইখানেই মানুষের প্রধান অভাব তাকে পীড়া দেয়! অতএব গল্পটি এইভাবে আরম্ভ করা যেতে পারে:—

Fade-in (বিকাশ) প্রথম দৃশ্য—দূর ব্যাপক চিত্র —(long-shot) রন্ধনশালা, দ্বার বন্ধ দেখা যাচ্ছে!—এইখানে গল্পের গঠন (Treatment) অনুযায়ী রন্ধনশালার বর্ণনা দিতে হবে—যেমন উনুন নিভে গেছে! কাঠ নেই, কয়লা নেই, হাঁড়িতে চাল বাড়ন্ত, তেল নুণও ফুরিয়েছে। তরিতরকারীর একান্ত অভাব! একটা বেরাল কেঁদে বেড়াচ্ছে। এ-পাত্র ও-পাত্র উট্‌কে খেতে যাচ্ছে, দেখে সবই শূন্য!—(এখানে একটা শূন্য ভাঁড়ের 'সন্নিধ চিত্র' (close-up) দেওয়া চলে!) এমন সময় দ্বার ঠেলে খুলে সে ঘরে বধূর প্রবেশ। তারপর, মধ্যম দূর ব্যাপক চিত্র –(Medium long-shot)—দ্বিতীয়দৃশ্য,—রন্ধনশালার অভ্যন্তরে বধূর আগমন। বধূর কার্য্যকলাপ (Action) বর্ণনা করবার জন্য এখানে (Business) বা 'অভিনয় নির্দ্দেশ' থাকা চাই! যথা:—বধূ ধীর মন্থরপদে রান্নাঘরে ঢুকে উনান ও ভাঁড়ারের অবস্থা দেখে হতাশ হ'য়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললে। এটা ওটা নেড়ে-চেড়ে দেখে ক্ষুণ্ণমনে ও অবসন্ন পদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। যাবার সময় একটা ছোট চুপ্‌ড়ি ঘরের মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিলে,—বধূর ছিন্নমলিন বেশ, হাতে দু'গাছি গালার রুলি এবং কপালে মস্ত সিঁদূরের টিপ না থাকলে—বিধবা ব'লেই মনে হ'ত!

প্রথম দৃশ্যের শেষ ও দ্বিতীয় দৃশ্যের সুরু কি ভাবে হবে কিছু লেখা নেই। কাজেই পরিচালক এখানে ছায়াধর-যন্ত্রীকে (Camera man) নির্দ্দেশ ক'রবেন—'Cut' অর্থাৎ 'ছেদ'। কোনো কোনো চিত্রনাট্য-রচয়িতা—যে যে দৃশ্যের যেখানে 'ছেদ' হবে তা উল্লেখ ক'রে দেন, উল্লেখ করাটাই ভালো, কারণ, পূর্ব্বেই বলেছি—পরিচালকের উপর নির্ভর করা চিত্রনাট্য-রচয়িতার পক্ষে নিষেধ!

তারপর ধরুন গল্পে আছে, বধূ রন্ধনশালা থেকে চুপড়ি হাতে বেরিয়ে খিড়কীর পুকুরে গেল কল্‌মীশাক তুলতে; চিত্রনাট্যে লিখতে হবে—Third scene—বাগানের পথ—Medium long-shot Trucking forward to—খিড়কীর পুকুর। তৃতীয় দৃশ্য—রন্ধনশালা থেকে বেরিয়ে বধূ চলেছে বাগানের পথ দিয়ে—খিড়কীর পুকুরের দিকে। (মধ্যম দূর) আমবাগান পার হয়ে পেয়ারাতলা ঘুরে বাঁশঝাড়ের পাশ দিয়ে সুপুরি গাছের সারির ভিতর দিয়ে বধূ চলেছে (Truck-shot—অনুধাবন চিত্র) খিড়কীর পুকুরে।

চতুর্থ দৃশ্য—খিড়কীর পুকুরঘাটে বধূ এসে পৌচেছে—সমস্ত পুকুরটার দিকে চেয়ে দেখ্‌ছে কলমীশাক আছে কিনা;—চিত্রনাট্যে লিখতে হবে Truck-shot leads বধূ to scene

(ঝ)

চিত্রারূঢ়পট (S মাঝের জাহাজখানির Soft focus-এ ছবি তুলে, তার উপর পূর্ণ ফোকাসে সামনের দু'খানি জাহাজের ছবি নেওয়া হয়েছে। ১৬৮

ছায়া-কায়া (Silhoutte Figure) ১৬৭
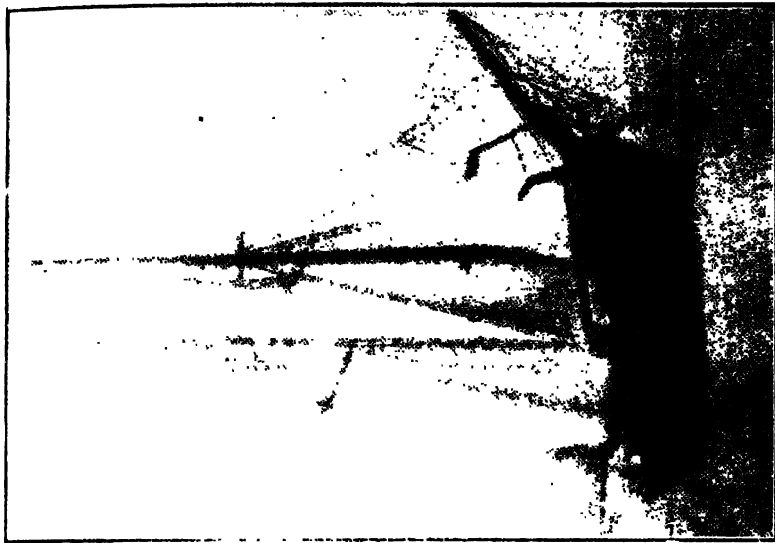
মন্দালোক সন্ধান (Soft focus. কৃত্রিম কুজ্ঝটিকার জন্য) ১৬৫

ছায়াপট (Silhouette) ১৬৬

আয়না-পটের স্থিতচিত্র (Still photo.) ১৬৭

IV—খিড়কীর পুকুর, বধূ ঘাটে দাঁড়িয়ে—(medium long-shot mix to Scene V
পঞ্চম দৃশ্য – খিড়কীর পুকুর, (long-shot) বধূ দেখছে আশে পাশে চেয়ে কলমীশাক আছে কিনা—(পরিবীক্ষণ চিত্র—Panoram right & left) পুকুরের এক কোণে চারটি কলমীশাক দেখা গেল—(medium close-up) বধূ সন্তর্পণে জলে নামছে সেই শাক তুলতে; শ্যাওলায় পিছলে তার পা হড়কে যাচ্ছে—(close-up) বধূ পুকুরে নেমে শাক তুলতে হেঁট হ'য়ে হাত বাড়ালো—(long-shot) পা' পিছলে জলে পড়ে গেলো—(long-shot) বধূ জলে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে—(Iris in—বৃতি বিকাশ) বাঁচবার জন্য বধূর প্রাণান্ত চেষ্টা (সন্নিধ চিত্র) বধূ ডুবে গেলো ! (বৃতিবিলয়—Iris out) ।

এই যে দৃশ্যগুলি পরের পর তোলা হ'লো—একে বিভাগ করবার সময় একই ঘটনার একই দৃশ্যের বিভিন্ন চিত্রগুলিকে এক একটি ধারায় (Sequence) ক্রম বিভক্ত করতে হবে। এর মধ্যে আরও দুটি বিভাগ আছে—আভ্যন্তরীণ দৃশ্য (Interior scene) যেমন রান্নাঘর এবং বহির্দৃশ্য (Exterior scene) যেমন বাগান ও খিড়কীর পুকুর। চিত্রনাট্যের প্রত্যেক দৃশ্যে ঘটনাস্থল সম্বন্ধে এ বিভাগেরও উল্লেখ থাকা চাই। ছায়াধর যন্ত্রের দূরত্বের পরিমাপ বা অবস্থা নির্দ্দেশপূর্ব্বক চিত্রনাট্য রচনা ক'রতে গেলে ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্য সম্পর্কে আরও যে সব মন্তব্য যে যে অবস্থায় লেখা প্রয়োজন হয় এখানে সেগুলির বিশেষ সংজ্ঞা (Technical Terms) একত্র করে দিলুম—

বাঁকা ছবি (Angle-shot)—অর্থাৎ যে ছবি সামনে দিক থেকে না তুলে একটু ট্যারচা ভাবে বাঁকা দিক থেকে বা কোণাকোণি তোলা হয়।

অস্থির চিত্র (Akeley shot)—অর্থাৎ যে ছবিতে দ্রুতগতিশীল বা বেগবান কোনো কিছুর —যেমন চলন্ত ট্রেন, মটোর গাড়ী বা যে ছুটচে তার ছায়া-ছবিকে দর্শকের দৃষ্টির বাইরে যেতে না দিয়ে ক্রমাগত শুধু সে ছবির পট-ভূমিকা দূরে সরে সরে যাচ্ছে দেখানো হয়। Akeley নামে একজন ছায়াধর শিল্পী এই ধরণের ছবি তোলার এই কৌশল প্রথম উদ্ভাবন করেছিলেন ব'লে তাঁর নামেই এর নামকরণ হ'য়েছে। এঁর নামের 'একলী ক্যামেরা'ও প্রসিদ্ধ।

ছেদ (Cut)—একই দৃশ্যের ভিন্ন ভিন্ন ছবি নেবার সময় প্রত্যেক ছবির পর যে ছেদ পড়ে তাকে বলে Cut ! ছবির রকম যেখানে বদলে যায় সেইখানে ছায়াপত্রী (Film) কেটে দ্বিতীয় ছবির সুরু হচ্ছে যে অংশে সেইখানে লাগিয়ে দেওয়া হয়। আবার রঙ্গস্থলে পরিচালকরাও অনেকেই ছবি তোলা বন্ধ রাখবার নির্দ্দেশ দেবার সময় এই 'cut' শব্দ ব্যবহার করেন। এবং ছবি তোলবার ইঙ্গিত করেন তাঁরা 'Camera' এই শব্দ উচ্চারণ করে।

সন্নিবেশ (Insert)—চিঠি, টেলিগ্রাম, সংবাদপত্রের খবর, বিজ্ঞাপন, উইল, দলিল, ইত্যাদি বিশেষ কোন সরঞ্জামের আলোক-চিত্র পৃথক তুলে নিয়ে পরে চলচ্চিত্রের মধ্যে যথাস্থানে সন্নিবেশ করা।

বৃতিবিকাশ (Iris-in)—অর্থাৎ একটি ক্ষুদ্র বৃত্ত ক্রমশঃ চক্রাকারে প্রসারিত ও বিবর্দ্ধিত হ'য়ে প্রদর্শনীয় চিত্রখানিকে পর্দ্দার উপর বিকশিত করে।

বৃতিবিলয় (Iris-out)—অর্থাৎ উক্ত চক্রাকারে প্রসারিত ও বিবর্দ্ধিত বৃত্ত ক্রমশ সংহত ও সঙ্কুচিত হ'য়ে এসে প্রদর্শনীয় চিত্রখানিকে দর্শকদের দৃষ্টিপথ থেকে অপসারিত করে।

বৃত্তাকার দৃশ্য (Iris-View)—চক্রাকারে বৃতি-বন্ধনীর মধ্যে প্রদর্শনীয় চিত্রের পূর্ণ-বিকাশ। ঠিক্ গোল ফ্রেমে আঁটা ছবির মত !

সংযুক্ত চিত্র (Composite shot)—অর্থাৎ একই ছায়া পত্রীর উপর কোনো ঘটনার একাধিক অংশের চিত্র তোলা, অথবা কোনো বিশেষ দৃশ্যের এক সঙ্গে তিনদিকের ছবি নেওয়া)

বিলয় (Dissolve)—একখানি ছবি পর্দ্দার বুকে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার ভিতর থেকে আর একখানি ছবি ফুটে ওঠা।

মিশ্রণ (Mix)—দু'খানি ছবির পরস্পরের মধ্যে মিশিয়ে এক হওয়া। এটি রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ঘটে, 'বিলয়' ছায়াধর-যন্ত্রেই হয়।

অন্তর্বিলয় (Lap-dissolve)—অর্থাৎ পরের ছবিখানির দৃশ্য পর্দ্দার উপর সম্পূর্ণ ফুটে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম ছবিখানি ক্রমশঃ ছোট হ'য়ে তার কোলে মিলিয়ে যাওয়া।

বিকাশ (Fade-in) - চিত্র শূন্য পর্দ্দার উপর ক্রমশ একখানি ছবি ফুটে ওঠা। এটা প্রায়ই ছবির ধারা (Sequence) পরিবর্ত্তনের মুখে অথবা সময় জ্ঞাপনের প্রয়োজনে ব্যবহার হয়। বিকাশের গতি তিন রকম—সহজ বিকাশ, দ্রুত-বিকাশ, মন্থরবিকাশ।

বিলোপ (Fade out)—ঠিক্ বিকাশের বিপরীত। অর্থাৎ ক্রমশঃ ছবিখানি পর্দ্দার উপর থেকে সরে গিয়ে পর্দ্দা চিত্রশূন্য হয়ে যায়। এরও তিন রকম গতি—সহজ, দ্রুত ও মন্থর।

আলোক-সন্ধান বা চিত্র-লক্ষ্য (Focus)—একটা কিছু দর্শনীয় পদার্থ লক্ষ্য ক'রে সমস্ত আলো তারই উপর একত্রে নিক্ষেপ করা এবং ছায়াধর যন্ত্রের আলো ছায়ার অনুকূল চিত্র সন্ধানকেও 'ফোকাস্' করা বলে।

চমক চিত্র (Flash shot)—দীর্ঘ চলচ্চিত্রের মধ্যে এক আধবার এক টুক্‌রো ছায়া-পত্রী কয়েকটা মাত্র ছবি নিয়ে হঠাৎ পর্দ্দার উপর চমক দিয়ে যায়, নায়ক নায়িকার মনে কোনো অতীত সুখ বা দুঃখের স্মৃতিটুকু অকস্মাৎ জাগাতে! আলোক সম্পাতের ব্যাপারেও এই 'ফ্ল্যশ্' ব্যবহার হয়; এখানে এর অর্থ হ'চ্চে অন্ধকারের মধ্যে কোন কিছুকে হঠাৎ আলো ফেলে দীপ্ত ক'রে তোলা!

আয়নাচিত্র (Reflection or Glass-shot)—অর্থাৎ যেখানে দৃশ্যপটের (Set) অর্দ্ধেকটা তৈরি ক'রে নিয়ে বাকীটা আয়নার সাহায্যে সম্পূর্ণ করে তুলে ছবি নেওয়া হয়। অথবা ছবির সঙ্গে অভিনেতৃদের মুকুরে প্রতিফলিত প্রতিবিম্বও তোলা হয়।

অনুকূল স্থান (Location)- চিত্রের বহির্দৃশ্য তোলবার উপযোগী যে অনুকূল স্থান নির্ব্বাচন করে নেওয়া হয় তাকে বলে—'লোকেশান্'।

অর্দ্ধাংশব্যাপক চিত্র (Mid shot.)   ১৭১

মধ্যম অর্দ্ধাংশব্যাপক চিত্র (Medium mid-shot)   ১৭২

আয়না চিত্র
(Glass shot.)
১৭০

পরিবীক্ষণ চিত্র
(Panoram)
১৭৪

গ্রস্তচিত্র (Mask-shot)—অর্থাৎ বিশেষ কোনো একটা আকারের ছিদ্রপথের মধ্য হ'তে ছবিখানি দেখতে পাওয়া। যেমন ধরুন দরজার চাবীকলের ফুটো দিয়ে, দূরবীক্ষণ যন্ত্রের যুগ্মনলের ভিতর দিয়ে, ঘরের নর্দ্দমার ফাঁক দিয়ে, জানালার ভাঙা সার্শীর ভিতর দিয়ে, দেওয়ালের ঘুলঘুলির ফুটো দিয়ে ইত্যাদি। ক্যামেরার মুখে প্রয়োজনীয় ছিদ্রের আকারে একটি মুখোস কেটে লাগিয়ে দিয়ে এই রকম ছবি তোলা হয় ব'লে এর নাম—'মাস্ক্ শট্'।

পরিবীক্ষণ-চিত্র (Panoram) - অর্থাৎ যখন কোনো স্থিতমূলের উপর কেবলমাত্র ছায়াধর যন্ত্রটিই উপর নীচেয় বা ডাইনে বাঁয়ে ঘুরে ঘুরে কোনো ছবি তোলে—যেমন ধরুন যদি একটি মেয়ের দুটি আলতাপরা পা থেকে ক্রমে ক্রমে তার মাথার খোঁপাটি পর্য্যন্ত ছবিতে দেখাবার দরকার হয় - তাহ'লে স্থিতমূলের (Fixed base) উপর মাত্র ছায়ধর যন্ত্রটি নড়বে ধীরে ধীরে নীচ থেকে উপরের দিকে। একে ব'লে 'ঊর্দ্ধ-পরিবীক্ষণ' (Panoram up !) এইরকম নিম্ন-পরিবীক্ষণ (Panoram down) এবং বামে ও দক্ষিণে পার্শ্ব পরিবীক্ষণ (Panoram Right or Panoram Left) চিত্র তোলা হয়। এর আবার ত্রিবিধ গতির পার্থক্য আছে—দ্রুত, মধ্যম ও মন্থর। ছায়াধর যন্ত্রীকে ডেকে চিত্র নাট্যের প্রয়োজনমত পরিচালক হাঁকেন—"Quick Panoram down !"—দ্রুত নিম্ন পরিবীক্ষণ ! ইত্যাদি।

দোলন চিত্র (Rocking shot)—আগে ছায়াধর যন্ত্রটিকে দুলিয়ে এই দোলনচিত্র নেওয়া হ'তো, আজকাল আর তা হয়না ; এখন ছায়াধর যন্ত্রকে স্থির রেখে সমস্ত দৃশ্যপটটি দুলিয়ে এই দোলনচিত্র তোলা হয়। সমুদ্রের ঢেউয়ে ঝড়ের দোলা লাগা জাহাজের কামরার ভিতরের ছবি ইত্যাদি নেবার সময় এই দোলোন-চিত্র নিতে হয়—এতে ঝড় তুফানের রূপটা চিত্রে সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে !

চিত্র-ধারা বা ক্রমপর্য্যায় (Sequence)—একই স্থানে একই সময়ে সংঘটিত একই দৃশ্যাভিনয়ের যে সকল ভিন্ন ভিন্ন চিত্র নেওয়া হয়—সেগুলিকে এক একটি পৃথক ধারা হিসাবে গণ্য করা হয়।

দৃশ্যাভিনয় (Scene)—চলচ্চিত্রে 'সীন' ব'লতে দৃশ্যপট বোঝায় না, 'দৃশ্যাভিনয়' বোঝায়। কিন্তু অনেকেই ভুল করে দৃশ্যপটকে (Set) 'সীন' বলে উল্লেখ করেন। চলচ্চিত্রে গল্পের যে যে অংশ ছায়াধর যন্ত্রের সম্মুখে অভিনীত হয় তাকেই বলে 'সীন্' অর্থাৎ দৃশ্যাভিনয়। এবং 'দৃশ্যপট'কে বলে 'সেট'।

চিত্রনাট্য (Scenario)—চলচ্চিত্রের গল্পটি ছায়াধর যন্ত্রের সম্মুখে যে ভাবে অভিনীত হবে তারই একটি সম্পূর্ণ বিবরণীকে বলে চিত্রনাট্য।

সংক্ষিপ্তসার (Synopsis)—গল্পের চুম্বককে বলে সিনপ্সিস্।

গল্পসংগঠন (Treatment)—গল্পের চুম্বক থেকে গল্পটির চিত্রনাট্য হিসাবে চিত্তাকর্ষক হবার যতদূর সম্ভাবনা আছে সেদিকে লক্ষ্য রেখে তার একটি রস-বিশ্লেষণমূলক আদ্‌রা গড়ে তোলা।

ব্যাখ্যানগ্রাহ (Shooting Script or Scenario-Plan)—চিত্রনাট্য থেকে পরিচালক তাঁর কাজের সুবিধার জন্য যে খসড়ায় দৃশ্যপট ও দৃশ্যাভিনয়ের শ্রেণীবিভাগ, ধারা নিরূপণ, বর্ণনা, সংখ্যা, ও সময় নির্দ্দেশ, পট-নির্ঘণ্ট, আলোক বিধি ও ছায়াধর যন্ত্র ব্যবহার সম্বন্ধে সব কিছু সঙ্কেত লিপিবদ্ধ করে নেন।

চিত্রগ্রাহ (Taking or Shooting) ক্যামেরায় চলচ্চিত্র গ্রহণ করাকে বলে।

চিত্রাংশ গ্রহণ (Shot) —দৃশ্যাভিনয়ের অংশ বিশেষের ভিন্ন ভিন্ন খণ্ড চিত্র গ্রহণ।

অনুধাবন চিত্র (Truck Shot)—চলমান বা গতিশীল কোনো ব্যাপারের অনুধাবন করতে করতে ছায়াধর-যন্ত্র যে সচল ছবি তোলে। এরও গতি তিন রকম—দ্রুত, মধ্যম, মন্থর! ধরণও একাধিক, যেমন সম্মুখ বা পশ্চাৎ অনুধাবন—Forward or backward Trucking.

চিত্রারূঢ় পট (Superimpose)—অর্থাৎ একখানি ছবির উপর আর একখানি ছবি নেওয়া। যেমন—চিত্রের উপরই চিত্র পরিচয় ছাপা (double exposure)

চিত্র পরিচয় (Titles)—ছবির পরিচয় ও ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যা দু'রকম (Grand Title) শ্রেষ্ঠ পরিচয় ও ক্ষুদ্র পরিচয় (Sub-Title) 'শ্রেষ্ঠ পরিচয়' হচ্ছে ছবির ভাবোদ্দীপক রসের সংজ্ঞা, 'ক্ষুদ্র পরিচয়' হ'চ্ছে—কথোপকথন, বিষয় বর্ণনা, সময়-নির্দ্দেশ এই তিন রকম।

প্রান্তবিলোপী চিত্র (Vignette Shot)—একই ছবির কতক অংশ অস্পষ্ট !—ছায়াধর-যন্ত্রের ব্যবহার-কৌশলে আলো-ছায়ার তারতম্য সৃষ্টি করে এই চিত্র পট নেওয়া হয়।

প্রান্তবিলয়ন (Vignetting)—দৃশ্যপট বা চিত্রাভিনেতাদের ছবির খানিকটা বাদ দিয়ে খানিকটা রাখা। যেমন ধরুন একটি মেয়ে ঝোপের মধ্যে একটা গাছে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছবিতে ঝোপ উড়িয়ে দিয়ে, গাছের মাথাটাও খানিকটা বাদ দিয়ে শুধু একটু গুঁড়ি রেখে দেখানো হ'ল গুঁড়িতে হেলান দিয়ে মেয়েটি দাঁড়িয়ে।

পেলব চিত্র রেখ (Soft Focus)—যে চিত্র ছায়াধর যন্ত্রের রকমারি ঠুলির (Focus disc or Gauze Cover) ভিতর দিয়ে তোলা হয়—একটা মৃদুল পেলব রহস্যময় ঝাপ্‌সা ধরণের ছবি নেবার জন্য।

মন্থর চিত্র (Slow Shot)—এ ছবি নেওয়া হয় ছায়াধর-যন্ত্রের হাতল প্রচণ্ড বেগে ঘুরিয়ে, অর্থাৎ যেখানে মিনিটে ২৪খানি ছবি নেবার কথা সেখানে হয়ত মিনিটে ১৪৪খানি ছবি নেওয়া হ'লো কিন্তু পর্দ্দায় ফেলে দেখাবার সময় প্রদর্শক-যন্ত্রে মিনিটে ২৪খানির বেশী ছবি না দেখালেই ছবির দৃশ্যাভিনয়ের গতি মন্থর হ'য়ে যাবে।

স্থির চিত্র (Still Photograph)—চলচ্চিত্রের কোনো দৃশ্যের সাধারণ আলোক-চিত্র।

প্রতীক (Symbol)—চিত্রনাট্যের নায়ক নায়িকার মনের অবস্থা বা তাদের আসন্ন ভবিষ্যৎ বা বিপদের সূচনার ইঙ্গিত দেবার জন্য প্রকৃতি বা পশু পক্ষীর দৃষ্টান্ত দিয়ে জীবনের প্রতিকূল বা অনুকূল অবস্থার আভাস দেওয়া।

মধ্যসন্নিকর্ষচিত্র (Medium close up) ১৭২
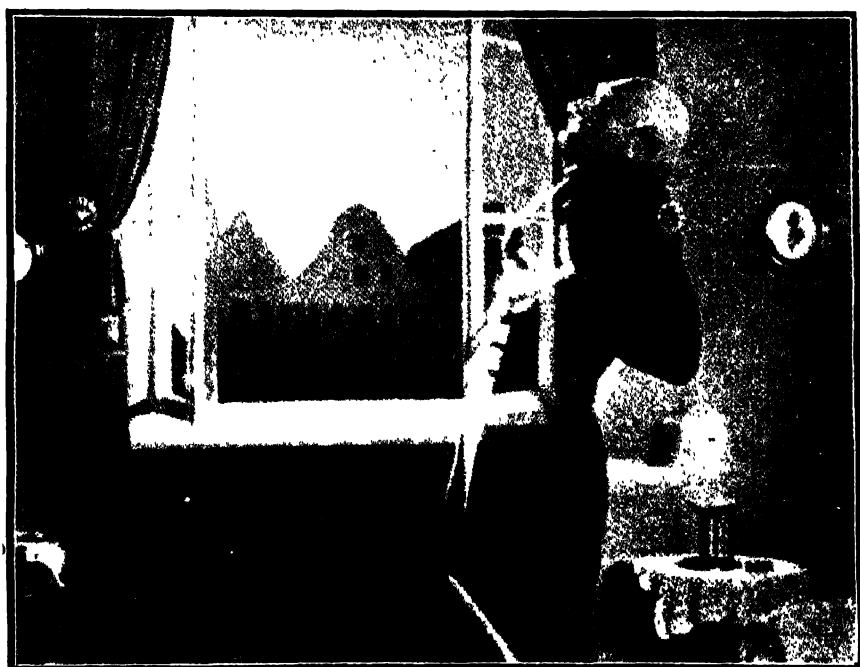
গ্রস্ত চিত্র (mask Shot) (জানালার ফাঁক দিয়ে বহির্দৃশ্য তোলা হয়েছে।) ১৭৩

অনুধাবন চিত্র (Truck Shot)

ছায়া-ছবি (Silhouette)—অর্থাৎ মৃদু আলোকোজ্জল দৃশ্যে নরনারী বা পশু-পক্ষীর কেবলমাত্র ছায়া-মূর্ত্তিটি দেখান।

চিত্রনাট্যের রচয়িতাকে এই সাঙ্কেতিক নির্দ্দেশগুলির প্রত্যেকটি কথা মনে রেখে ছবিতে কোথায় কোন্‌টি কি ভাবে প্রয়োগ করলে ছবিখানি অধিকতর সুন্দর ও মনোজ্ঞ হবে তা সবিশেষ বিবেচনা ক'রে তবে ব্যবহার করতে হয়। পূর্ব্বেই বলেছি ছবিতে 'চিত্র পরিচয়' যত কম ব্যবহার করা হয় ততই ভালো। যেখানে ব্যাপারটা ছবিতেই বোঝানো চলবে—সেখানে 'কথা দিয়ে' কখনই তা বোঝাবার চেষ্টা করা উচিত নয়। যেখানে 'কথা' ব্যবহার করতেই হবে সেখানে 'চিত্রপরিচয়' যত ছোট হয় ততই ভালো। ছোট হলেও কিন্তু, লক্ষ্য রাখতে হবে যে তার রচনাভঙ্গী সাহিত্য রসের ও ভাব-ব্যঞ্জনার দিক দিয়ে যেন একটুও নিকৃষ্ট না হয়! ধরুন, গল্পে আছে কোনো নায়ক মনের দুঃখে সংসার ত্যাগ করে কাশীবাস করতে গেলেন,—এখানে চিত্র-পরিচয়ে যদি শুধু দেওয়া হয়—তখন তিনি কাশী গেলেন—তারপর ছবিতে যদি কাশীর 'পরিবীক্ষণপট' দেওয়া হয় তাহ'লে জিনিসটা অতি তুচ্ছ হ'য়ে যায়! কিন্তু সেখানে চিত্র-পরিচয়ে যদি দেওয়া হয়—"তখন তিনি কাশী গেলেন—ভারতের প্রাচীনতম পুণ্যতীর্থ বারাণসী—কত দেবর্ষি, রাজর্ষি, সাধুসজ্জনের সাধনভূমি, পতিতপাবনী গঙ্গার পূততরঙ্গ-বিধৌত শ্রীভগবান বিশ্বনাথের অনন্ত শান্তি-নিকেতন বারাণসী—তাপিত প্রাণ যাঁর কোলে আশ্রয় পেয়ে জুড়িয়ে যায়—এবং এই পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে যদি কাশীর 'পরিবীক্ষণ পট' দেখানো হয় ছবিখানির মর্য্যাদা অনেক বেড়ে যাবে। কারণ, বারাণসীর উপরোক্ত মহিমা তখন দর্শকের মন আচ্ছন্ন করে তার দৃষ্টিকে ভক্তি রসাপ্লুত করে তুলবে। এমনি করে সবদিক ভেবে বিবেচনা ক'রে তবে চিত্র-পরিচয় লিখতে হয়। 'স্বল্প চিত্রপরিচয়' পড়ে যাতে ছবির ঘটনার দিকে দর্শকের আগ্রহ আরও বেড়ে ওঠে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা উচিত।

মুখর 'চিত্রনাট্যে' 'চিত্রপরিচয়' ব্যবহার করবার কোনো প্রয়োজনই থাকে না। কারণ এখানে ঘটনার সঙ্গে কথার সংযোগ আছে। মুখর চিত্রনাট্যে 'কথা' যেটুকু থাকবে তা' ওজন ক'রে দিতে হবে। চিত্রের ঘটনার যুগোপযোগী ভাষা ও শব্দ ব্যবহার করা চাই। বৌদ্ধযুগের বা কালিদাসের আমলের অথবা পৌরাণিক কোনো ঘটনা নিয়ে যদি চিত্রনাট্য রচনা ক'রতে হয়, তবে সতর্ক থাকতে হবে যাতে চিত্রনাট্যের মধ্যে কোনো আধুনিক যুগের ভাষা শব্দ বা কথা না এসে পড়ে। প্রাচীনকালের লোকের মুখে একালের মত কথা দিলে ছবির পারিপার্শ্বিকের মধ্যে তা অত্যন্ত বেসুরো ঠেকবে। এস্থলে ক্ল্যাসিক্যাল ভাষা ব্যবহার করাই সঙ্গত তবে সে ভাষা যেন অত্যন্ত আড়ষ্ট ও নেহাৎ কেতাবী না হয়ে যায়। যতটা সম্ভব সহজ ও স্বাভাবিক রাখতে হবে। সঙ্গীত রচনাও এইদিকে লক্ষ্য রেখে করা উচিত এবং প্রাচীন হিন্দুযুগের নরনারীর কণ্ঠে যাতে গজল ঠুংরী, টপ্পা, খেয়াল না শোনা যায় এমনভাবে সে গানে সুর সন্নিবেশও করা চাই।

চলচ্চিত্রে ইতর প্রাণীর অভিনয়

অধিকাংশ ছবিতেই আমরা কোনোও না কোনো রকম জীবজন্তুর সাক্ষাৎ পাই। এ পর্য্যন্ত চলচ্চিত্রে যত রকমের পশু পক্ষী ও সরীসৃপ দেখানো হ'য়েছে সেগুলিকে সব একত্রে জড়ো করলে একটা বৃহৎ পশুশালা হ'তে পারে। ছবিতে যে সব জীবজন্তুর সাহায্য নেওয়া হয়, তাদের প্রত্যেককেই চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য বিশেষ ভাবে শিক্ষিত ক'রে তোলা হয়। সার্কাসে অভিনয়ের জন্য পশুপক্ষীকে শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য ঐ-সব ইতর প্রাণীকে শিক্ষিত ক'রে তোলা অত্যন্ত কঠিন; তাই, প্রয়োগশালায় অভিনয়ের উপযোগী শিক্ষিত জীবজন্তুর পারিশ্রমিক প্রায় 'ষ্টার'-অভিনেতৃদেরই সঙ্গে সমান।

হাতী, ঘোড়া, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি জানোয়ারদের সার্কাসে অভিনয় করতে শিক্ষা দেওয়া যতটা কঠিন—তার চেয়ে ঢের বেশী কঠিন তাদের চলচ্চিত্রে অভিনয় ক'রতে শিক্ষা দেওয়া, তার কারণ—সার্কাসের ঘোড়া বা হাতীকে কয়েকটা নির্দ্দিষ্ট ভঙ্গী শিখিয়ে নিয়ে প্রত্যহ দু'বার ক'রে সেই একই খেলা দেখাতে বাধ্য করা হয়; কাজেই তারা সে খেলায় শীঘ্রই অভ্যস্ত হ'য়ে পড়ে। সুতরাং তাদের নিয়ে খুব বেশী মুস্কিলে পড়তে হয়না। কিন্তু, বিভিন্ন চলচ্চিত্রের জন্য বিশেষ বিশেষ জীবজন্তুকে ভিন্ন ভিন্ন রকমের অভিনয় শিক্ষা দিতে হয়; কাজেই, শিক্ষকদের প্রতিবারই নূতন ক'রে পরিশ্রম না করলে চলে না। এই জন্য, একেবারে বাছা-বাছা সব চেয়ে সেরা জানোয়ার না হ'লে চলচ্চিত্রের অভিনয়ে নেওয়া চলেনা।

পশু পক্ষীদের যাঁরা খেলা দেখাতে বা অভিনয় ক'রতে শিক্ষা দেন, তাঁদের সকলের পদ্ধতি সমান নয়। প্রত্যেকের নিজ নিজ বিশেষত্ব আছে। মারের চোটে শেখানো সেকালের পাঠশালাতেও ছিল, পশুশালাতেও ছিল; কিন্তু, আজকাল বেত বা চাবুকের রেওয়াজ উভয় শিক্ষালয়েই অপ্রচলিত হ'য়ে পড়েছে, কারণ দেখা গেছে—ভয় দেখিয়ে—মেরে—শেখানোর চেয়ে, মিষ্টি কথায়—আদর ক'রে—অথচ দৃঢ়তা ও ধৈর্য্যের সঙ্গে শিক্ষা দিলে ফল ঢের ভাল পাওয়া যায়। অবোধ জানোয়াররা সুকুমার শিশুর চেয়েও অবোধ; পাঁচবার দেখিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও তারা যদি শিক্ষকের ইচ্ছার অনুরূপ অভিনয় ক'রতে না পারে, তাহ'লে তাদের নির্দ্দয় প্রহার করাটা শুধু নিষ্ঠুরতা নয়- শিক্ষকের একান্ত নির্ব্বুদ্ধিতাও বটে! মার খেলে জানোয়ারদের মাথা খোলে না, বরং উল্টে তারা ভড়কে যায় এবং আজ যা শেখে কাল তা' ভুলতে বিলম্ব হয়না। তবে, যেখানে কোনো কোনো বিশেষ পশু দুষ্টামী ক'রে কিম্বা কুড়েমীর জন্যে শিক্ষকের নির্দ্দেশ না মেনে তাঁর অবাধ্য হয়, সেস্থলে শিক্ষকের একটু কড়া হওয়া দরকার। কুকুরের বেলা কিন্তু তা' হবার প্রয়োজন নেই। একটু ধমক্ দিলেই, পিঠে একটা আস্তে চাপড় দিলেই যথেষ্ট! ভালো কুকুর হ'লে—শিক্ষকের

কারুচিত্র—(Art film এই ছবির পটভূমিকা আগাগোড়াই শিল্পীর কল্পনা সঞ্জাত : স্বাভাবিক নয়।) ১৭৭

প্রতীক্ (Symbol) রুশদেশে বসন্ত কালে খুব বেশী শ্বেত ভল্লুক দেখা যায়, তাই, বসন্তের আবির্ভাব বোঝাবার জন্য এখানে শ্বেতভল্লুক প্রতীক্ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। ১৭৮

রীণ-টিন্-টিন্ ও তার প্রভু লী ডান্কান্ ১৭৯

পেগ্‌ ও লেডী—
দু'টি শিক্ষিত সুন্দর
অশ্ব ও অশ্বা।

সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী
'লুপেভ্যালে' ও তাঁর
শিক্ষিত বানর। ১৮১

চেয়ে সেইই নিজে বেশী লজ্জিত ও বিরক্ত হ'য়ে ওঠে—যদি শিক্ষকের নির্দেশ না বুঝতে পারে! সেস্থলে একটু ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় থাকলে এবং মাথা ঠাণ্ডা রেখে জানোয়ারের উপরই তার ভুল সংশোধনের ভার ছেড়ে দিলে সহজে সুফল পাওয়া যায়। একটু চাপড়ে আদর করে উৎসাহ দিলেই সে ঠিক শিখতে পারে, এবং শিক্ষক যদি তার কৃতকার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ তাকে কিছু বখশীস্ দেন—যেমন একখানা বিস্কুট কিংবা একটি চকোলেট্, তাহ'লে সে আর সে খেলা ভোলে না।

বাঘ-সিংহ সম্বন্ধেও ঠিক এই ব্যবস্থাই খাটে; কিন্তু যদি এরা কখনো শিক্ষকের শুধু অবাধ্য হওয়া নয়, তাঁকে দাঁত খিঁচিয়ে আক্রমণ ক'রতে তেড়ে আসে—তাহ'লে তাদের তৎক্ষণাৎ সাজা দেওয়া দরকার। এদের অবাধ্যতা রূঢ়ভাবে দমন ক'রতে না পারলে, শিক্ষকের প্রায়ই অমর্য্যাদা হবার সম্ভাবনা থাকে। তবে এ-কথা ঠিক যে এরা সবসময়ে দুষ্টামী ক'রেই অবাধ্য হয় যে তা' নয়, অনেক সময় শরীর ভালো না থাকলে এদের মেজাজ খারাপ থাকে, কাজেই কিছু ভাল লাগে না। অভিজ্ঞ শিক্ষকের পক্ষে তাদের অবস্থা বুঝতে বিলম্ব হয় না। তিনি তৎক্ষণাৎ শিক্ষা বন্ধ রেখে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। এই চিকিৎসার ব্যবস্থা করার ফলে অনেক সময়ে আশ্চর্য্যজনক সুফল পাওয়া যায়। বাঘ ও সিংহকে কোনো যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি হ'তে আরোগ্য ক'রতে পারলে তারা এত বেশী কৃতজ্ঞ হ'য়ে পড়ে যে, শিক্ষকের বিরুদ্ধে আর কখনো বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠে না।

চলচ্চিত্রানুরাগীরা নিশ্চয় 'রীণ্-টিন্-টিন্' কে বিস্মৃত হননি। এই কুকুরটির অদ্ভুত অভিনয় ভোলবার নয়। কিছুদিন হ'ল রীণ্-টিন্ মারা গেছে। রীণ্-টিনের শিক্ষক শ্রীযুক্ত লী ডান্‌কান বলেন—রীণ্-টিন্‌কে তিনি কুকুরের মতো শিক্ষা দেননি, ছোট ছেলের মতোই পড়িয়েছিলেন। খুব ছোটবেলা থেকেই তিনি তাকে তাঁর ভাষা বুঝতে শিখিয়েছিলেন। কোন্ কথার কি মানে, কী ব'ললে কী ক'রতে হবে—রীণ্-টিন্ ক্রমে মানুষের মতই বুঝতে শিখেছিল। রীণ্-টিন্‌কে কখনো চোখ রাঙিয়ে, ধমকে কিছু ব'লতে হ'ত না। চাবুক দেখিয়ে কিছু করাতে হ'ত না। সহজভাবে বন্ধুর মতো কথা ক'য়ে তাকে যা ক'রতে বলা হ'তো সে তাই ক'রতো। চলচ্চিত্রের দৃশ্যপটে ক্যামেরার চোখের আড়ালে দাঁড়িয়ে লী-ডানকান্ তাকে যেমনটি ক'রতে বলতেন রীণ্-টিন্ সুবোধ বালকের মত তৎক্ষণাৎ তাই ক'রতো। একবারের বেশী দু'বার কোনো ছবিতে রীণ্-টিন্‌কে নিয়ে মহলা দেবার প্রয়োজন হয়নি। ডানকান্ যেই ব'লতেন—"রীন্‌টী! তুমি যা ক'রেছো সে জন্য তুমি দুঃখিত ও অনুতপ্ত হও! এই সুন্দরীর পায়ে লুটিয়ে পড়ে তুমি ক্ষমা চাও। উনি তোমায় ক্ষমা করেছেন। তুমি খুশী হ'য়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াও! সুন্দরীকে চুমু দাও—" চলচ্চিত্রের অনেক অভিনেতার চেয়েও নিপুণভাবে রীণ্-টিন্ এই প্রত্যেকটি আদেশ পালন ক'রতো। অনেক সুদক্ষ পরিচালক মানুষকে দিয়ে যা করাতে পারতেন না—ডানকান্ সাহেব অবলীলাক্রমে রীন্-টিন্‌কে দিয়ে তার চেয়েও কঠিন অভিনয় করাতে পারতেন।

আর একটি কুকুরও চলচ্চিত্র দর্শকদের বহুবার বিস্মিত ক'রেছে—তার নাম 'ফ্ল্যাশ্'। মেট্রোগোল্ডউইন মায়ার্ কোম্পানীর একাধিক চিত্রে এর অভিনয় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ

করেছে। নেহাৎ বাচ্চা বয়সেই ফ্ল্যাশ ১২০ টাকায় বিক্রী হ'য়ে গেছলো; কিন্তু কিছুদিন পরেই যে ফ্ল্যাশকে কিনেছিল সে ফিরিয়ে দিয়ে গেলো—কুকুরটা কোনো কাজের নয়, নেহাৎ মোটা বুদ্ধি ব'লে! আজ সেই ফ্ল্যাশের বাজার দর উঠেছে তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা! ফ্ল্যাশ যদি আরও কিছুদিন বাঁচে, তাহ'লে শুধু চলচ্চিত্রে অভিনয় ক'রেই সে এর চতুর্গুণ টাকা উপার্জ্জন করতে পারবে। রীন্‌টিনের মতই ফ্ল্যাশ তার মনিবের সব কথা বোঝে, সব জিনিষের নাম জানে, সব বন্ধুদের নাম জানে; ডান ও বাম সম্বন্ধে তার এত বেশী জ্ঞান যে, তাকে যদি বলা হয় ডানপাটি জুতোটা নিয়ে এসো, বাঁ হাতের দস্তানাটা নিয়ে এসো—সে ঠিক চিনে তাই আনে—কখনো ভুল করেনা।

'প্যাল' ব'লে আর একটি খুব চতুর কুকুর চলচ্চিত্রে অভিনয় কর'তো। এখন সে অবসর গ্রহণ ক'রেছে, কারণ তার উপযুক্ত ছেলে 'পীট্' আজ্‌কাল চলচ্চিত্রে নেমে সকল দিক দিয়ে তার বাপের নাম বজায় রাখছে। 'প্যাল' ছিল হাস্যরসের অভিনেতা। সে ঠিক মানুষের মতোই হাসতে পারতো, কাঁদতে পারতো, ঠাট্টা তামাসায় মুখ ভ্যাঙ্‌চাতে পারতো; শিক্ষিত কুকুরের মত সব রকম খেলা ও অভিনয়েই সে সুপটু ছিল। তার ছেলে 'পীট' বাপের মতই হাস্যরসের অভিনয়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে উঠেছে। 'পীটে'র একচোখে চশমার মতো একটি গোল কালো দাগ কাটা আছে, তাই ওর নাম হয়েছে 'একচোখো পীট!' 'মেট্রো'র "আমাদের দলে"র (Our Gang) সঙ্গে পীটের খুব ঘনিষ্ঠতা।

'থাণ্ডার' আর 'ফণ্‌' নামে আর একজোড়া কুকুরকে চিত্র-প্রিয়রা অনেকেই ভালো ভালো ছবিতে অভিনয় ক'রতে দেখেছেন। এদের মজা হ'চ্ছে যে, এরা দু'জনে একসঙ্গে না নামলে অভিনয় ক'রতে চায় না। 'বোনাপার্ট' বলে একটি পুলিশের শিক্ষিত চোর-ধরা কুকুরকেও ছবিতে দেখা গেছে। সে আবার 'স্যুটীর' বাহন। 'স্যুটী হ'চ্ছে একটি শিক্ষিত ও অভিনয় দক্ষ কাঠবিড়ালী। বোনাপার্টের ক্ষুদে বন্ধু!

'মিনী' ব'লে একটি সুশিক্ষিত প্রকাণ্ড হাতী চলচ্চিত্রে প্রায়ই চমৎকার হাস্যরসের অভিনয় করে। ইতর প্রাণীদের মধ্যে 'মিনী'র মত সুচতুর জানোয়ার খুব কম দেখা যায়। হাসির ছবিতে 'মিনী' একেবারে অতুলনীয়। তার গায়ে প্রচণ্ড শক্তি বটে, কিন্তু, একটি ভেড়ার চেয়েও সে ঠাণ্ডা! 'মিনী'র কাছে 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'! চেনা-অচেনা সবার সঙ্গেই সে সমানই বন্ধুভাবে ব্যবহার করে। 'ফক্স্' কোম্পানীর তোলা একখানি হাসির ছবিতে একটি শিশুর আদেশে সে পরিচালিত হ'য়েছে। তার এমন তীক্ষ্ণবুদ্ধি যে, সেই শিশু যখন তাকে আদেশ ক'রলে যে "মিনী, তুমি এই ভীড় সরিয়ে দাও, সার্কাস ভেঙে দাও"—মিনী মত্ত হস্তীর মত তেড়ে গিয়ে সেই লোকারণ্যকে বিপর্য্যস্ত ক'রে তু'ললে এবং ডাইনে বাঁয়ে সব কিছু ধ্বংস ক'রতে ক'রতে এগিয়ে গিয়ে সার্কাসওয়ালাদের তাঁবুর আধখানা ভেঙে উড়িয়ে দিলে। তার সে অভিনয় এত স্বাভাবিক হয়েছিল যে দলের অনেকেই ভয় পেয়ে গেছ্‌লো—বুঝি হাতীটা সত্যই ক্ষেপে গেছে! কিন্তু, 'মিনী' জানতো যে সে অভিনয় ক'রছে, তাই দলের একটি প্রাণীকেও সে আহত করেনি। খুব সাবধানী সে!

মেট্রো গোল্ডউইন মায়ারের প্রত্যেক ছবিতে সর্ব্বপ্রথম যে সিংহটি মুখ বাড়িয়ে গর্জ্জন

"জিগ্‌স"— 'ফায়ার-ব্রিগেড্' চিত্রে এই সুচতুর কুকুরটির অভিনয় ভুলবার নয়।

"সিলভার কিং"— চলচ্চিত্রের অভিনয়ে দক্ষ কুকুর। 'ফাঙ্স্ অফ্ জাষ্টিস' চিত্রে এর অভিনয় অতুলনীয়।

"রেঞ্জার" চলচ্চিত্রের একটি শিক্ষিত কুকর ১৮৩
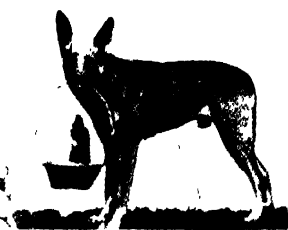
সুশিক্ষিতা "মিনী" ১৮৯
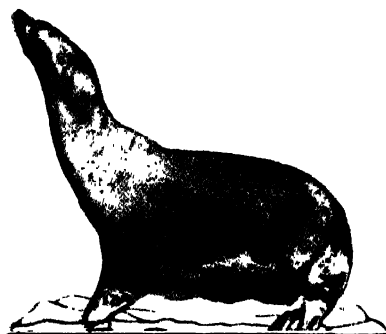
ক'রে দর্শকদের অভিবাদন জানায়—তার নাম "লীয়ো"। 'লীয়ো' হ'চ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকার নিউবীয়ার অধিবাসী। মেট্রোর কর্তৃপক্ষরা একে নির্ব্বাচন ক'রে নেবার আগে প্রায় ২০০ সিংহকে পরীক্ষা ক'রে দেখেছিলেন ; কিন্তু 'লীয়ো' ছাড়া আর কেউ তাদের মধ্যে চলচ্চিত্রের উপযোগী ব'লে বিবেচিত হয়নি। চেহারায়, কণ্ঠস্বরে, অভিনয়চাতুর্য্যে- লীয়ো' অদ্বিতীয়।

চলচ্চিত্রে পরিচিত চিতাবাঘ 'নোয়া'র ভীষণ মুখখানি অত্যন্ত ভয়াবহ বলে মনে হ'লেও আসলে কিন্তু সে নেহাৎ নিরীহ! নোয়ার খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং অভিনেতা হিসাবে সে খুব শান্ত ও বাধ্য! শিক্ষকের নির্দ্দেশ সে কখনো অমান্য করেনা। কাজেই, ছবিতে তাকে নিরুদ্বেগে নেওয়া চলে, কারণ তার উপর বিশ্বাস স্থাপন ক'রতে পারা যায়।

চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য ইতরপ্রাণী নির্ব্বাচন করবার সময় কর্তৃপক্ষের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত এই বিশ্বাস স্থাপন ক'রতে পারা যায় কিনা দেখা! যে জানোয়ার বেশ ঠাণ্ডা ও কথার বাধ্য এবং শিক্ষকের নির্দ্দেশ অবিলম্বে বুঝতে পারে, নূতন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে এলে বা অপরিচিত মানুষ দেখলে বা শব্দ শুনলে ভয় পায়না বা ভড়কে যায়না - এমন ভাবে শিক্ষিত প্রাণীর উপরই বিশ্বাস স্থাপন করতে পারা যায়। নচেৎ, যে জানোয়ারের অস্থির মেজাজ, খামখেয়ালী স্বভাব, যখন খোশ-মেজাজে থাকে তখন ভালো অভিনয় করে, যখন চটে তখন ক্ষেপে উঠে কামড়াতে যায়, তাকে নিয়ে চলচ্চিত্রে খেলানো বিপজ্জনক! কারণ, জানোয়ারটি যদি হঠাৎ বেঁকে দাঁড়ান, তাহ'লে একটি দৃশ্য পরিচালনা করতে গিয়েই পরিচালকের মাথার কালো চুল ভয়ে ভাবনায় একঘণ্টার মধ্যেই সব পেকে সাদা হ'য়ে উঠবে!

হাতী, ঘোড়া, বাঘ, সিংহ, চিতা, সাপ, ক্যাঙারু, হরিণ, বানর, বনমানুষ, গরিলা, ভল্লুক, এমন কি ছাগল, ভেড়া, গাধা, উট, গরু, মহীষ, হাঁস, মুরগী, পায়রা, কেনেরী, কাকাতুয়া, ময়ূর, তোতাপাখী, তিতির, শীলমাছ, বেজী, বাজ, টিয়া, কোকিল, বুল্‌বুল্ যা কিছু পশুপক্ষী আমরা ছবিতে দেখি, তাদের সকলকেই শিখিয়ে পড়িয়ে ছবিতে অভিনয়ের জন্য' প্রস্তুত ক'রে নেওয়া হয়। জীবজন্তুদের বহুবার মহলা না দিয়ে নামানো হয় না। অনেক সময় অভিনেতা অভিনেত্রীরা বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া সত্বেও ক্যামেরার সামনে এসে ভড়কে যান' এবং ভুল ক'রে বসেন, কিন্তু এই মূক প্রাণীরা উপযুক্ত শিক্ষা পেলে ক্যামেরার সামনে এসে কখনই ভুল করেনা! এই জন্য পরিচালকেরা তাঁদের মুখর অভিনেতাদের চেয়ে এই মূক অভিনেতাদের সম্বন্ধে অনেকটা নিরুদ্বিগ্ন থাকেন।

বন্যজন্তুর জন্য চিড়িয়াখানা ও সার্কাসের পশুশালার উপরই চলচ্চিত্রওয়ালাদের সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রতে হয়। কারণ, একসঙ্গে অনেকগুলি হিংস্র পশুকে ছবিতে নামাতে হ'লে এদের সাহায্য নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। কেবল, যে ছবিতে মাত্র একটি কোনো বিশেষ জানোয়ারের সম্পর্ক আছে, সেখানে লী ডান্‌কানের রীন্‌টিনের মতো কোনো ভদ্রলোকের নিজের গৃহপালিত পশুকে খুঁজে নেওয়া হয়।

চলচ্চিত্রের দর্শকেরা অনেকেই ছবিতে অরণ্যের হিংস্র পশুরা দাপাদাপি ক'রছে—দেখে হয়ত' অবাক হয়ে ভাবেন যে, এ ব্যাপারটা কেমন ক'রে সম্ভব হয়! সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুক বনমানুষ সমাকীর্ণ গভীর জঙ্গলের মধ্যে বিপদাপন্ন নায়ক নায়িকাকে দেখে নিশ্চয়ই তাঁরা

সভয়ে শিউরে ওঠেন! কিন্তু, কেমন ক রে এ ছবি তোলা হয় জানা থাকলে তাঁরা ভয় পেতেন না। শুনে হয়ত' অনেকেই আশ্চর্য্য হ'য়ে যাবেন যে, এ সব ছবির অধিকাংশই লৌহ-পিঞ্জরের মধ্যে তোলা! পরিচালক যেমন ক্যামেরার চোখের আড়ালে থেকে অভিনেতা অভিনেত্রীদের গতি নির্দ্দেশ করেন, তেমনি সার্কাসে যিনি বাঘের খেলা দেখান, বা চিড়িয়াখানায় যে লোক সেই বিশেষ পশুর রক্ষক, ক্যামেরার চোখের আড়ালে থেকে সেই সেই লোকই তাদের জানোয়ারগুলিকে ছবিতে পরিচালিত করেন চলচ্চিত্র পরিচালকের ইচ্ছা ও আদেশ অনুযায়ী।

লৌহ পিঞ্জরগুলি এত সুবৃহৎ যে, তারমধ্যে কৃত্রিম অরণ্যের দৃশ্যপট প্রস্তুত করে নেওয়া চলে। নদী ও পর্ব্বত কিম্বা ঝরণা বা গভীর জঙ্গলের দৃশ্যপট যদি কৃত্রিম না ক'রে স্বাভাবিক দেখাবার ইচ্ছা হয়, তাহ'লে সেইরূপ অনুকূল স্থান বেছে নিয়ে তার খানিকটা অংশ লৌহদণ্ড দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়, এবং জানোয়ারদের তার মধ্যে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। তারা সেই নূতন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে অভ্যস্ত হ'য়ে পড়লে তখন সেখানেই ছবি তোলার ব্যবস্থা হয়। পশুরক্ষক বা শিক্ষকরা ইতিমধ্যে তাদের সঙ্গে নায়ক নায়িকাদের পরিচিত ক'রে দেয় এবং মহলা দিয়ে পশুদের চিত্রোপযোগী শিক্ষা দিয়ে রাখে। যেখানে নায়ক নায়িকারা হিংস্র বন্যপশুদের সম্মুখীন হ'তে ভয় পায় সেখানে ছায়াধর-যন্ত্র তাদের সাহায্য ক'রে। অর্থাৎ পশু ও অভিনেতাদের চিত্র পৃথক পৃথক নেওয়া হয় এবং পরে উভয় চিত্রকে একত্রে সংযুক্ত করে একই ছবিতে পরিণত করা হয়। ক্যামেরার এই কৌশলের গুণে চলচ্চিত্রে অনেক অসাধ্য সাধন দেখানো সম্ভব হ'য়েছে। অনেক সময় আমরা ছবিতে দেখতে পাই নিউইয়র্কের বড় বড় গগনস্পর্শী (Sky scrapper) বাড়ীর দেওয়াল বেয়ে বেয়ে একটি লোক উপরে উঠে যাচ্ছে বা নেমে আসছে। একবার যদি হাত ফস্কে পড়ে যায় তাহ'লে একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে যাবে ? আসলে কিন্তু সে লোক কোনো বাড়ীর দেয়াল বেয়ে ওঠে না। প্রয়োগশালায় মাটীর উপর শোয়ানো বাড়ীর কৃত্রিম দৃশ্যপটের দেওয়ালের গায়ে গুঁড়ি মেরে মেরে চলে। 'ছায়াধর যন্ত্র উচ্চমঞ্চের উপর থেকে তার সেই ছবি তুলে নেয়। পরে ক্যামেরার কৌশলের গুণে তোলা সে ছবি যখন উল্টো ছাপা হ'য়ে পর্দ্দার উপর এসে পড়ে তখন দেখে মনে হয় একটি লোক যেন যথার্থই সেই আকাশ চুম্বী সৌধের দেওয়াল বে'য়ে বে য়ে সোজা উপরে উঠে যাচ্ছে! হিংস্র পশু সংক্রান্ত অধিকাংশ ছবিই প্রায় ক্যামেরার কৌশলের গুণেই দর্শকদের চোখের সামনে সত্য ঘটনা বলে প্রতিভাত হ'য়ে ওঠে, এবং তা দেখে তাদের বিস্ময়ের পরিসীমা থাকে না। উচ্চ পর্ব্বতের চূড়া থেকে বা বিশতলা বাড়ীর ছাদের উপর থেকে একটা লোক ঠিক্‌রে সমুদ্রের জলে পড়ে গেলো বা রাস্তার উপর আছাড় খেয়ে পড়লো দেখে আমরা অবাক্ হ'য়ে ভাবি—কী আশ্চর্য্য! এ কেমন ক'রে করে? প্রাণের ভয় নেই! কিন্তু, আসলে পাহাড়ের চূড়ো থেকে বা ছাতের উপর থেকে যেটা সমুদ্রের জলে বা রাস্তার উপর এসে পড়ে সেটা সেই মানুষের একটা কৃত্রিম মূর্ত্তি – আসল মানুষটি নয়! ক্যামেরায় শুধু আসল মানুষটির পড়ার ভঙ্গীটুকু পর্য্যন্ত নিয়ে পরে নকল মূর্ত্তিটির পড়ে যাওয়ার ছবি তোলে, এবং জলের ভিতর থেকে, বা রাস্তার উপর থেকে আবার আসল মানুষটির ছবি

নেওয়া হয় একেবারে সে জলের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে, নয়ত'—রাস্তার উপর অজ্ঞান. অবস্থায় পড়ে আছে! মাঝের এই ফাঁকিটুকু ক্যামেরায় এত সহজে সেরে নেওয়া যায় ব'লেই—ছবিতে মানুষের পক্ষে বড় বড় পাহাড় ডিঙিয়ে যাওয়া, সমুদ্র সাঁতারে পার হওয়া প্রভৃতি অসম্ভব কাণ্ড করাও তুচ্ছ ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

হিংস্র পশু নিয়ে নাড়াচাড়াটা অবশ্য এতটা সহজ ব্যাপার হ'য়ে ওঠেনি এখনো। পূর্ব্বেই বলেছি, তাদের জন্য বড় বড় খাঁচা ব্যবহার করতে হয়। ক্যামেরায় ছবি নেবার সময় খাঁচাটি ওঠে না! কারণ, সেটি এত বড়ো যে ক্যামেরার দৃষ্টির বাইরেই থেকে যায়। তাই অতি সহজেই খাঁচাটি বাদ দিয়ে কেবল জানোয়ারগুলির ছবি তোলা হয়। ক্যামেরা নিয়ে ক্যামেরাম্যান থাকেন সেই বড় খাঁচার ভিতর স্থাপিত আর একটি ছোট খাঁচার মধ্যে। অনেক দৃশ্যের ছবি আবার এ সব ক্ষেত্রে জন্তুদের সঙ্গে একত্র অভিনয় ক'রে তোলা হয় না—বৃহৎ আয়নার সাহায্যে জানোয়ারদের প্রতিবিম্ব সহযোগে অভিনয় করা হয়! 'ট্রেডারহর্ণ' ছবির কয়েকটি দৃশ্য প্রকৃতপক্ষে আফ্রিকার অরণ্যে গিয়ে তোলা হ'য়েছে বলে অনেকের ধারণা কিন্তু ছবিগুলি হোলিউডের চিত্রগড়েই তৈরি ক'রে নিয়ে তোলা হ'য়েছে। 'চ্যাঙ্' 'রঙ্গো' বা আফ্রিকা কথা বলে' প্রভৃতি হিংস্র জীবজন্তু বহুল ছবিগুলির অধিকাংশই এই ভাবে তোলা হয়। কতক আসল, কতক নকল!

যে ছবিতে একটিমাত্র বাঘ বা একটিমাত্র ভল্লুক, বা একটি চিতা কি একটি সিংহ অভিনয় ক'রছে দেখা যায় সেখানে বুঝতে হবে ঐ হিংস্র পশুটি গৃহপালিত কুকুর বিড়ালের মতই অত্যন্ত পোষমানা এবং একেবারে নিরীহ। 'লীয়ো' 'মিনী' প্রভৃতি এই জাতীয় জীব। এদের নিয়ে শিশুরাও নির্ভয়ে অভিনয় করতে পারে।

কোনো কোনো ছবিতে চরম পরাকাষ্ঠার দৃশ্যে (climax) নাটকীয় রস ঘনীভূত ক'রে তোলবার জন্য ইতর প্রাণীর সাহায্য খুব কাজে আসে! যেমন ধরুন—অবস্থা বিপর্য্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আত্মীয় বন্ধু যখন 'নায়ককে' ত্যাগ ক'রে চ'লে গেলো, এমন কি তাঁর স্ত্রী পুত্র পর্য্যন্ত যখন তার মুখের দিকে চাইলে না—যখন সে সংসারে নিতান্ত অসহায় ও একা—তখন, দু'টি চোখে অসীম সমবেদনা ভ'রে নিয়ে কোনো প্রভুভক্ত মূক জীব যদি সেই সবার পরিত্যক্ত মানুষটিকে বন্ধুর মত ঘিরে থাকে তাহ'লে সে দৃশ্য দর্শকের অন্তর স্পর্শ না ক'রে পারে না। অথবা, কোনো কঠিন বিপদের মধ্যে জীবন-মরণের সমস্যার মাঝখানে কেউ যখন রক্ষা করবার নেই—সেই সময় কোনো মূক প্রাণী যদি নিজ জীবন বিপন্ন ক'রেও তার প্রিয় প্রভুকে সেই আপদ থেকে পরিত্রাণ করে, তাহ'লে সে দৃশ্য ছবিখানিকে স্মরণীয় করে রাখে।

অকারণ ছবিতে ইতর প্রাণীর সমাবেশ ক'রে কোনো লাভ নেই। হাস্যরস-প্রধান চিত্র ছাড়া অন্য কোনো ছবিতে তাদের আনতে হ'লে পরিচালকের লক্ষ্য রাখা দরকার যাতে তাদের সাহায্যে চিত্রের নাটকীয় রস ঘনীভূত ক'রে তোলা যায়। অনেক সময় 'প্রতীক' স্বরূপ ছবিতে ইতর প্রাণীর ব্যবহার দেখা যায়—যেমন আসন্ন অমঙ্গলের সূচনা স্বরূপ কালপেঁচা, কালো বিড়াল,—আসন্ন মৃত্যুর আভাসরূপে শৃগাল বা শকুন, বসন্তের সমাগম

বোঝাতে. কোকিল বা পাপিয়া, প্রেমিক যুগলের নিবিড় মিলনের ইঙ্গিত দিতে কপোত মিথুন, ভিটে মাটি যাবার আগে সেখানে ঘুঘু চরাণো—ইত্যাদি প্রতীক ছবিকে সুন্দর ক'রে তোলে। চ্যাঙ, রঙ্গো, ট্রেডারহর্ণ, 'আফ্রিকা কথা বলে' প্রভৃতি ছবি বিশেষভাবে ইতর প্রাণীদের খেলা দেখাবার জন্যই তোলা এবং সেই ভাবেই গল্প লেখা! সুতরাং ও ছবিগুলিকে প্রাণী-চিত্র' বা Animal Seriesএর ছবি বলা চলে।
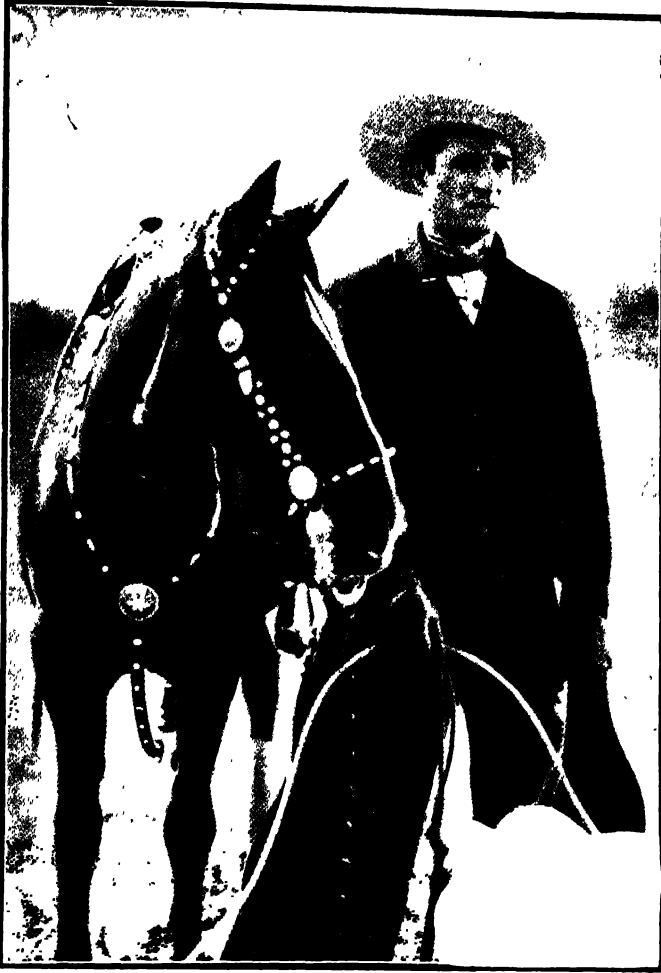
'টম্‌মিক্স্‌' ও 'টনি' (টমমিক্সের এই শিক্ষিত অশ্ব 'টনি' না থাকলে, 'টমমিক্স্‌'কে আজ কেউ চিনতোনা।) ১৯২
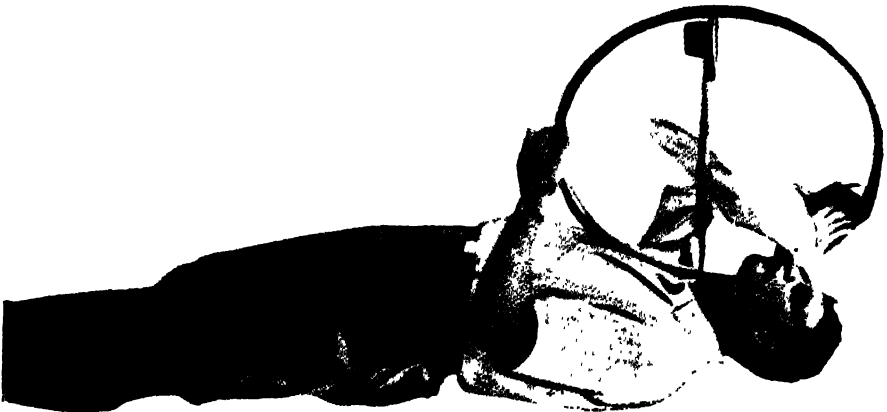
ফোর্ড টম্‌সন্‌ ও তাঁর শিক্ষিত কাকাতুয়া। ১৯৩

"প্যাশন্" নাটকে
বিখ্যাত অভিনেত্রী
পোলানেগ্রী ১৯৪

"লোনসাম লিউক" নাটকে
অভিনেতা হ্যারল্ড লয়েড্।
১৯৭

"দি নিউইয়র্ক হ্যাট" নামক ছায়া-
নাট্যের একটি দৃশ্য।
"আওয়ার সেবা" ১৯৫

চলচ্চিত্রে অভিনয় প্রণালী

পূর্ব্বেই বলেছি যে পরিচালকই হ'চ্ছেন চলচ্চিত্রের প্রধান শিল্পী—যিনি—ছায়াধর যন্ত্রী, দৃশ্যকার, দীপ-দক্ষ (Light-expert) ও নট-নটীগণের সমবায়ে চিত্র-নাট্যের গল্পটিকে রূপায়িত ও প্রাণবন্ত করে তোলেন। সুপরিচালক বলে যিনি খ্যাত হ'তে চান তাঁকে একাধারে চলচ্চিত্রাভিজ্ঞ, সাহিত্য-রসিক, সুর-সঙ্গীতজ্ঞ, আলোক চিত্র নিপুণ এবং শিল্প ও অভিনয় কলায় সুদক্ষ হ'তে হবে। এ ছাড়া তাঁকে আরও জানতে হবে—মনস্তত্ত্বের গুহ্য-রহস্য, মানব-চরিত্র-বৈচিত্র্য, প্রকট ও প্রচ্ছন্ন রূপের সন্ধান, চিন্তার ব্যঞ্জনা, ভাবের অভিব্যক্তি, রস-লীলা, সুতনুর অন্তরালে অতনুর আবেদন—তবেই তাঁর ছবি বিশ্বের মনোরঞ্জন করবার যোগ্য হ'তে পারবে। চলচ্চিত্রের অভিনেতারা পরিচালকেরই হাতের ক্রীড়নক মাত্র! তিনি তাদের নিয়ে যেমনটী খেলাবেন—তারা তেমনই খেলবে, তা'ব'লে তারা কাণাকড়ি' হ'লে চলবে না—তাদেরও 'খেলুড়ে' হওয়া চাই।

কিন্তু রঙ্গমঞ্চের অভিজ্ঞতা নিয়ে চলচ্চিত্রে অভিনয় ক'রতে গেলে সে খেলোয়াড়ের পক্ষে বাজি মাৎ করা সম্ভব হবে না, কারণ, অনেকবার এ কথা বলেছি যে রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ের সঙ্গে চিত্রাভিনয়ের নানাদিক দিয়ে অনেক রকম প্রভেদ বিদ্যমান। কাজেই, চলচ্চিত্রের অভিনেতৃগণকে ছবির উপযোগী পৃথক্ অভিনয় প্রণালী শিখতে হবে, রঙ্গালয়ের অভিনয়-ধারাকে ধ'রে থাকলে চলবে না। রঙ্গালয়ের অবস্থান সম্পূর্ণ কৃত্রিম। সাধারণ কথা বলার যে কণ্ঠস্বর, রঙ্গমঞ্চে অভিনেতাদের তার চেয়ে অনেক বেশী জোরে চীৎকার করতে হয়, নইলে দূরস্থ দর্শকেরা শুনতে পায় না। হাত পা একটু বেশী রকম প্রসারিত ক'রে অস্বাভাবিক জোরে ও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে নাড়তে হয়। ওঠা বসা ও চলা-ফেরার একটা বিশেষ রকম নাটকীয় ভঙ্গী থাকে। অর্থাৎ নাট্যমঞ্চে সব কিছুই দেখাতে হয় সাধারণ বা স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে অনেকখানি বড়ো ক'রে এবং বেশী করে। কিন্তু, চলচ্চিত্রে কিছুই বাড়িয়ে বা বেশী ক'রে করবার দরকার হয় না। স্বাভাবিক কণ্ঠে কথা ব'ললেই চলে ; কারণ শব্দবর্দ্ধনী যন্ত্র (Amplifier) ও উচ্চবাচক যন্ত্রের (Loud Speaker) সাহায্যে সে কণ্ঠস্বর লক্ষ দর্শকের শ্রুতি-গোচর করা চলবে। কাজেই—চলচ্চিত্রের অভিনয় প্রণালী অনেকখানি সহজ ও স্বাভাবিক অভিব্যক্তিরই অনুসারি। ছায়াধর যন্ত্রের সামনে অভিনয় করবার সময় কোনো বিষয়ে বাড়াবাড়ি করা ভুল। তা' ছাড়া চলচ্চিত্রাভিনয়ে অভিনেতাদের নড়াচড়া নাটকের দৃশ্য ও ঘটনানুযায়ী সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ। ছায়াধর যন্ত্রের দৃষ্টির বাইরে এতটুকু পা' বাড়াবার তাদের অধিকার নেই। হঠাৎ টপ্ ক'রে বিদ্যুৎবেগে ঘুরে দাঁড়ানো বা মুখ ফেরানো কিম্বা ত্বরিত অস্থির পদে ঘনঘন এধার-ওধার পদচারণা করা চলচ্চিত্রাভিনয়ে চলবে না। মুখের ভাব কেবলমাত্র অধরোষ্ঠ ও আঁখিদ্বয়ের সাহায্যে প্রকাশ ক'রতে হবে।

সমস্ত মুখ বিকৃত করা নিষেধ। অকারণ কোনো রকম অঙ্গভঙ্গী করা চলচ্চিত্রাভিনয়ে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অনেকের ধারণা ছবিতে অভিনয় ক'রতে হ'লে বুঝি অনবরত মুখভঙ্গী ক'রতে হয়। এ ধারণা তাঁদের সম্পূর্ণ ভুল। বাংলা ছবিতে একাধিক অভিনেতাকে প্রায়ই এ ভুল ক'রতে দেখা যায়। ফলে তাঁদের অভিনয় হ'য়ে ওঠে যেন আনাড়ীর ভাঁড়ামী! ছবির পর্দ্দার উপর অত্যন্ত হাস্যাস্পদ এবং অশ্রদ্ধেয় হ'য়ে ওঠেন তাঁরা দর্শকের সামনে। অতি-অভিনয়ের দোষ পর্দ্দায় যেমন ক'রে চোখে পড়ে রঙ্গমঞ্চে তেমন পড়ে না, সুতরাং চপল অভিনেতাদের উচিত ছায়াধর যন্ত্রের সামনে সংযত হ'য়ে অভিনয় করা।

চিত্রাভিনয়ে কথা বলবার সময় ঠোঁট যাতে খুব বেশী না নড়ে সে দিকেও মনোযোগী হওয়া দরকার। ছবিতে যত বেশী কম কথা কওয়া হয় ততই ভালো। রঙ্গমঞ্চে যেমন—কথাই হ'লো অভিনেতার একটা প্রধান সম্পদ, ছবিতে তেমনি বেশী কথা বলাই হ'চ্ছে অভিনেতার মস্ত বড় বিপদ! বেশী ঠোঁট নাড়লেই ছবিতে মুখ বিশ্রী হ'য়ে ওঠে এবং সবাকযন্ত্রের ভিতর দিয়ে ঠিক্‌রে আসা বেশী কথা কোনো মতেই শ্রুতিমধুর হ'তে পারে না, এটা যেন প্রত্যেক চলচ্চিত্র পরিচালক ও অভিনেতা স্মরণ রাখেন। কথা কওয়া ছবিতে অল্প দু' চারটি বাছা বাছা ভালো ভালো কথা ঠিক তাল বুঝে লাগাতে পারলে সে কথা-কওয়া ছবির দাম হ'য়ে ওঠে লাখটাকা! গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত গানে ও কথায় ভরা ছবির চেয়ে স্বল্প-বাক চলচ্ছবি যে অধিকতর জনপ্রিয় হ'য়ে ওঠে তার পরিচয় আমরা 'মরক্কো' প্রভৃতি একাধিক ছবিতে পেয়েছি।

রঙ্গমঞ্চে যেমন অভিনেতাদের পর্দ্দায় পর্দ্দায় বক্তৃতার সুর চড়াতে হয় নামাতে হয়, চলচ্চিত্রে সে রকম ক্রমোচ্চ গ্রামে স্বর তোলা বা ফেলার প্রয়োজন নেই। ছবিতে অভিনয় করবার সময় যে কথাগুলি বলবার সেগুলি বেশ সহজ ও স্বাভাবিক কণ্ঠে, একটু বিলম্বিত ল'য়ে এবং প্রত্যেক কথাটির পর ঈষৎ বিরাম দিয়ে পরের কথাটি উচ্চারণ করলে সবাক্ যন্ত্রে সে কথা খুব ভালো ও স্পষ্ট ওঠে। তবে, এটাও জেনে রাখা উচিত যে সকল অভিনেতার কণ্ঠ-স্বরই সবাক যন্ত্রের উপযোগী নয়। যাদের গলা অনুশ্রুতি যন্ত্রে বিশ্রী শোনায় তাদের উচিত নয় মুখর ছবিতে অভিনয় করা।

হাত পা নাড়া সম্বন্ধেও রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে ছবির পর্দ্দার অভিনয়ের ঐ একই প্রভেদ। জোরে বা বিদ্যুৎবেগে নড়া চড়া ও হাত-পা নাড়া-চাড়া একেবারে নিষেধ! নাচের ভঙ্গীতে চলা,—কাঁধ কাঁপানো, দু'হাত অকস্মাৎ সম্পূর্ণ প্রসারিত ক'রে দেওয়া, হঠাৎ হাত তোলা বা আঙুল পাকানো—রঙ্গমঞ্চে এসব ভঙ্গী যে কোনো অভিনেতাকে দর্শকদের কাছে সুদক্ষ নট ব'লে পরিচিত ক'রে দেবে, কিন্তু ছবির পর্দ্দায় এ সব প্যাঁচ দেখাতে গেলে ঠক্‌তে হবে। কারণ, তাঁদের এই সব সবেগ গতি ছবিতে ঠিক্ যেন ঝাঁকুনি বা খিঁচুনি হ'য়ে উঠবে।

ছবির পর্দ্দায় ভাব প্রকাশের সব চেয়ে প্রশস্ত উপায় হচ্ছে অভিনেতার দুই চোখ। বেশ ভাসা-ভাসা টানা দু'টি ডাগর চোখে ভাবের সাগর উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠতে পারে। চিত্রাভিনেতার সব চেয়ে বড় যোগ্যতা হ'চ্ছে—তার ডাগর দু'টি চোখ, যার গভীর দৃষ্টি মুখের ভাষার চেয়েও মুখর, স্বচ্ছন্দ কাব্যের চেয়েও হৃদয়গ্রাহী, সঙ্গীতের সুরের চেয়ে সুমধুর।

“কুইলেজ্” নাটকের শ্রেষ্ঠ ভূমিকায় "হেন্‌রী আইনলে" ১৯৬

শ্রীমতী লিলিয়ান গিশ্

ক্লার কিম্বাল ইয়ং ও মরিস কষ্টেলো

পোলানেগ্রী—ডিকেন্সের উপন্যাসের একটি দৃশ্যে।

প্রয়োগশালায় ছবির জন্য অভিনেতৃ নির্ব্বাচনের সময় নট-নটীদের মুখে এমনভাবে রুমাল বেঁধে দেওয়া হয় যে কেবলমাত্র তার চোখ দু'টি দেখা যাবে। তার পর, তাকে পরীক্ষা করা হয় যে, সে কেবলমাত্র চোখের সাহায্যে দুঃখ, বেদনা, আনন্দ, ক্রোধ, হিংসা, লোভ, ভয়, দুর্ভাবনা প্রভৃতি মনোভাব প্রকাশ ক'রতে পারে কিনা। যিনি এ পরীক্ষায় যোগ্যতার সঙ্গে উত্তীর্ণ হন তাঁর ভবিষ্যৎ চিত্রজগতে উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে।

রঙ্গালয়ে অভিনয়ের অভিজ্ঞতা যাঁদের আছে, তাঁরা যখন ছবির পর্দ্দার অভিনয় পদ্ধতির সঙ্গে নাট্যমঞ্চের অভিনয় প্রণালীর পার্থক্যটুকু হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তখন চিত্রাভিনয়েও তাঁরা যশস্বী ও জনপ্রিয় হ'য়ে ওঠেন; অবশ্য যদি তাঁদের আরও কতকগুলি অতিরিক্ত গুণ থাকে। রঙ্গমঞ্চে অভিনয় ক'রে প্রসিদ্ধিলাভ করবার জন্য ভালো ঘোড়সওয়ার হবার প্রয়োজন নেই, মোটর চালাতে বা সাইকেল চড়তে না শিখলেও চলে, সাঁতার জানা অত্যাবশ্যক নয়, বন্দুক ছোঁড়ায় ও সব রকম খেলায় ওস্তাদ হবার প্রয়োজন হয়না, কিন্তু চলচ্চিত্রে একজন নামজাদা সু-অভিনেতা হ'তে হ'লে তাঁকে উল্লিখিত সব রকম গুণের অধিকারী হ'তে হবে। কারণ, চলচ্চিত্রের দৃশ্যপট রঙ্গমঞ্চের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়। খোলা মাঠে, নদীর তীরে, বনে জঙ্গলে, পাহাড়ে, পথে, যেখানে সেখানে নাটকের নির্দ্দিষ্ট অবস্থান ও ঘটনা অনুযায়ী গল্পের নায়ক নায়িকা বা সঙ্গী ও অনুচরদের হয়ত, ঘোড়ার পিঠে উঠে ছুটতে হয়, সাইকেল চ'ড়ে দৌড়তে হয়,—সাঁতার কেটে নদী পার হ'য়ে পালাতে হয়, বন্দুক বা রিভলবারও ব্যবহারের দরকার হয়; কাজেই চলচ্চিত্রে সুঅভিনেতা হ'তে হ'লে এসবও জানা খুবই দরকার।

চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়া, তেতলার ছাত থেকে ঝাঁপ খাওয়া, জলঝড়ে সমুদ্রের মাঝখানে জাহাজ ডুবি হওয়া, উড়ো জাহাজ থেকে ঠিক্‌রে পড়ে যাওয়া—এসব ছবির অধিকাংশই যে 'ছায়াধর' যন্ত্রের কৌশলে ও আলোক চিত্র শিল্পীর হাতের কায়দায় সুসম্পন্ন হয় এ কথা পূর্ব্বেই বলেছি, তাহ'লেও, ছবিতে নটনটিদের অনেক সময় এমন সব দৃশ্য অভিনয় ক'রতে হয় যা মোটেই নিরাপদ নয়। ঘোড়ার উপর থেকে পড়ে যাওয়া—ভালো ক'রে না শিখলে অক্ষত থাকা সম্ভব নয়। নৌকোর ছই থেকে নদীর জলে ঝাঁপ খেয়ে প'ড়তে হলে সাঁতার জানা থাকা চাই। কারণ, ছায়াধর যন্ত্র এখানে অভিনেতাকে খুব বেশী সাহায্য ক'রতে পারে না। চলন্ত মেল ট্রেন থেকে একজন লোক ধাঁ ক'রে দরজা খুলে বা জান্‌লা গলে লাইনের ধারে লাফিয়ে পড়লো বা ট্রেনের চালের উপর উঠে পড়ে এক গাড়ী থেকে আর এক গাড়ীর মাথায় টপকে চলে গেলো দেখে আমরা অবাক্ হয়ে ভাবি—লোকটা কী দুঃসাহসী! একটু প্রাণের ভয় নেই! আসলে এ ছবি যখন নেওয়া হয় তখন ট্রেন মোটেই ছোটেনা,—ধীরে ধীরে চলে! কিন্তু ছায়াধর যন্ত্রে তার ছবিটা নেওয়া হয়—খুব তাড়াতাড়ি, এবং পর্দ্দার উপর সে ছবি ফেলাও হয়—খুব তাড়াতাড়ি। কাজেই আমরা দেখি চলন্ত মেল ট্রেন একেবারে বিদ্যুৎবেগে ছুট্‌ছে—আর তারই ভিতর থেকে একটা লোক মরিয়ার মতো জীবন তুচ্ছ ক'রে লাফিয়ে পড়লো!

ছায়াধর যন্ত্রের সামনে অভিনয় করতে নামবার আগে প্রত্যেক অভিনেতার উচিত খুব

ভালো ক'রে তাঁর ভূমিকার মহলা দেওয়া; যে পর্য্যন্ত না তাঁর অভিনয় নিখুঁত হয় সে পর্য্যন্ত ছায়াধর যন্ত্রের সম্মুখীন হওয়া অন্যায়, কারণ, সে সময় কোথাও সামান্য একটু ভুল করলেই সেই ত্রুটি সংশোধনের জন্য অনেকখানি মূল্যবান ছায়াপত্রী বাতিল হ'য়ে যাবে এবং সেই অংশের চিত্র আবার তোল্‌বার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় ও অযথা সময় নষ্ট হবে। কোম্পানী এই ক্ষতির জন্য তাঁকে দায়ী করতে পারে। সুতরাং এ বিষয়ে প্রত্যেক ছায়াচিত্রাভিনেতার বিশেষভাবে অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু রঙ্গমঞ্চের অভিনেতার এতটা সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন হয়না। আজ রাত্রে তাঁর অভিনয়ে কোথাও কোনো ত্রুটী হ'লে পরের রাত্রে সেটা তিনি শুধ্‌রে নিতে পারেন—সম্পূর্ণ বিনা খরচেই। তা'ছাড়া রঙ্গমঞ্চে কোনো দৃশ্যের অভিনয়ে 'কাল' সম্বন্ধে তেমন কিছু বাঁধাবাঁধি কড়া নিয়ম নেই। আজ যে দৃশ্য অভিনয় করতে কুড়ি মিনিট লেগেছিল কাল সে দৃশ্য অভিনয় ক'রতে যদি আধ ঘণ্টা সময় লাগে, তাতে এমন কিছু আসে যায়না, অভিনয়ের ধারাও প্রতিরাত্রে বদলাতে পারে। কিন্তু চলচ্চিত্রে মহলার সময়ই প্রত্যেক দৃশ্যটির যাবতীয় কার্য্য এবং অভিনয়-'কাল' একেবারে ঘড়ী ধরে নির্দ্দিষ্ট ক'রে দেওয়া থাকে, কাজেই ছায়াধর যন্ত্রের সামনে ঠিক সেই সময়ের মধ্যেই অভিনয়ের যাবতীয় খুঁটিনাটি শেষ করা দরকার, নইলে পরের দৃশ্যগুলি সমস্ত বেবন্দোবস্ত হ'য়ে পড়বে।

আমাদের দেশে দেখা যাচ্ছে আজকাল অনেকেই চলচ্চিত্র সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না জেনেই ওস্তাদ হ'য়ে উঠতে চান্। কোনো বিষয়ে সাধনা না থাকলে যে সিদ্ধিলাভ করা যায়না এ সত্য বিস্মৃত হ'য়ে তাঁরা নির্ব্বোধ ধনীর অর্থে নিজেদের খেয়াল খুশী চরিতার্থ করেন। ফাঁকি দিয়ে বিনা পরিশ্রমে সবজান্তা ব'নে বাজীমাৎ ক'রতে চেষ্টা করেন। ফলে তাঁদের পরিচালনায় যে ছবি তৈরী হয় তার জীবন সপ্তাহকালের মধ্যেই নিন্দার কলঙ্ক পঙ্কে ও ব্যর্থতার মধ্যে নিঃশেষিত হ'য়ে যায়। চলচ্চিত্রকে সার্থক ও সুন্দর করে তোলবার জন্য চাই এর পরিচালকের সর্ব্বপ্রকার যোগ্যতা ও সাধনা এবং তাঁর প্রাণপাত পরিশ্রম। বহুচিন্তিত ও বহু বিনিদ্র রজনীর পরিকল্পিত নানা খুঁটি নাটির যোগাযোগে, সজ্জা ও অলঙ্কারের সযত্ন সমাবেশে এবং আলোকপাত ও অভিনয় ভঙ্গীর সুনির্দ্দেশের উপরই ছবির পূর্ণ সাফল্য নির্ভর করে। প্রত্যেক অভিনেতা অভিনেত্রীর প্রধান কর্ত্তব্য হ'চ্ছে পরিচালককে এ বিষয়ে সকল দিক্‌দিয়ে সাহায্য কর্‌বার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করা।

মূক ছবির অভিনেতাদের একটি কথাও না ব'লে নিঃশব্দে মনের ভাব ব্যক্ত ক'রতে হয় ব'লে অনেকেই ভাবেন একটু বেশী রকম মুখভঙ্গী কর্‌তে হবে নিশ্চয়, কিন্তু এরূপ মনে করা অত্যন্ত ভুল। কি মূক অভিনয়ে—কি মুখর অভিনয়ে যে কোনো ছবিতেই অতিরিক্ত মুখভঙ্গী ও অঙ্গ সঞ্চালন অভিনেতার পক্ষে ক্ষতিকর। ছবিতে বরং খুব সংযত ও ধীরভাবে অভিনয় করাই সু-অভিনেতার কর্ত্তব্য। কথা ব'লবে তাঁদের চোখ, কথা বলবে তাঁদের মুখের ভাব, তাঁদের চলা বসা ওঠা দাঁড়ানো। মনে রাখতে হবে তাঁদের হাসি অশ্রুটি পর্য্যন্ত রাশ-বাঁধা, ওজন করা! প্রত্যেক নড়া-চড়াটুকুও গণ্ডী কাটা! তাঁদের যা কিছু ভাব প্রকাশ তা শুধু আভাসে ইঙ্গিতে। ইংরাজীতে যাকে বলে Suggestive Action.

নীরব ছবিতেও নায়ক নায়িকারা মাঝে মাঝে প্রয়োজন মত কথা বলে। সে কথার শব্দ

প্রসিদ্ধ অভিনেতা জন্ ব্যারিমোর

গুণসম্পন্ন অভিনেতা
রিচার্ড ডিক্স

স্ত্রীহত্যার সঙ্কল্প

নেই বটে, কিন্তু ভাষা আছে। তা’ দর্শকেরা কাণে শুনতে পায়না, কিন্তু প্রাণে যেন স্পষ্ট বুঝতে পারে। ছু’খানি ঠোঁট একটু কেঁপে উঠে, অল্প নড়ে কি কথা ব’ললে তার প্রত্যেকটি হরফ্ দর্শকেরা লুফে নিতে পারে যদি সেই দৃশ্যে, সেই ঘটনায় ; সেই অবস্থায় যে কথাটি বলা উচিত ঠিক্ সেই কথাটিই অভিনেতার মুখে বসিয়ে দেওয়া হয়। পরিচালকের সূক্ষ্ম দৃষ্টি, রসবোধ ও অভিজ্ঞতার উপরই এই সময়োপযোগী বাক্য-নির্ব্বাচন করা নির্ভর করে। চিত্রনাট্য রচয়িতাও এ বিষয়ে খানিকটা সাহায্য ক’রতে পারেন। মুখর ছবিতে যথাযোগ্য dialogue-এর কদর এইজন্য এত বেশী!

চিত্র-জগতে সু-অভিনেতা হ’তে হ’লে তাঁকে অভ্যাস করতে হবে যথাসাধ্য কম কথা বলে নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করা। মুখে কোনো কথা না-বলেও যিনি কেবল চোখ মুখের ভাব-ভঙ্গীতেই অনেক কিছু আমাদের ব’লতে ও বোঝাতে পারেন চলচ্চিত্রে তাঁর স্থান যে উচ্চশ্রেণীর মধ্যেই সুনির্দ্দিষ্ট সে বিষয়ে কোনো ভুল নেই। এই চোখ মুখের ভাব ভঙ্গীকে মুখের কথার চেয়েও মুখর ক’রে তুলতে হ’লে সে জন্যে সযত্নে সাধনা করতে হবে। একখানি বড় আয়নার সামনে নিজের মুখে রুমাল বেঁধে কেবলমাত্র চোখ ছু’টি বার করে রেখে চেষ্টা করতে হবে যাতে শুধু চোখের সাহায্যেই ভয়, সন্দেহ, ঘৃণা, বিদ্বেষ, হিংসা, আনন্দ, বেদনা, ক্লান্তি, উৎসাহ, উত্তেজনা, দয়া, মায়া, সহানুভূতি, সান্ত্বনা, স্নেহ, প্রেম, আশা, নিরাশা প্রভৃতি মনোভাব ব্যক্ত করা যায়। সাধনাই মানুষের চেষ্টাকে জয়যুক্ত ক’রে তোলে। ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে সাধনা ক’রতে পারলে মানুষ অনেক কিছু শক্তি ও গুণের অধিকারী হ’তে পারে যা একান্ত দুর্লভ ও অনন্যসাধারণ।

চোখের গড়ন বা আকৃতি আঁখিপল্লবের অবস্থান অনুযায়ী বিভিন্ন রকম দেখায় এই বৈজ্ঞানিক তথ্যটুকু আজ আর কারুর অবিদিত নেই। এখন, কোনো উৎসাহী তরুণ অভিনেতা যদি কিছুদিন সাধনা ও অভ্যাসের দ্বারা ইচ্ছামত এই আঁখি পল্লবের অবস্থান পরিবর্ত্তন ক’রে ফেলতে সক্ষম হ’ন, তাহ’লে যে কোনো মুহূর্ত্তে তিনি তাঁর মুখের চেহারাও বদলে ফেলতে পারবেন। একজন অভিনেতার পক্ষে—বিশেষ ক’রে চলচ্চিত্র অভিনেতার পক্ষে এটা যে একটা মস্ত গুণ এ কথা বলাই বাহুল্য ; কারণ টানা চোখ, ড্যাবরা চোখ, ভাঁটা-চোখ, বসা-চোখ, ভাসা চোখ, পায়রা চোখ, হরিণ চোখ, এমন কি পদ্মআঁখি ও খঞ্জন লোচনও যদি একই মানুষ ইচ্ছা করলে তাঁর নিজেরই আঁখি পল্লবের পেশী সঙ্কোচন ও প্রসারণের দ্বারা এত বিভিন্ন রূপান্তর ঘটাতে পারেন, তাহ’লে চিত্রাভিনয়ে পরিচালকের ও অভিনেতার উভয়েরই সেটা অনেক সুবিধায় ও কাজে লাগে।

চিত্রাভিনয়ের সময় বিনা প্রয়োজনে কোনো কিছুর দিকে ঝুঁকে দেখা বা ভ্রূ কুঁচকে চাওয়া উচিত নয়। যাদের চোখ খারাপ তারাই অমনি ক’রে চেয়ে দেখে। চিত্রগড়ের তীব্র বৈদ্যুতিক আলো, বা বহির্দৃশ্যে মুকুরে প্রতিফলিত সূর্য্যালোকের দীপ্তির মধ্যে অনেকেই সহজ-ভাবে ও পরিপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে তাকাতে পারেনা! এটাতে অভ্যস্ত না-হওয়া পর্য্যন্ত কোনো অভিনেতারই উচিত নয় ছায়াধর যন্ত্রের সম্মুখীন হওয়া।

ছু’জন লোকে যখন পরস্পরের সঙ্গে কথা বলে তখন দূর থেকে তাদের চোখ মুখের ভাব

ও হাতমুখ নাড়ার প্রতি লক্ষ্য রেখে যদি বোঝবার চেষ্টা করা যায় যে তারা কি বলাবলি ক'রছে তাহ'লে ভাব প্রকাশের ভঙ্গী সহজেই আয়ত্ত হ'তে পারে। বন্ধুমহলে এটা পরীক্ষা ক'রে দেখা মন্দ নয়, কারণ, তাহ'লে বুঝতে পারা যাবে যে তাদের কথা না শুনেও তাদের বক্তব্যটা তুমি ঠিক আন্দাজ ক'রতে পেরেছো কিনা।

নিয়মিত চেষ্টা ও অভ্যাসের দ্বারা অল্পদিনের মধ্যেই কেবলমাত্র মুখের সাহায্যে ভাবের অভিব্যক্তি আয়ত্ত করা যায়। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তুমি যদি ভাবো তোমার জীবনের কোনো বিগত বেদনা বা আনন্দের স্মৃতি যা তোমার প্রাণকে গভীরভাবে নাড়া দেয়, চিত্তকে সঘনে দোলা দেয়—লক্ষ্য কোরো তোমার মুখের ভাবের কি পরিবর্ত্তন ঘটে। সে সময় কিন্তু চেষ্টা ক'রে মুখের ভাব পরিবর্ত্তন করবার প্রয়াস পেয়োনা। আপনা-আপনিই মুখের যে স্বতঃ পরিবর্ত্তন ঘটবে, তারই রূপটি মনের মধ্যে এঁকে রেখে দেবে। পরে, সেই মুখভাবটি আয়নার সামনে পুনঃপ্রকাশের চেষ্টা করবে। এ সাধনা নিতান্ত সহজসাধ্য নয়। এতে একাগ্রতা আনা দরকার, অথচ আত্মহারা বা তন্ময় হওয়া চলবেনা। নিজের দেহ মনের উপর কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ নিজের হাতের মধ্যে থাকা চাই, অথচ ভাবের প্রবাহ যাতে তোমাকে অবাধে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে, সেদিকেও সচেতন থাকা দরকার। এমনি ক'রে নানা ভাবান্তর প্রকাশে অভ্যস্ত হ'তে হবে। শুধু তাই নয়, যে কোনোও মুখভাবকে ইচ্ছামত বহুক্ষণ ধ'রে রাখতেও শেখা চাই। কারণ চিত্রনাট্যের নির্দ্দেশ অনুযায়ী পরিচালকের ইঙ্গিতে এবং আলোক চিত্রকরের প্রয়োজনে হয়ত একাধিক দৃশ্যের সুস্পষ্ট ছবি, বা 'সন্নিধ-চিত্রে'র জন্য কোন্ সময় হঠাৎ হুকুম হবে Hold it! বা—"অম্নি থাকো!" তখন আর এতটুকু নড়চড় করা চলবেনা। মর্ম্মর মূর্ত্তির মত স্থির হ'য়ে থাকতে হবে সেই ভাবটি মুখে নিয়ে!

চলচ্চিত্রাভিনেতার পক্ষে শুধু ভাবপ্রকাশ, ভাব পরিবর্ত্তন ও ভাব ধারণে অভ্যস্ত হলেই চলবেনা, ভাবকে বা ভাব-প্রকাশকে খুব অল্প সময়ের মধ্যে ধীরে ধীরে গভীরতর ও নিবিড়তর ক'রে তুলতেও শেখা চাই। খুব অল্প সময়ের মধ্যে বললুম এই জন্য যে চলচ্চিত্রে সময় সম্বন্ধে সর্ব্বদা সতর্ক ও সজ্ঞান থাকা প্রত্যেক অভিনেতার প্রধান কর্ত্তব্য। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের উপর একটি দৃশ্য অভিনয় হ'তে হয়ত' পনেরো মিনিট সময় লাগে কিন্তু, সেই দৃশ্যই চলচ্চিত্রে হয়ত এক মিনিটেই শেষ ক'রে নিতে হয়। কারণ, চলচ্ছবি যে ছায়াপত্রীতে তোলা হয় তার দৈর্ঘ্যের একটা পরিমিত সীমা আছে। মহলা দেবার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক দৃশ্যটি অভিনয় হ'তে কতক্ষণ লাগে সেই সময়ের একটা বাঁধা তালিকা করে দেখা হয় সেটি ক' Reel (ছায়াপত্রী গুটিয়ে রাখা কাঠিম) অর্থাৎ ক'হাজার ফুট ছবি হতে পারে। এক কাঠিমে প্রায় হাজার ফুট ছায়াপত্রী গোটানো থাকে। এই হাজার ফুট ছবি পর্দ্দায় ফেলে দেখাতে কুড়ি মিনিটের বেশী সময় লাগেনা। কাজেই, চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্য এক মিনিট বড়জোর দেড় মিনিটের বেশী দর্শকের চোখের সামনে থাকেনা। সুতরাং একথা বোধহয় আর বুঝিয়ে বলার দরকার নেই যে চলচ্ছবির পক্ষে প্রত্যেক মিনিট কেন, প্রত্যেক সেকেণ্ড—এমন কি প্রত্যেক সেকেণ্ডের প্রত্যেক অংশটুকু পর্য্যন্ত সময় অতি মূল্যবান। কোন অভিনয় পর্দ্দায় কতটুকুর মধ্যে শেষ

দেবদাসী

শ্রীমতী ল্যাপেভ্যালে

[illegible]

চোখের ভাষা—(The man with the camera ছবিতে নায়কের একটি চোখের Big closeup) ২০৭

চখের ভাষা—বিজয়িনী (ক্লারা বো)। ২০৮

হ'য়ে যাবে এ ধারণা ও জ্ঞান যে অভিনেতার থাকে তিনি তাঁর অভিনয় নৈপুণ্য ও ভাবাভিব্যক্তি অনেকখানি তাঁর নিজের দখলের মধ্যে রাখতে পারেন।

সময়ে কুলিয়ে উঠছেনা দেখলে পরিচালক বাধ্য হ'য়ে অনেক দৃশ্যের অভিনয় সংক্ষিপ্ত ক'রে দেন, অনেক টুকিটাকি ব্যাপারও বাদ পড়ে যায়। পুনঃ পুনঃ মহলা দিয়ে সে দৃশ্য যতক্ষণ না ঠিক সময়ের মধ্যে খাপ খায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত কাটাকুটি ও অদলবদল চলতে থাকে, তার পর সেটা ছবিতে তোলা হয়। বাড়ীর দরজা খুলে বেরিয়ে এসে গাড়ীতে চড়া, বা গাড়ী থেকে নেমে বাড়ী ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠা এসব ব্যাপারের জন্য সময় নিয়ে বেশী মাথা ঘামাবার দরকার হয়না কারুরই, কিন্তু, গ্যাঁড়া-তলার বস্তির একটা নিভৃত আড্ডা-ঘরে গোপনে জনকয়েক বদ্‌মায়েস্ একটা ভীষণ ষড়যন্ত্র কর'ছে বা কোনো একটা পোড়ো বাগানবাড়ীর ঘরে জনকতক জালিয়াৎ লুকিয়ে বসে একজন নামজাদা বড়লোকের নামে উইল জাল করছে বা চেক জাল ক'রছে—এসব দৃশ্যের ছবি তোলবার আগে প্রত্যেক খুঁটিনাটির ভালো করে মহলা দিয়ে সময় ঠিক ক'রে নিতে হয়। কাজেই এসব স্থলে পরিচালক এবং অভিনেতা উভয় পক্ষেরই একটু মাথা খেলানো চাই, যাতে অল্প সময়ের মধ্যেই ব্যাপারটা শেষ হ'তে পারে, অথচ দৃশ্যের গুরুত্ব কিছুমাত্র না ক্ষুণ্ণ হয়।

চলচ্চিত্রে অভিনয় করবার সময় পরিচালকের বিশেষ আদেশ ব্যতীত কোনো অভিনেতারই উচিত নয় ছায়াধর যন্ত্রের দিকে সোজা চোখ ফিরিয়ে দেখা। ছায়াধর যন্ত্র যে সামনেই খাড়া করা রয়েছে এবং তারই সামনে যে সমস্ত দৃশ্য অভিনয় হচ্ছে এটা সর্ব্বদা খেয়াল থাকা চাই বটে, কিন্তু পরিচালক না বল'লে সরাসরি সেদিকে চেয়ে দেখা একেবারে নিষেধ!

অভিনয় দক্ষতা হ'চ্ছে মানুষের একটা স্বতঃস্ফূর্ত্ত গুণ, যার নিয়ত সাধনা ও অনুশীলন তাকে ক্রমে একজন নিপুণ নট-শিল্পীতে পরিণত করে। নট-প্রবৃত্তি যার মধ্যে অন্তর্নিহিত নেই, সে শতচেষ্টা সত্ত্বেও কোনোদিনই একজন সু অভিনেতা ব'লে খ্যাত হ'তে পারেন না। কবি, শিল্পী নট এরা সব 'জন্মায়'—কারখানায় 'তৈরি' হয় না। তবু, অভিনয়কলা একটা বিদ্যা এবং সেই বিদ্যা অর্জ্জন ক'রতে হ'লে এর কতকগুলি প্রাথমিক ও উচ্চপাঠ আছে যা সকলকেই ভালো ছেলের মত মনোযোগ দিয়ে পড়তে হয় ও শিখতে হয়।

যে কোনো ভূমিকা অভিনয়ের জন্য নির্ব্বাচিত হ'লে অভিনেতার প্রধান কর্ত্তব্য সেই চরিত্রটি ভালো ক'রে বুঝে নিয়ে তারা সঙ্গে নিজের একাত্ম হ'তে চেষ্টা করা। তাহ'লে আর প্রত্যেক খুঁটিনাটি ব্যাপারের জন্য প্রতিবার শিক্ষকের মুখাপেক্ষী হ'য়ে থাকতে হয় না। ধরুন, যদি তাঁকে পল্লীগ্রামের পাঠশালার 'গুরুমশাই' সাজতে হয়, বা মস্‌জেদের মক্তবের মৌলবী সাজতে হয়, কিম্বা ভক্ত পরিবারের বৈষ্ণব 'গুরুদেব' অথবা সওদাগরী হৌসের জাদরেল মুৎসুদ্দি, বড়বাবু কি পাটের দালাল সাজতে হয় তাহ'লে এই ধরণের লোকের চরিত্র অনুধাবন ক'রে একটা স্বাভাবিক ও সুসঙ্গত রূপ খাড়া ক'রে তোলাই হ'চ্ছে সু-অভিনয়ের সহজ উপায়। এমনি করেই ডাক্তার, উকীল, ব্যারিষ্টার, কবিরাজ, স্কুলমাষ্টার, চাষা, জমীদার, কেরাণী, ভিখারী, চোর ডাকাত, খুনে, লম্পট, মাতাল, ভৃত্য, সরকার, গোমস্তা, নায়েব, দেয়ান, মুটে, মজুর, গাড়োয়ান, দারোগা প্রভৃতি যে কোনো ভূমিকা পুঙ্খানুপুঙ্খ

অনুধাবন করে অভিনেতা তাঁর অভিনেয় চরিত্রটিকে দর্শকদের সামনে আসলরূপেই পরিস্ফুট ক'রে তুলতে পারেন।

মোট কথা, চলচ্চিত্রে অভিনয় হওয়া উচিত একেবারে যতদূর সম্ভব স্বতঃস্ফূর্ত, সাবলীল ও সকল দিক দিয়ে সুসম্পূর্ণ সহজ ও স্বাভাবিক। কোথাও এতটুকু কৃত্রিমতা বা চেষ্টা ক'রে কিছু কায়দা দেখাবার প্রয়াস পরিলক্ষিত হ'লে পর্দ্দার উপর সে অভিনয় দর্শকদের বিরক্তি ও অশ্রদ্ধাই অর্জ্জন ক'রবে। কারণ, যা অপ্রাকৃত ও অস্বাভাবিক—জীবনের সঙ্গে তার কোনো সহজ যোগ থাকে না, কাজেই সে অভিনয় হ'য়ে ওঠে প্রাণহীন ও অনুপভোগ্য!

আর একটা কথা মনে রাখা দরকার—চিত্রজগৎ হ'চ্ছে সৌন্দর্য্যের রাজ্য। এখানে কোনো কিছু অসুন্দর বা অশোভন হ'লে চলবে না। ঘরে ঢোকা, ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া, গাড়ীতে ওঠা, গাড়ী থেকে নামা,—চিঠি লেখা, বইপড়া, ওঠা, বসা, দাঁড়ানো, চলা, হাত-পা নাড়া, এ সবের মধ্যেই একটা বেশ কমনীয় শ্রী যাতে বজায় রাখতে পারা যায় সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা চাই। চলচ্চিত্রে অভিনয় করা রঙ্গমঞ্চের চেয়ে কঠিন বলেছি আরও এই জন্য যে—রঙ্গমঞ্চে একখানি নাটক দীর্ঘকাল ধরে মহলা দেওয়া হয় এবং একই রাত্রে সুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত বেশ ধারাবাহিক অভিনয় হয়, ক্রম-পরিণত ও ভাব বিকাশের দিক দিয়ে প্রস্তুত হবার জন্য অভিনেতা যথেষ্ট সময় ও সুবিধা পায়, কিন্তু, চলচ্চিত্রে চিত্রনাট্যের সমস্ত দৃশ্যগুলি একদিনে তোলা হয় না, এবং গল্পের ধারা অনুসারেও তোলা হয় না। ভিন্ন ভিন্ন দিনে এবং ছবির সদর ও অন্দরের ধারা অনুসারে তোলা হয়, মহলা দেবারও সময় বেশী পাওয়া যায় না, কাজেই, একই দিনে, একই সময়ে অভিনেতাকে হয়ত এক দৃশ্যে সম্পদের প্রাচুর্য্যে ভাসমান একজন স্ফূর্ত্তিবাজ সাজতে হয়, ও পরক্ষণেই হয়ত' অভাব ও দৈন্যের পীড়নে কাতর ও আর্ত্তের চরিত্র অভিনয় করতে হয়। কাজেই, প্রস্তুত হবার সময় ও সুযোগ চিত্রাভিনয়ে খুব অল্প মেলে! সুতরাং প্রত্যেক অভিনেতার উচিত চলচ্চিত্রে অভিনয় করবার পূর্ব্বে চরিত্রটি উত্তমরূপে আয়ত্ত ক'রে রাখা।

সেকালের ছবি এবং তার অভিনেতা অভিনেত্রীদের সঙ্গে একালের ছবি ও তার অভিনেতা অভিনেত্রীদের তুলনা ক'রে দেখলে প্রচুর আমোদ পাওয়া যায়। তুলনা ক'রে দেখবার একটা মস্ত সুবিধাও হ'য়েছে এই যে:—সেকালের অনেক ছবি আবার একালের অভিনেতা অভিনেত্রীদের দিয়ে নূতন ক'রে তোলানো হ'চ্ছে। ধরা যাক্ যেমন "Salome" ছবিখানা! বাইবেলের এই চির-পুরাতন গল্পটি অবলম্বনে কত যে নাটক উপন্যাস চিত্র ও নৃত্যাভিনয় হ'য়ে গেছে তার সংখ্যা হয় না! ছবিতে খুব সম্ভব শ্রীমতী থেডাবারাই সবপ্রথম 'স্যালোমের' ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন। তাঁর সে অভিনয়ের প্রশংসা আজও লোকে ক'রছে, এমনিই নিখুঁৎ সুন্দর অভিনয় করেছেন তিনি!

শ্রীমতী নাজিমোভাও স্যালোমের ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন, কিন্তু তিনি ছবিতে স্যালোমের একেবারে নূতন একটা রূপ ফুটিয়ে তুলেছিলেন। শ্রীমতী থেডাবারা তখনকার দিনে ছবিতে যে রকম অভিনয় করার পদ্ধতি ছিল সেই অনুসারেই স্যালোমের চরিত্র মূর্ত্ত

ওয়ালেস্ বিরী—(হাস্যরস অভিনেতা।

ড্রেসলার (হাস্যরসের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী)
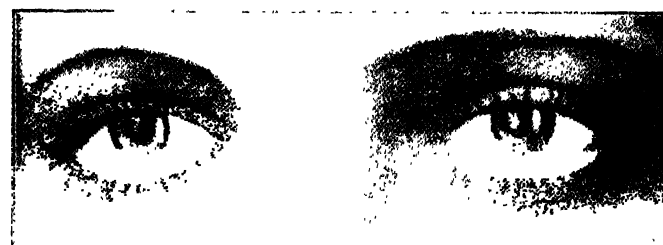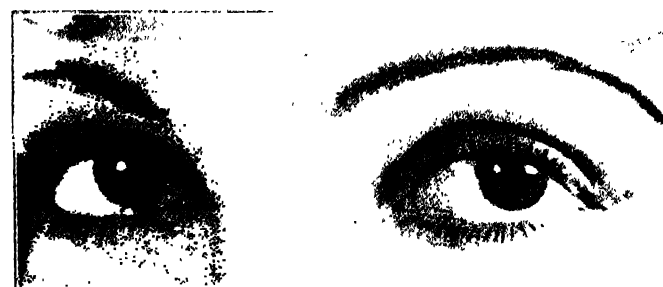
মার্লেনা ডিয়েট্রিক
মোহিনী অভিনেত্রী।

ক'রে তুলেছিলেন, আর নাজিমোভা স্যালোম চরিত্রের এমন একটি সূক্ষ্ম কলা-সম্মত রূপ-পরিকল্পনা ক'রে দেখিয়েছিলেন যে, সাধারণ দর্শকদের অধিকাংশই সে উচ্চ অঙ্গের অভিনয়-কলার রস গ্রহণ ক'রতে পারেননি। পুরাতন অভিনেত্রী শ্রীমতী ফ্লোরেন্স টার্নারও আর একখানি ছবিতে এই স্যালোমের ভূমিকা নিয়ে নেমেছিলেন। তাঁর সহকারী অভিনেতা ছিলেন প্রসিদ্ধ রূপদক্ষ শ্রীযুক্ত র‍্যালফ্ ইন্স্! "জন্ দি ব্যাপ্‌টিষ্টের" ভূমিকা নিয়েছিলেন র‍্যালফ্ ইন্স্ নিজে। এ ছবিখানিতে বাইবেলোক্ত যুগের, হেরদ রাজার' জাঁক জমকটাই ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা ছিল বেশী! য়ুনিভার্সেল্ কোম্পানীর প্রয়োগশিল্পী শ্রীযুক্ত কার্ল লেমেল্ প্রায় আশীলক্ষ টাকা ব্যয় ক'রে দু'বৎসর ধরে প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে "টমকাকার কুটীর" (Uncle Tom's Cabin) নামে ছবিখানির যে নূতন সংস্করণ ক'রেছেন, তার তুলনায় অতি সামান্য ব্যয়ে বহুকাল পূর্ব্বে ফ্লোরেন্স টার্ণারকে নিয়ে যে প্রথম 'টমকাকার কুটীরের' ছবিখানি তোলা হয়েছিল, তাকে খুব খারাপ বলা চলে না।

জগদ্বিখ্যাতা অভিনেত্রী শারা বার্ণহার্ট যখন ছবিতে অভিনয় ক'রতে নেমেছিলেন, তখন চিত্রলোকও এই অভিনেত্রীকুলরাণীকে সাম্রাজ্ঞীর সিংহাসনখানি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল। করুণরসের অভিনয়ে শারার সমকক্ষ শিল্পী পৃথিবীতে আর কেউ ছিল না। শারার পরই চিত্রজগতের শ্রেষ্ঠ নটীর আসন দাবী করেছিলেন শ্রীমতী পলিন ফ্রেডরিক এবং তারপরই করেছেন শ্রীমতী পোলা নেগ্রী! "বেলাডনা"র ভূমিকায় এঁরা দুজনেই পরের পর অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন, এবং দুজনেই এত ভালো অভিনয় করেছিলেন যে, কার অভিনয় বেশী ভালো হ'য়েছিল এ কথা বলা বড় কঠিন!

ডিকেন্সের প্রসিদ্ধ উপন্যাস 'A tale of two cities' অবলম্বনে যে নাটক রচিত হয়েছিল, তার নায়ক 'সিডনী কার্টনের' ভূমিকায় ইংলণ্ডের বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা সার্ জন মার্টিন হারভে বহুবার অবতীর্ণ হ'য়ে রঙ্গজগতের শ্রেষ্ঠ শিল্পী ব'লে পরিগণিত হয়েছিলেন। এই "টেল্ অফ্ টু সিটিজ্" যখন চিত্রে রূপান্তরিত হ'লো, তখন সার জন মার্টিন হারভেকেই চিত্রাভিনয়েও নায়কের ভূমিকায় নামানো হ'য়েছিল। চিত্র-জগতেও তিনি এই ভূমিকায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন; কিন্তু আমেরিকা যখন আবার নূতন করে এই ছবিখানি তুললে, উইলিয়ম ফার্ণাম্ নামে একজন সুদক্ষ অভিনেতা 'সিডনী কার্টনের' ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁর অভিনয় এমন অপ্রত্যাশিত রকম ভালো হ'য়েছিল যে, সার্ জন মার্টিন হারভে ছাড়া আর কেউ যে ভূমিকা ভাল ক'রে অভিনয় ক'রতে পারবে না বলে লোকের একটা ধারণা হয়ে গেছলো, সে ধারণা সকলকে পরিবর্ত্তন ক'রতে হয়েছিল!

আর একখানি ছবিতেও তিনজন বড় বড় অভিনেত্রী পর পর একই ভূমিকায় নেমেছিলেন, সে হ'চ্ছে "ক্যামিলে"—ছোট ডুমার উপন্যাসের নায়িকা! এই ক্যামিলের ভূমিকায় আমরা থেডাবারা, নাজিমোভা এবং নর্ম্মা টালমাজ্‌কে অভিনয় ক'রতে দেখেছি। কারুর চেয়ে কেউ যে কম যান, এমন কথা বলা চলে না; তবে নাজিমোভার একটা মস্ত সুবিধা হয়েছিল এই যে, তিনি রুডলফ্ ভ্যালেনটিনোকে সহকারী অভিনেতা

রূপে পেয়েছিলেন। নাজিমোভার সঙ্গে এই ছবিতে 'আরমান্দের' ভূমিকায় ভ্যালানটিনো অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন। অথচ ভ্যালানটিনো সে সময় তত বেশী জনপ্রিয় হ'য়ে ওঠেন নি; কিন্তু, নাজিমোভা তখন একেবারে যশের সর্ব্বোচ্চ শিখরে সমাসীনা! আজ সেই নাজিমোভা চিত্রজগৎ থেকে অপসারিত এবং ভ্যালেন্টিনো তাঁর যশোখ্যাতির দীপ্ত-মধ্যাহ্নে এ জগৎ থেকেই বিদায় নিয়েছেন।

প্রণয় অস্থরী। শ্রীমতী ক্লেয়ার ট্রিভেলেট্টি ও একটি প্রেমিক

রোণাল্ড্ কোলম্যান্ ও লিলিয়ান্ গিশ্

ভিক্টর ম্যাকল্যাগ্‌লেন ও ডোলোরেস-ডেলরিয়ো (Loves of Carmen চিত্রে) ২২৪ পৃঃ

মাথার উপরের আলোক রেখা ২২৬

চলচ্চিত্রের দৃশ্যপট

চলচ্চিত্রের প্রধান অবলম্বন হ'চ্ছে তার পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন ও মূল অধিষ্ঠান ভূমির বাস্তবতা। রঙ্গমঞ্চের কৃত্রিম দৃশ্যপট কিছুতেই তার নকল বেশের নগ্নরূপ দর্শকের দৃষ্টির সম্মুখে গোপন ক'রতে পারে না। তার আপেক্ষিক পরিমাপ (perspective) সকল দৃশ্যে ঠিক সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রতে অক্ষম ব'লে দর্শকের মনের উপর তার সহজ প্রভাবেরও একান্ত অভাব। কিন্তু চলচ্চিত্রের এ বিষয়ে প্রচুর সুবিধা ও সুযোগ বর্ত্তমান। প্রথমতঃ সারা পৃথিবীর যে কোনো স্থানের শ্রেষ্ঠ নিসর্গ দৃশ্য তার করতলগত, তা'ছাড়া যে কোনো সহরের যে কোনো স্থানের যে কোনো প্রাসাদের যে কোনো অংশ আজকাল বিশ্বকর্ম্মার ন্যায় নিপুণ শিল্পী ও ময়দানবের তুল্য অদ্ভুত কর্ম্মা কারিগরদের সাহায্যে চলচ্চিত্রের প্রয়োগশালায় অবিকল নির্ম্মাণ ক'রে নেওয়া চলছে। চলচ্চিত্রাভিনয় রঙ্গমঞ্চের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ নয় ব'লে ছায়ালোকে অসম্ভব বা অসাধ্য ব্যাপার কিছু নেই॥

উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সাগরবক্ষে যাত্রী পরিপূর্ণ জাহাজ হঠাৎ বিপন্ন হ'য়ে জলমগ্ন হ'চ্ছে—নাবিক হাল ধরে প্রাণপণে তরণী রক্ষার চেষ্টা করছে—ভগ্ন তরীর মধ্যে প্রবল বেগে জল ঢুকছে—ক্রমেই জাহাজের খোলের মধ্যে জল বেড়ে উঠ্‌ছে, সমস্ত দর্শক অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে—সবার চোখেমুখেই দারুণ উৎকণ্ঠা—এই গেল বুঝি—এই গেল বুঝি!—সেই জাহাজেই চলেছে যে তাদের চিত্রের নায়িকা তার প্রবাসী প্রণয়ীর সন্ধানে সাগর পারের দেশে! সে কি তবে পৌঁছতে পারবে না?···আর একটু যেতে পারলেই যে বন্দরে ভিড়তে পারা যায়! ওই না দেখা যাচ্ছে ওপারের ভূমিরেখা?···

চিত্রের চরমোৎকর্ষ দৃশ্যে এই যে উদ্বেগ এই যে উৎকণ্ঠা দর্শকের মনে জাগিয়ে তোলা এর জন্য চিত্রাভিনেতাদের সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জমান পোতে প্রাণ বিপন্ন ক'রতে হয় না। চলচ্চিত্র-শালার মধ্যেই এ দৃশ্যের অভিনয় হয়। শিল্পীরা অবিকল জাহাজের অংশ বিশেষ নির্ম্মাণ করে এবং সমুদ্রের পরিবর্ত্তে সেটি ভাসানো হয় একটি ওয়াটারপ্রুফ্ ক্যানভাসে নির্ম্মিত মস্ত চৌবাচ্ছায়! জাহাজের খোলের মধ্যে ক্রমে জল বেড়ে ওঠে—পিছন থেকে হোস্‌পাইপের সাহায্যে তার মধ্যে জল ভরতে সুরু করা হয় ব'লে! ক্যানভাসের চৌবাচ্ছাটিকে ইচ্ছামত দোলা দিয়ে সমুদ্রজল উত্তাল ও উচ্ছ্বসিত ক'রে তোলা হয়! রাশি রাশি জল চল্‌কে উঠে জাহাজের ডেকের উপর আছড়ে পড়ে! ছায়াধরযন্ত্রী (Camera-man) সুকৌশলে এ দৃশ্যে এমনভাবে লক্ষ্য সন্ধান (Focus) করেন যে এর সমস্ত কৃত্রিমতা ঢাকা প'ড়ে ব্যাপারটা দর্শকের চোখে বাস্তব সত্য হয়ে ওঠে!

চিত্রজগতে এই বাস্তবতার হুবহু অনুকরণের উপরই ছবির সাফল্য নির্ভর করে অনেকখানি। মাত্র দশ বছর আগেও এদেশের চলচ্চিত্র দর্শকেরা ছবির ভালমন্দ বিচার করে দেখতে জানতনা। বাঙ্‌লা ছবি তখন একটা নূতন জিনিস! এই নূতনের মোহই ছিল তখন যে কোনো বাঙ্‌লা ছবিতে দর্শক আকর্ষণের পক্ষে যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক। সে যুগের পরিচালকেরা যে কোনো প্রসিদ্ধ লেখকের গল্প নিয়ে তৃতীয় শ্রেণীর অভিনেতা অভিনেত্রীর সাহায্যেই ছবি তুলতে সাহস ক'রতেন এবং 'সেট্' বা দৃশ্যপটের জন্য যে কোনো একটা বাগানবাড়ী ও থিয়েটারের দু' একটা সীনই পর্য্যাপ্ত বলে মনে ক'রতেন। কিন্তু, আজ আর সেদিন নেই। আজ দর্শকেরা জনে জনে সমালোচক! তারা ছবির প্রত্যেক খুঁটিনাটি বিচার করে দেখতে শিখেছে! কাজেই পরিচালকদের অত্যন্ত সাবধানে কাজ করতে হয় কোথাও এতটুকু ফাঁকি বা গোঁজামিল দেওয়া চলে না। সমস্ত ছবিখানির মধ্যে কোথাও যাতে এর কোনো কৃত্রিমতা ও নকল বেশ দর্শকের চোখে ধরা না পড়ে সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে কাজ করতে হয়। সব কিছুই যাতে বাস্তব সত্যের অবিকল প্রতিরূপ হ'য়ে দেখা দেয় এর জন্য বর্ত্তমান প্রযোজক ও পরিচালক উভয়কেই সতর্কভাবে অগ্রসর হ'তে হয়।

ছবির এই স্বাভাবিকতা বজায় রাখতে আজকাল প্রত্যেক প্রয়োগশালায় একটি রীতিমত বৃহৎ ছুতারের কারখানা ও কামার কুমোর প্রভৃতি অসংখ্য সুদক্ষ কারিগর রাখতে হয়েছে। এদের সঙ্গে আছেন আবার স্থাপত্য কলাবিদ্, চিত্রকলাবিদ্ ও মূর্ত্তিশিল্পী। এদের কি কি ক'রতে হয় তার একটা কোনো বাঁধা ধরা হিসাব নেই, তবে এদের কাজের কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিলে হয়ত কতকটা ধারণা হ'তে পারে যে কি প্রয়োজনে এদের প্রয়োগশালায় বেতনভোগীরূপে সংগ্রহ ক'রে রাখা দরকার। প্রাসাদ, কক্ষ, তোরণদ্বার, রথ, তাঞ্জাম, পাল্‌কি, সিংহাসন পালঙ্ক, বেদী, মন্দির, বিগ্রহ, শিলাচিত্র, মর্ম্মর মূর্ত্তি, জাহাজ, তরণী, বিমানপোত, পর্ণকুটির, ভাঙাবাড়ী, কারখানা ঘর, চাঁদনী ঘাট, স্মৃতিস্তম্ভ, কবর এমন কি শবাধার পর্য্যন্ত যখন যা কিছু সরঞ্জাম ছবির জন্য প্রয়োজন হয় তখনই তা' নির্ম্মাণ করবার জন্য এদের ডাক পড়ে। স্থপতি নক্সা ও পরিকল্পনা থেকে কারিগরদের নির্ম্মাণ কার্য্য তত্ত্বাবধারণ পর্য্যন্ত ব্যস্ত থাকেন। শিল্পীরা তার শোভা ও সৌন্দর্য্য সম্পাদন করতে লেগে যান, এমনি করে দেখতে দেখতে পনেরো দিনের মধ্যে হয়ত বৌদ্ধ যুগের এক বিরাট রাজপ্রাসাদ বিহার বা নগর গড়ে ও'ঠ!

বিগত মহাযুদ্ধের চিত্রে বহু বিমানপোত ও বড় বড় হাউট্‌জার কামান এমন কি সাব্‌মেরীন পর্য্যন্ত প্রয়োগশালার কারখানায় তৈরি ক'রতে হ'য়েছিল। কারণ মুহূর্ত্তের মধ্যে শত্রুপক্ষের গোলার আঘাতে তা চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে যাবে। হালকা দেবদারু কাঠ, বেত, বাখারি, টিন, রবারের নল, সাইকেলের চাকা, পাইনের তক্তা, কাদামাটি, পাট, ছেঁড়া ন্যাকড়া, দড়ি-দড়া, পেরেক, তার, ক্যাম্বিশ, রবার, চামড়া, কাগজ প্রভৃতি বাজে জিনিসের সাহায্যে এই সব নকল সরঞ্জাম সুদক্ষ কারিগরের হাতে এমন হুবহু সত্যরূপ ধারণ করে যে অনেক সময় ছবিতে সেই জিনিস দেখে বিশেষজ্ঞেরাও নকল ব'লে ধ'রতে পারেন না!

ঝড়, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, বজ্র, তুষারপাত, জলপ্রপাত, অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প, বন্যা প্রভৃতি যা'-কিছু প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় ছবির জন্য প্রয়োজন হয়, পরিচালকের আদেশ মত প্রয়োগশালার মধ্যেই তা

সংঘটিত হ'য়ে থাকে। এসব চলচ্চিত্রাগারের কারিগরদের পক্ষে অত্যন্ত সোজা কাজ! সাত দিনের মধ্যে যারা অজন্তা গুহা বা তাজমহল তৈরী করে দিতে পারে। পনেরো দিন সময় পেলে যারা নিউইয়র্কের মত সহর থেকে আরম্ভ করে লণ্ডন প্যারিস বার্লিন ভিয়েনা ভিনিস্ পর্য্যন্ত বড় বড় নগর নির্ম্মাণ ক'রে ফেলতে পারে, হাব্ড়ার পুল থেকে হিমালয় পর্ব্বত পর্য্যন্ত সৃষ্টিকরা যাদের পক্ষে অনায়াস সাধ্য, তাদের পক্ষে এসব নিতান্ত ছেলেখেলা। প্রয়োগশালায় 'সেট্' বা দৃশ্যপটের মাথার উপর একটি সহস্র-ছিদ্র ট্যাঙ্ক্ বসানো হয়, একটু পাশে এরোপ্লেনের একটি প্রোপেলার্ (বায়ু চর্কি) ফিট করে রাখা হয়, চিত্র গ্রহণের সময় নলের সাহায্যে সেই সহস্র-ছিদ্র ট্যাঙ্কে ক্রমাগত জল ঢালা হয়। ছিদ্রপথে সেই জল বৃষ্টিধারার মত ঝ'রে পড়ে! – বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে বিমানপোতের সেই বায়ুচক্রটিকে প্রচণ্ড বেগে ঘোরাণো হয়, বাতাসের বেগে বৃষ্টিধারা ও দৃশ্যের গাছপালা বায়ুতাড়িত হ'য়ে ওঠে! দৃশ্যপটটি যথাসম্ভব অন্ধকার করা থাকে, আলোকদক্ষ প্রয়োজনমত মধ্যে মধ্যে চমক্দীপের (Flash light) সাহায্যে বিদ্যুৎ স্ফুরণের অনুকরণ করেন! শব্দযন্ত্রীরা মেঘ ও বজ্রধ্বনির শব্দ সরবরাহ করেন! ফলে, দৃশ্যটি ছবিতে দেখা দেয়—একেবারে ঘোর অন্ধকার রাত্রে প্রবল ঝড় বৃষ্টি বিদ্যুৎ ও বজ্রাঘাতের মধ্যে যেন প্রত্যক্ষ সত্য হ'য়ে!

আভ্যন্তরীণ দৃশ্যপট সমস্তই প্রয়োগশালার এই কারখানা থেকেই তৈরি হয়। বস্তির কোনো মজুরের ঘর, সহরের কোনো বড় লোকের বাড়ী—সে বড়লোকটি আবার বনেদি বড় লোক কিম্বা হঠাৎ বড় লোক—কি রকম ধনী সে জেনে তার ঘর দোর সেইরকম ধরণে সাজাতে হয় এর জন্য পূর্ব্বেই বলেছি প্রত্যেক প্রয়োগশালায় এক একজন কলানায়ক বা সজ্জাকর (Art or Technical Director) থাকেন। তাঁর কাজ ছবির গল্পের সময় ও বর্ণনা অনুযায়ী দৃশ্যপট সাজানো, সরঞ্জাম সংগ্রহ ক'রে দেওয়া, পোষাক পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। এই মানুষটিকে সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ হ'তে হয়। ইতিহাস, ভূগোল, পুরাতত্ত্ব, বর্ত্তমান ও প্রাচীন সমাজের চালচলন আস্বাব পোষাক সবকিছুই তাঁর জানা থাকা দরকার। এক কথায় ব'লতে গেলে ব'লতে হয়—'কলা পরিচালক'কে হতে হবে একজন সবজান্তা—অর্থাৎ একখানি সজীব "এন্সাইক্লোপেড়িয়া"!

অনেক সময় পরিচালকেরা অসাবধানতা বশতঃ ছবিতে একটু আধটুক্ এমন সাঙ্ঘাতিক ভুল ক'রে ফেলেন, যেজন্য ছবিখানি সকল দিক দিয়ে সুন্দর হ'লেও সেই দু'একটি দোষের জন্য দর্শকসমাজে তাঁদের হাস্যাস্পদ হ'তে হয়। একবার কোনো পরিচালক একখানি বিগত মহাযুদ্ধ সংক্রান্ত চিত্র পরিচালনা ক'রছিলেন। সেই ছবিতে একটি দৃশ্য আছে বিজয়ী জার্ম্মাণ সৈনিকেরা বেলজিয়মের মধ্যে প্রবেশ করেছে এবং একটি গ্রাম্যপথ দিয়ে সেই সেনা-বাহিনী মার্চ্চ করে অগ্রসর হ'চ্ছে। সেদিন বড় গরম পড়েছিল; পরিচালকের অনুমতি নিয়ে যাঁরা সৈনিকের ভূমিকা অভিনয় করছিলেন তাঁরা স্ব-স্ব পরিহিত 'কোটের বুকের বোতাম খুলে দিয়ে চলছিলেন এবং বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ জার্ম্মাণীর যে প্রসিদ্ধ 'আয়রন্ ক্রস্ পদক আছে সেগুলি বুকের উপর এমন স্থানে তাঁরা বিশেষ করে এঁটেছিলেন যাতে ছবিতে তাঁদের সেই অলঙ্কার বেশ স্পষ্ট দেখা যায়! হঠাৎ এদিকে কলানায়কের দৃষ্টি পড়ায় তিনি সত্বর

পরিচালকের এ ত্রুটী সংশোধন ক'রে দিলেন। তিনি স্বয়ং লড়াইয়ে যোগ দিয়েছিলেন এবং একাধিকবার জার্ম্মাণ সৈন্যবাহিনীর বিজয় অভিযান প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি তাই বেশ জোর ক'রেই বললেন—"এ হ'তেই পারে না ; জার্ম্মাণ সৈনিক সর্দ্দিগর্ম্মি হয়ে যদি মরেও যায় তবু সে মার্চ্চ করবার সময় কিছুতেই তার কোটের একটি বোতামও খুলবে না, আর তাদের ঐ 'আয়রণক্রস্' পদকখানি এমনভাবে তাদের বুকে আঁটা থাকে যে প্রকৃতপক্ষে সেটা কারুর চোখেই পড়ে না! দেখতে পাওয়া যায় শুধু তার সেই বিচিত্র সাদা কালোরংয়ের ফিতে যা বিশেষ করে ঐ পদকেই সংলগ্ন থাকে! পরিচালক তৎক্ষণাৎ কলানায়কের মন্তব্য গ্রাহ্য ক'রে তাঁর এ ত্রুটী সংশোধন ক'রে নিলেন। ফলে ছবিখানি যথাসম্ভব নির্দ্দোষ হ'য়ে উঠলো। এইভাবে ছবির প্রত্যেক খুটিনাটি সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি না রাখতে পারলে অনেক সময় অনেক ভালছবিও নিন্দনীয় হয়ে পড়ে।

একখানি ছবিকে যদি সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য কেউ কৃতসঙ্কল্প হ'ন তাহ'লে ছবির 'সেট' বা দৃশ্যপট নির্ম্মাণে যে ব্যয় হবে তা'তে কার্পণ্য করা চলবে না। চলচ্চিত্রের একটা প্রধান মোটা খরচ হ'চ্ছে তার এই আভ্যন্তরীণ দৃশ্যপট প্রস্তুতের ব্যয়। তার মূল কারণ, একখানি ছবিতে যে দৃশ্যপট ব্যবহার করা হয়, আর কোনো ছবিতে তা' ব্যবহার করা চলে না! নূতন ছবি তোলবার সময় সেগুলি ভেঙে ফেলে আবার নূতন করে সমস্ত দৃশ্যপট প্রস্তুত করাতে হয়। চলচ্চিত্রের প্রথম যুগে দর্শকেরা বিভিন্ন ছবিতে একই দৃশ্যপট বা আস্‌বাব পুনরায় ব্যবহার করা হয়েছে দেখলে বিশেষ কিছু আপত্তি ক'রতনা। কিন্তু, হাল আমলের দর্শকেরা যদি পূর্ব্বে-ব্যবহৃত কোনো একটা সামান্য জিনিসও আর একখানি ছবিতে ব্যবহার করা হয়েছিল ব'লে চিনতে পারে, তাহলে ধিক্কারের আর অবধি রাখে না! কাজেই, প্রত্যেক ছবির জন্য পৃথকভাবে নূতন ক'রে দৃশ্যপট আস্‌বাব ও সাজ-সরঞ্জাম তৈরি করে নিতে বাধ্য হ'তে হয়।

পূর্ব্বেই বলেছি দৃশ্যপট দুরকম আছে, আভ্যন্তরীণ ও বহির্দৃশ্য। গৃহের অভ্যন্তরে অর্থাৎ কোনো কক্ষমধ্যে বা অন্তঃপুরে যে দৃশ্য অভিনয় হয় সাধারণতঃ তাকেই 'আভ্যন্তরীণ দৃশ্য' (Interior) বলা হয়,—আর গৃহের বাহিরে যে দৃশ্য অভিনয় হয় তাকেই 'বহির্দৃশ্য' বলা হয়। আভ্যন্তরীণ দৃশ্য প্রয়োগশালার চারিদিক ঘেরা আটচালার মধ্যে অর্থাৎ চিত্রচত্বরের (Shooting Hall) মধ্যেই সাজাতে হয়, তাতে শিল্পীর স্বাধীনতা নিতান্ত সীমাবদ্ধ হ'য়ে পড়ে, কিন্তু বহির্দৃশ্য সাজাবার সময়—যেমন ধরুন কোন দুর্গপ্রাকার শত্রুরা আক্রমণ করবে—বা সসৈন্যে মহারাজ নগরে প্রবেশ করছেন অথবা কোনো প্রাসাদতুল্য অট্টালিকার তোরণদ্বার পথে নায়ক নায়িকার প্রবেশ বা নির্গম দেখাতে হবে সে ক্ষেত্রে দৃশ্যপট সাজাবার সময় শিল্পী পূর্ণ স্বাধীনতা পায়, কারণ সে দৃশ্য প্রয়োগশালা সংলগ্ন কোনো উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে নির্ম্মাণ করা হয়। চারিদিক ঢাকা প্রয়োগশালার আটচালার ভিতরের সঙ্কীর্ণ চতুঃসীমার মধ্যে সে তখন আর আবদ্ধ নয়, কাজেই বিশ্বকর্ম্মা ও ময়দানবের সঙ্গে প্রতিযোগীতা করেই শিল্পী এক্ষেত্রে সুবৃহৎ দৃশ্যপট সাজাবার অবাধ সুযোগ পায়। বিশাল প্রাকার বেষ্টিত অভ্রভেদী সুদৃঢ় দুর্গ শত্রুর প্রচণ্ড আক্রমণে চূর্ণ হয়ে গেল, বা ভীষণ ভূমিকম্পে একটা বিরাট নগর ধ্বংস হয়ে গেল, এসব

সুবৃহৎ দৃশ্যপটে এ যুগের সুদক্ষ শিল্পীরা এমন নিপুণভাবে বাস্তবের অনুকরণ করেন যে পর্দার উপর সে ছবি দর্শকের বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে অকৃত্রিম ব'লে মনে হয়! এই সব দৃশ্যপট নির্ম্মাণের জন্য ওপারের চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীরা অনেক সময় একখানি ছবিতেই হয়ত তিন লক্ষ টাকার উপর ব্যয় করেন। ফলে সেই তিনলক্ষ অল্পদিনেই তিরিশ লক্ষ হ'য়ে ঘরে ফিরে আসে।

চলচ্চিত্র ব্যবসায়ের প্রথম যুগে ছবিতে লণ্ডন বা প্যারিসের কোনো দৃশ্য দেখাবার প্রয়োজন হ'লে কোম্পানী সদলে লণ্ডনে বা প্যারিসে ছুটতেন। সেখানকার কোনো অনুকূল স্থান নির্ণয় ক'রে ছবি তুলতেন গিয়ে, যাতে চিত্রে বর্ণিত ঘটনাস্থল ও তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ছবিতে সত্যরূপ নিয়ে প্রতিভাত হয়, কিন্তু, অধুনা এতটা শ্রম স্বীকারও আর তাঁদের ক'রতে হয় না। আজকাল প্রয়োগশালাতেই আদেশমাত্র অল্পদিনের মধ্যে চিত্রলোকের বিশ্বকর্ম্মা ও ময়দানবেরা প্যারিস্ বা লণ্ডনের মত বড় বড় সহরও অবিকল নির্ম্মাণ ক'রে ছেড়ে দেন। যে সব প্রাচীন সহর আজ ধরা পৃষ্ঠ হ'তে চিরদিনের মত লুপ্ত হ'য়ে গেছে চিত্রলোকের বিশ্বকর্ম্মারা প্রয়োগশালায় ছ'মাসের মধ্যেই সেই বারিরুম, আসিরীয়া, পম্পাই, পার্সিপলিস্ প্রভৃতি লুপ্ত জনপদ আবার নূতন ক'রে সৃষ্টি করছেন।

অবশ্য একটা কথা এখানে বলা দরকার যে—চলচ্চিত্র তোলা কোনো অমিতব্যয়ী ধনীর সখের খেয়াল চরিতার্থ করা নয়, এ একটা রীতিমত ব্যবসা। এতে প্রতিপদে লাভ লোকসান ক্ষতিয়ে চলতে হয়। যেখানে ছবির কোনো ক্ষতি না ক'রে ব্যয় সংক্ষেপ করা যেতে পারে সেখানে অকারণ অর্থব্যয় করা মূঢ়তা। ধরুন যেমন কোনো ছবিতে মনোহর সরোবর ও ও পুষ্পোদ্যান দেখাতে হবে, সে ক্ষেত্রে ঐরূপ অনুকূল স্থান কোথাও সন্ধান করে নেওয়া হয়, প্রয়োগশালায় এ দৃশ্যপট নির্ম্মাণ ক'রে অনর্থক অর্থব্যয় করা হয় না। কোনো ছবিতে হয়ত এমন একটি পথ দেখাতে হবে যার উভয় পার্শ্বে দীর্ঘ দেবদারু শ্রেণী আছে! এরূপ পথ কাছাকাছি কোথাও না পাওয়া গেলে কি করা হয় জানেন?—যে কোনো সাধারণ পথ যার উভয় পার্শ্বে টেলিগ্রাফ্ বা ইলেকট্রিকের পোষ্ট আছে অথচ ট্রাম লাইন বা বাস চলাচল নেই, সেই রাস্তা বেছে নিয়ে দেবদারু গাছের অসংখ্য ডালপালা কেটে এনে সেই টেলিগ্রাফ্ বা ইলেকট্রিক পোষ্টগুলিতে বেঁধে দু' একঘণ্টার মধ্যেই সেগুলি দেবদারু বৃক্ষশ্রেণীতে রূপান্তরিত ক'রে নেওয়া হয়। অবশ্য এ সব ব্যাপারে ছায়াধরযন্ত্র চলচ্চিত্রকে প্রচুর সাহায্য করে। হয়ত' কোনো ছবিতে মিশরের পিরামিড দেখাতে হবে, সে জন্য আর মিশরে ছুটতে হয় না। প্রয়োগশালায় একতলার মত সামান্য উঁচু করে কাঠের তক্তার সাহায্যে একটি নকল পিরামিড তৈরী করা হয়, কিন্তু ক্যামেরার চাতুরীর সাহায্যে ছবিতে সেটি এতবড় ক'রে তোলা হয় যে আলোকচিত্রের কৌশলে তা' মিশরের বিশাল পিরামিডকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করতে পারে! যেমন সেদিন "কিং কং" ছবিতে অতিকায় গ্যরিলাটিকে অসম্ভব বড় করে দেখানো হয়েছে। আজকাল ক্যামেরা এবং আলোক চিত্রের চাতুরী ও কৌশলের গুণে পরিচালক অনেক অসম্ভবও সম্ভব ক'রে তুলতে পারছেন, যা আগের দিনে হয়ত' তাঁদের কল্পনারও অতীত ছিল! ছবিতে এখন মন্যুমেণ্টকে 'কুতব মিনার', টেগোর ক্যাস্‌লকে 'বিজাপুর

দুর্গ' বা 'জ্যাকেরিয়া মশজিদকে জুম্মামশজিদে রূপান্তরিত ক'রে নেওয়া অনায়াসসাধ্য হয়ে পড়েছে।

ক্যামেরার সূক্ষ্ম দৃষ্টিকে প্রতারণা করবার উদ্দেশ্যে চিত্রের পটভূমিকে অস্পষ্ট বা আব্‌ছায়া করে ঢেকে ফেলবার জন্ত জালি পরদা, ধোঁয়ায় আবরণ এবং গাছপালা কেটে এনে বসাবার কৌশলও চলচ্চিত্রের প্রভূত সাহায্যে এসেছে! নইলে আজ চিড়িয়াখানার পশুদের নিয়ে জঙ্গলের ছবি দেখানো সম্ভব হ'তনা।

স্বতন্ত্র অভিনেত্রী ডোলোরেস্ ডেলরিও

চলচ্চিত্রের চাতুরী

ছায়াধরযন্ত্রের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে সহজে প্রতারিত করা যায় না। তাই চলচ্চিত্রের অভিনেতাদের রূপসজ্জায় সবিশেষ সতর্ক হ'তে হয়। মঞ্চসজ্জাকরও দৃশ্যপটে কোথাও ফাঁকি বা গোঁজামিল দিতে সাহস করেন না। ক্যামেরার সামনে এ পর্য্যন্ত তাই যা কিছু সমস্তই যথাসাধ্য স্বাভাবিক করে তোলবার প্রয়াস চলে আসছে। কিন্তু, যখন প্রয়োজনের তাগিদ আসে, তখন মানুষের বুদ্ধি তার সৃষ্ট এই যন্ত্রটিকে ঠকাবার জন্য চেষ্টার ত্রুটী করেনা। চেষ্টার অসাধ্য কিছু নেই। কাজেই এ বিষয়ে অপ্রত্যাশিত সাফল্য লাভ করে সে এখন এই চাতুরীতে এমন সুদক্ষ হয়ে উঠেছে যে ছায়াধরযন্ত্রের দৃষ্টি এখন ছায়াধরযন্ত্রীর সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীনে এসেছে।

চাতুরী কৌশলে চলচ্চিত্রে আজ এমন সব ঘটনার সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ প্রদর্শিত হ'চ্ছে যা দর্শকের দৃষ্টিতে সত্যরূপে প্রতিভাত হ'য়ে বিস্ময়ে ও আনন্দে তাদের অভিভূত করে দিচ্ছে! চাতুরী চলচ্চিত্রের আজ শুধু একটা প্রধান সহায় ও সম্পদই নয় একটা প্রধান আকর্ষণও বটে! 'রঙ্গমঞ্চ' এ সব সুযোগ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ব'লে দর্শকের ভিড় আজ নাট্যশালার দুয়ার অপেক্ষা ছবিঘরের দরজাতেই বেশী দেখতে পাওয়া যায়!

রঙ্গমঞ্চের অভিনয় দর্শকের দৃষ্টির সম্মুখে হয়; কিন্তু চলচ্চিত্রের অভিনয় হয় ক্যামেরার দৃষ্টির সম্মুখে। রঙ্গমঞ্চে দর্শক যা' দেখে তা' সে তা'র নিজের চোখেই দেখে, কিন্তু চলচ্চিত্রে সে যা দেখে তা' ক্যামেরার দৃষ্টির অধীন হ'য়ে তা'কে দেখতে হয়। কাজেই পরিচালক তার আপন আয়ত্তাধীন ছায়াধরযন্ত্রের দৃষ্টিকে প্রতারণা দ্বারা দর্শককে যথেচ্ছা প্রতারিত ক'রতে পারে। মেলিজ নামে একজন ফরাসী যাদুকর (M. Melies) সর্ব্বপ্রথম ছায়াচিত্রে ভেল্কী দেখিয়ে দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছিলেন। তারপর ইংরাজ প্রযোজক রবার্ট পল মেলিজের ছবির জনপ্রিয়তা দেখে এ বিষয়ে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। চলচ্চিত্রের প্রথম যুগে এই ম্যাজিকের ছবি ছায়াভিনয়ের চিত্র-সূচীর একটা প্রধান অঙ্গ ছিল। ক্রমে, চলচ্ছবির উন্নতি ও অগ্রসরের সঙ্গে সঙ্গে সেই আদিকালের 'যাদু ছবি' ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হয়েছে বটে—কিন্তু, সেই সব ছবি তোলার অনেক কূট-কৌশল আজকের পরিচালকেরাও প্রয়োজন মত মাঝে মাঝে একাধিক চিত্রে ব্যবহার করেন।

চলচ্চিত্রের প্রত্যেক চাতুরীর পরিচয় দিতে গেলে একখানি পৃথক বই লিখতে হয়, তাতেও কিন্তু সব কিছু বলা সম্ভব নয়; কারণ চলচ্চিত্রের প্রয়োগশালায় নিত্য নূতন নূতন কৌশল উদ্ভাবিত হচ্ছে নানা ছবির পৃথক পৃথক ঘটনা ও ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনের প্রবল তাড়নে। এর কোথাও যে কোনোদিন পূর্ণচ্ছেদ পড়বে এ সম্ভাবনা একেবারেই নেই। অতএব, এখানে

চলচ্চিত্রের এমন কয়েকটি প্রধান চাতুরীর উল্লেখ করলেই হবে—যে গুলিকে ভিত্তি করেই অধিকাংশ চাতুরীর রকমফের করা সম্ভব হয়েছে। আলোকচিত্র গ্রহণের নানা কৌশলেই চলচ্চিত্রের চাতুরী বেশীর ভাগ নিষ্পন্ন হয়। পূর্ব্বে যে 'বিকাশ' 'বিলোপ' 'অন্তর্দ্ধান', 'বিলয়' প্রভৃতি ছায়াধর যন্ত্রের কতকগুলি কৃতিত্বের উল্লেখ করেছি, সেগুলি সমস্তই চলচ্চিত্রের এই চাতুরী বিভাগের অন্তর্গত। এই গুলিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সময়ের তারতম্য ঘটিয়ে মাথা খেলিয়ে ব্যবহার করতে পারলে চলচ্চিত্রকে যে কত সুন্দর ও রহস্যময় ক'রে তুলতে পারা যায়, তার পরিচয় আজ হোলিউডের একাধিক প্রসিদ্ধ পরিচালক তাঁদের অনেক ছবিতে দেখিয়ে দিয়েছেন ও এখনও দিচ্ছেন।

ক্যামেরার চোখ চাপা দিয়ে যে ছবিতে কত অসংখ্য চাতুরী খেলা হয় দর্শকেরা তার কোনো সন্ধানই পান না। পুরাণো ছবির স্মৃতি যাঁদের স্মরণ আছে তাঁরা ব'লতে পারবেন সেদিন কত বিস্মিতই না তাঁরা হ'য়েছিলেন যখন দেখেছিলেন তাঁদের চোখের সামনেই ছবির নায়ক হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল! যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল সে! কিম্বা হয়ত' মাটীর মধ্যে ঢুকে গেল! সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে খানিকটা ধোঁয়া এবং আগুনের শিখা বেরিয়ে এল! অথবা, জলজ্যান্ত মানুষটা চট ক'রে হয়ত গাধা বনে গেল! অজগর সর্প হয়ে গেল এক অনিন্দ্য-সুন্দরী রাজকুমারী।

এগুলো দেখ্‌তে যতটা বিস্ময়কর, দেখানো কিন্তু ততটা কঠিন নয়। ক্যামেরার কারচুপি যত রকম আছে তার মধ্যে এই চালাকীটুকুই সব চেয়ে সহজ সাধ্য। যাকে উড়িয়ে দিতে হবে—মুহূর্ত্তের জন্য ক্যামেরার চোখ চেপে ধ'রে তাকে দৃশ্যপটের মাঝখান থেকে বিদ্যুৎবেগে সরিয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরার কাজ আবার সুরু করে দেওয়া হয়। মাটীর ভিতর ঢুকে গেল দেখাবার সময় নায়ক একটি বার লাফ দিয়ে পড়ে মাটীর উপর, পড়বাত্রই সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরা বন্ধ করা! ধোঁয়া এবং অগ্নিশিখা দেখাবার প্রয়োজন হ'লে সেই মুহূর্ত্তে সেখানে একটা বারুদের খুরি বাজী জ্বেলে দেওয়া দরকার, তারপর, নিমেষের মধ্যে ক্যামেরা আবার তার কাজ সুরু করে দেয়।

যেখানে মানুষটিকে হঠাৎ গাধা বা উল্লুকে রূপান্তরিত করবার প্রয়োজন থাকে সেখানে ক্যামেরা থামিয়ে লোকটি দৃশ্যপটের যে অংশ থেকে সরে যায়, ঠিক সেই স্থানে সেই পরিবর্ত্তনীয় জীবটিকে তৎক্ষণাৎ স্থাপন করে ক্যামেরার কাজ আরম্ভ ক'রতে হয়। আর যদি হঠাৎ পরিবর্ত্তন না হ'য়ে ধীরে ধীরে ব'দলে যাচ্ছে দেখাতে হয়, যেমন ধরুন এক অশীতিপর বৃদ্ধা তার বিগত যৌবনের সুখস্মৃতি ধ্যান করতে করতে হয়ত আস্তে আস্তে চোখের সামনে সুন্দরী তরুণী হ'য়ে উঠলো,—কিম্বা একজন জীবন্ত মানুষ দেখতে দেখতে পাষাণ প্রতিমূর্ত্তিতে রূপান্তরিত হয়ে গেল! অথবা, শিল্পীর সৃষ্ট শিলারূপ ক্রমে ক্রমে প্রাণময়ী হ'য়ে উঠলো!—এ সব দেখাবার জন্য সেই 'বিকাশ' ও 'বিলয়' আদি কৌশলের সাহায্য নিতে হয়। যে মূর্ত্তিটি ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হ'চ্ছে তার সঙ্গে সঙ্গে সমান তালে ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তনীয় মূর্ত্তিটির 'বিকাশ' ঘ'টছে—একই সময়ে একসঙ্গে এই উভয় বিধ চিত্র লওয়ার কৌশলে পর্দ্দার উপর অনেক অঘটন সংঘটন করিয়ে দর্শকদের তাক্ লাগিয়ে দেওয়া যায়!

কিছুদিন পূর্বে একখানি ফরাসী ছবিতে দেখা গেছ্লো একজন ঘুমকাতুরে লোক যেখানে সেখানে ঘুমিয়ে পড়ছে! একদিন সে পথে যেতে যেতে রাস্তায় ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমন্ত অবস্থায় তার পায়ের উপর দিয়ে চলে গেল একখানা গাড়ী। লোকটি ঘুম ভেঙে চোখে চেয়ে দেখলে তার দু'খানি পা'ই কাটা গেছে! একেবারে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে! সেই সময় যাচ্ছিল সেই পথে তার এক পরিচিত ডাক্তার! লোকটি পা'দুখানি তুলে ইসারা করে তাকে ডেকে দেখিয়ে দিলে নিজের অবস্থা! ডাক্তার কাছে এসে ব্যাপার দেখে, ক্ষণকাল চেষ্টা করে তার ছিন্ন পাদু'খানি জুড়ে দিলে। সে লোক তখন পথশয্যা পরিত্যাগ করে উঠে চলে গেল!

ব্যাপারটা দেখতে যতটা রহস্যজনক, কাজে কিন্তু তা' নয়। দুখানি নকল পা' আর একজন ছিন্নপদ লোক, এবং ক্যামেরা কৌশলের সাহায্যে সহজেই যে কোনো অভিনেতার এ রকম ছবি তোলা যায়। যতক্ষণ অভিনেতা চলে আসে, পথে শুয়ে পড়ে এবং ঘুমোয় ততক্ষণ ক্যামেরা চলতে থাকে—গাড়ী এসে তার পায়ের কাছে পৌঁছলে, ক্যামেরাও থামে। অভিনেতার আসল পা তখন পিছনে গুটিয়ে রেখে কিম্বা সেই পা'কাটা লোকটিকে এখানে শুইয়ে দিয়ে একটু তফাতে নকল পা' সাজিয়ে দেওয়া হয়; গাড়ী চলে যায় সেই নকল পাদুখানিকে যেন বিচ্ছিন্ন ক'রে দিয়ে! ক্যামেরা ঠিক সেই সময় আবার ছবি নিতে সুরু করে, ডাক্তার আসে, নকল পা জুড়ে দেয়, ক্যামেরা বন্ধ করা হয়। তখন নকল পা সরিয়ে অভিনেতা আসল পা বার ক'রে রাখে, কিম্বা সেই পা'কাটা লোকটিকে সরিয়ে দিয়ে অভিনেতা নিজে এসে শোয়। ক্যামেরা আবার চলে, দর্শকে দেখে লোকটির কাটা পা' আবার জোড়া লেগে গেছে! সে তখন ধূলো ঝেড়ে রাস্তা থেকে উঠে আবার চলতে সুরু করে।

নকল পা' কেন, অনেক ছবিতে একটি বা একাধিক আস্ত নকল মানুষও ব্যবহার ক'রতে হয়। ধরুন একখানি ছবিতে দেখা গেল হোটেলের দশতলা বা বারো তলা উপরে একঘরে এক তরুণ দম্পতী মিলন সুখে দিন যাপন ক'রছে। সেই হোটেলে একটা দুর্দ্দান্ত বদমায়েস্ এসে ঢুকলো। সুন্দরী তরুণীকে দেখে মুগ্ধ হ'ল। তাকে প্রলোভন দেখিয়ে ভুলিয়ে নিতে চেষ্টা করলে! কিন্তু অকৃতকার্য্য হ'য়ে শেষে বলপ্রয়োগে কার্য্যোদ্ধার ক'রতে প্রস্তুত হ'ল। গভীর রাত্রে তাদের শয়ন কক্ষে গিয়ে প্রবেশ করলে, ঘুমন্ত মেয়েটাকে টেনে তুলে নিতে গেল মেয়েটির আর্ত্তস্বরে স্বামীর ঘুম ভেঙে গেল! লাগলো দুজনে দাঙ্গা,—চল্লো ধ্বস্তাধস্তি! গুণ্ডা প্রকৃতির ষণ্ডা লোকটির দেহে অসুরের মত শক্তি! ছেলেটাকে সে ঠেলে নিয়ে চললো একেবারে খোলা জানলার ধারে; তারপর, প্রবল ধাক্কা মেরে ফেলে দিলে সেই খোলা জানালা দিয়ে তাকে বারো তলার উপর থেকে একেবারে নীচেয়! জানালার ধার পর্য্যন্ত গিয়ে ক্যামেরা থামে। তখন আসল মানুষটিকে সরিয়ে গুণ্ডার হাতের মধ্যে নকল মানুষটিকে দেওয়া হয়। ক্যামেরা চলতে থাকে। জানালা থেকে নীচে পড়ে যায় সেই নকল তৈরী মানুষটি! আবার ক্যামেরা থামে। নকল মানুষটি যেখানে পড়ে সেখানে থেকে সেটিকে সরিয়ে সেই ভাবে সেখানে আসল লোক এসে শোয় তখন ক্যামেরা আবার চলতে থাকে।

চায়ের ডিশ্ কাপ, জলের গেলাস, বা টেবিলের উপর ঘড়ী, ফুলদান, দোয়াত, কলম ইত্যাদি সহসা লাফালাফি সুরু করে দিয়েছে এমন অনেক ছবিতে দেখা যায়। খোকা ঘুমিয়েছে; ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন দেখছে যেন তার খেলাঘরের কাচের পুতুলগুলো হঠাৎ জীবন্ত হয়ে উঠে নড়ে চড়ে বেড়াতে সুরু করেছে, পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করছে—ইত্যাদি, ফুলদানীতে সাজানো ফুলগুলো হঠাৎ গাছে ফিরে যাবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠে ফুলদানীর ভিতর থেকে এক একটা করে লাফিয়ে উঠে এসে চলে যেতে সুরু করলে—এ সমস্তই ক্যামেরা কৌশলে দেখানো সম্ভব হয়েছে। প্রতি সেকেণ্ডে ষোলখানি করে ছবি তুললে তার গতি পর্দ্দার উপর দর্শকের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ সহজ ও স্বাভাবিক দেখায় কিন্তু ক্যামেরার গতি স্তম্ভনের (Stop Motion) দ্বারা যদি প্রতি সেকেণ্ডে কোনো কিছুর আট, চার. দুই বা একখানি ক'রে মাত্র ছবি নিয়ে ফিল্ম তোলা হয়, তাহলে সে ছবি পর্দ্দার উপর এমন সব কাণ্ড কারখানা বাধাবে যে দর্শকের চোখে সমস্তই ভূতুড়ে ব্যাপার বলে মনে হবে! এইরকম ছবি তোলবার সময় প্রত্যেক চিত্রের ছায়াগ্রাহ (Exposures) সংখ্যার ব্যবধান কমিয়ে বাড়িয়ে যাকিছুর ছবি নেওয়া হবে তারই গতি পর্দ্দার উপর হাস্যকর ভৌতিক বা অদ্ভুত দেখাবে।

জড় পদার্থ নিয়ে এই ধরণের একখানি সুসঙ্গত ও অর্থপূর্ণ এবং চিত্তাকর্ষক ছবি তোলা অত্যন্ত ধৈর্য্য পরিশ্রম ও সময়-সাপেক্ষ। প্রত্যেকবার প্রত্যেক জিনিসটির এক একখানি করে ছবি নেওয়া, ছবি নেবার পূর্ব্বে প্রত্যেকবার জিনিসটির অবস্থান ঈষৎ পরিবর্ত্তন ক'রে দেওয়া এবং এমন ভাবে শেষ পর্য্যন্ত তাকে নিয়ে যাওয়া যে পর্দ্দায় এ ছবি দেখবার সময় এর অন্তরালে যে মানুষের হাত আছে এরূপ সন্দেহ মাত্রও যেন দর্শকের মনে না উঠতে পারে!

কার্টুন বা ব্যঙ্গ কৌতুকের চিত্র, পাষাণ মূর্ত্তি সজীব হয়ে উঠা, পুতুলের প্রাণলাভ প্রভৃতি ছবি এই ভাবেই তোলা হয়! চিত্র পরিচয়ের প্রত্যেক হরফটি কত রকম কায়দা করে ডিগবাজী খেয়ে নেচে ঘুরে উড়ে যে যার যথাস্থানে এসে বসে, তখন লেখাটি সম্পূর্ণ দেখা যায় এবং উদগ্রীব দর্শকেরা পড়তে পেরে নিশ্চিন্ত বোধ করে। এও ঐ একই কৌশলে সাধিত হয়।

চিত্রগ্রাহ কালে গতিস্তম্ভন উদ্ভাবিত হবার পর চলচ্চিত্রের আর একটা মস্ত সুযোগ হয়েছে এই যে—ছবিতে দ্রষ্টব্য ঘটনার সময় সঙ্ক্ষেপ করা এখন ছায়াধরযন্ত্রীর সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। যেমন ধরুন একটি গোলাপ গাছে কুঁড়ি ধরলো, সেটি ক্রমে বড় হ'ল, তারপর ধীরে ধীরে দিনে দিনে প্রস্ফুটিত হ'য়ে উঠলো! প্রকৃতপক্ষে যে কোনো গোলাপ বাগেই এটা ঘটে কয়েক সপ্তাহ ধ'রে! কিন্তু, এ ব্যাপার চলচ্চিত্রে আমরা কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘটতে দেখি! কারণ, চলচ্চিত্র গোলাপ ফুলের বিভিন্ন অবস্থার পরের পর একখানি করে ছবি নেয় হয়ত দশ মিনিট পনেরো মিনিট বা আধঘণ্টা একঘণ্টা অন্তর। কিন্তু, পর্দ্দার উপর দেখাবার সময় সে ছবি ঠিক বিধি নির্দ্দিষ্ট সময়ানুপাতেই প্রদর্শন করা হয়; কাজেই ছবিতে ঘটনার সময়ও সহজেই সঙ্ক্ষেপ হ'য়ে যায়। একটা অট্টালিকা কি ভাবে নির্ম্মিত হয় সেও চলচ্চিত্রে এই উপায়েই দেখানো যায়।

একতাল মাটি আপনা আপনি নড়ে চড়ে গড়ে উঠলো একটি সুন্দর মূর্ত্তি হ'য়ে! এ দেখে

কে না অবাক হয়। কিন্তু, এ ছবিও দেখানো হয় উপরোক্ত ক্যামেরাকৌশলে। প্রথমে একতাল মাটিকে মূর্ত্তিশিল্পী একটু একটু করে টিপে ধীরে ধীরে রূপ দেন। মাটির এই ক্রম পরিবর্ত্তনের ছবি প্রত্যেক বার ক্যামেরায় তুলে নেওয়া হয়, কিন্তু শিল্পীকে প্রতিবারই ক্যামেরার সামনে থেকে সরিয়ে দিয়ে! তারপর মূর্ত্তি শেষ হয়ে গেলে ছবিখানি দাঁড়ায়—একতাল মাটি যেন আপনা আপনি গড়ে উঠলো একটি সুন্দরীর মূর্ত্তি হয়ে। এ ছবি আর একভাবে আরও সহজে তোলা সম্ভব হয়েছে চিত্রপত্রী উল্টোদিক থেকে দেখাবার কৌশল আবিষ্কার হওয়াতে! অর্থাৎ, ছবিখানি যেখানে শেষ হ'ল, পর্দ্দায় ফেলে দেখাবার সময় তাকে ঘুরিয়ে নিয়ে সেই শেষদিক থেকেই সুরু করে দেখিয়ে যাওয়া! ফলে, যেখানে ছবি তোলা আরম্ভ হ'য়েছিল সেইখানে এসে এ ছবি শেষ হয়! এ ক্ষেত্রে কাঁচামাটির একটি মূর্ত্তি আগে গড়ে শেষ করে নিয়ে তারপর ছবি তোলা সুরু হয়। প্রত্যেকবার সেই মূর্ত্তিটির যেমন এক একখানি ছবি নেওয়া হয় অমনি সঙ্গে সঙ্গে মূর্ত্তিটির কাঁচা মাটি খানিকটা পিটে থেব্‌ড়ে দেওয়া হয়। এইভাবে তুলতে তুলতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্তটাই একটা মাটির তাল হ'য়ে দাঁড়ায়! ছবি তোলাও শেষ হয়। তারপর এ ছবি পর্দ্দায় ফেলে দেখাবার সময় উল্টে নিয়ে এই শেষ দিক থেকেই প্রথম দেখানো সুরু করা হয়, ফলে দর্শকেরা দেখে একতাল মাটি ধীরে ধীরে একটি মূর্ত্তি হয়ে গড়ে উঠলো! ঠিক এই ভাবেই একটি তৈরী বাড়ী যখন ভাঙা হয় তার ক্রমশ ছবি তুলে নিয়ে তারপর পর্দ্দায় সে ছবি ঘুরিয়ে যদি শেষ থেকে সুরু করে দেখানো হয়—তাহলে দর্শকেরা দেখবে ইট পাথর দরজা জানলা আপনা আপনি এসে যে যার যথাস্থানে বসে একখানি বাড়ী তৈরী হয়ে গেল!

আলোকচিত্রকরের রসায়নাগার এই সব রহস্যময় চিত্র পরিস্ফুটনে প্রয়োগশালাকে প্রচুর সাহায্য করে। পূর্ব্বে যখন একই ক্যামেরার সাহায্যে একই ছায়াপত্রীর উপর দ্বিপাতন (Double Exposure) চিত্র গ্রহণের সদুপায় ছিল না, তখন দুটি ছবি পৃথক পৃথক তুলে নিয়ে পরে রসায়নাগারে সে ছবি দু'খানিকে অতি সতর্কতার সঙ্গে একখানি সমপত্রীর (Positive Film) উপর ছেপে নিতে হ'ত। যেমন ধরুন কোনো ছবিতে আছে—তার প্রাণাধিক প্রিয়তমাকে হারিয়ে জনৈক লোক প্রাণের জ্বালা ভোলবার জন্য মদ খেতে সুরু করেছে। কিন্তু, হঠাৎ দেখলে যেন তার মদের বোতলের মধ্যে তার প্রণয়িনী দাঁড়িয়ে হাসছে! এ ছবি তোলবার জন্য প্রথমে—মদের বোতল নিয়ে তারই দিকে অবাক হ'য়ে চেয়ে লোকটা ব'সে কি যেন দেখছে এর একটা 'সন্নিধ চিত্র' (Closeup) নেওয়া হ'ত, তারপর নেওয়া হ'ত তার প্রণয়িনীর ছবি। বোতলের আকারের অনুপাতে যাতে আসে ক্যামেরা থেকে ততদূরে তাকে সরিয়ে দাঁড় করিয়ে ছবি তোলা হ'ত। তারপর সেই দু'খানি বিষম ছায়াপত্রী (Negative) নিয়ে রসায়নাগারে একখানি সমপত্রীর উপর এমনভাবে ছাপা হ'ত যাতে সেই প্রণয়িনীর ছবি ঠিক বোতলের মধ্যে দেখা যায়! আজকাল, দোডালা (Double disc) ক্যামেরা উদ্ভাবিত হওয়ায় দ্বিপাতন চিত্র নেওয়া অত্যন্ত সহজ হয়ে গেছে। একই ছায়াধর যন্ত্রের সম্মুখে একই চিত্রে একজন অভিনেত্রীর পক্ষে—মা ও মেয়ের যুগ্ম ভূমিকা অথবা যমজ ভগ্নীদ্বয়ের অংশ নিয়ে আগাগোড়া অভিনয় করা সম্ভব হ'য়েছে। কারণ এতে

ইচ্ছামত বিষম ছায়াপত্রীর (Negative) প্রত্যেক চিত্রাংশের অর্দ্ধেকটা মাত্র ব্যবহার করে অপরাংশ অক্ষত রাখা যায় এবং পরে আবার তাকে প্রথম কাঠিমে (Reel) গুটিয়ে নিয়ে অক্ষত অংশে পুনরায় ছবি তোলা চলে !

জলের ভিতরের ছবি দেখাবার জন্য আজও রসায়নাগারের সাহায্য নিতে হয়। আকাশের —মেঘবৈচিত্র্য এবং ধূমজ্যোতি প্রভৃতির ছবিও রসায়নাগার সরবরাহ করে! অর্থাৎ, জলের বা মেঘের বিষমপত্রী আগেই নেওয়া থাকে, পরে যিনি জলদেবী বা মেঘপরী অভিনয় করেন তিনি প্রয়োগশালায় ডাঙ্গার উপর শুয়েই হাত পা ছোঁড়েন, ক্যামেরায় উপর দিক থেকে তাঁদের ছবি নেওয়া হয়, তারপর সেই ছবি জলের ছবির সঙ্গে বা আকাশের মেঘের উপর—যে ক্ষেত্রে যেমন প্রয়োজন সেই মত একই সমপত্রীর উপরে একত্রে ছেপে নেওয়া হয়। ঠিক এই ভাবেই ছবির উপর চিত্রপরিচয় ও (Titles) ছাপা হয়।

ছায়াপত্রী উল্টে নেওয়ার মত আবার ক্যামেরা উল্টে নিয়ে যে ছবি তোলা হয় তার ফল আরও অদ্ভুত! এতে ছবি তোলবার সময় স্বাভাবিক ছবিই ওঠে কিন্তু সে ছবি পর্দ্দায় দেখাবার সময় দেখা যায় বিপরীত ব্যাপার! ঝর্ণা পাহাড় থেকে নেমে যাচ্ছে দেখায় জলস্রোত পাহাড় বেয়ে উপরে উঠছে! সাঁতারু ক্রীড়ামঞ্চ থেকে পুষ্করিণীতে ঝাঁপ খাচ্ছে— দেখায়—সাঁতারু পুষ্করিণী থেকে লাফিয়ে ক্রীড়ামঞ্চে উঠছে। এই উপায় উদ্ভাবিত হবার পর হাস্যরসের চিত্র নানা দিক দিয়ে পরিপুষ্ট হ'য়েছে!

চিত্রে কোন যানবাহন বা মনুষ্যকে বিদ্যুৎবেগে ছুটে চলেছে দেখানোর সহজ উপায় হ'চ্ছে প্রতি সেকেণ্ডে ষোলখানা ছবির পরিবর্ত্তে প্রতি সেকেণ্ডে দশখানা বা বারোখানা করে ছবি তুলতে হয়। সেই ছবি যখন প্রক্ষেপণ যন্ত্রের ভিতর দিয়ে পর্দ্দার উপর যথানিয়মে গিয়ে পড়ে তখন যে মানুষ চ'ল্‌ছিল ধীরে তাকে দেখায় যেন বিদ্যুৎগতি সম্পন্ন!—

মোটরবাইক বা মোটরগাড়ী ভীমবেগে দেয়াল ভেঙে ফুটো করে বেরিয়ে গেল; বা প্রাণভয়ে পলাতক কেউ ছাদের উপর লাফিয়ে পড়ে ছাদ ফুঁড়ে মেঝে ফুটো হয়ে একেবারে নীচের তলায় গিয়ে পড়লো! এসব দেখানো হয় অতি নিরাপদ অবস্থায়! প্রয়োগশালার মধ্যেই এমনভাবে কাঠের ইট সাজিয়ে আল্‌গা ক'রে দেওয়ালের এক অংশ গেঁথে রাখা হয় যে সামান্য ধাক্কা লাগলেই সেই অংশ ভেঙে পড়ে গিয়ে দেয়াল যেন ফুটো হয়ে গেল এমনি দেখায়। ঘরের মেঝেও তাই; তবে লোকটি যখন দোতলা থেকে একতলায় পড়ে, তখন প্রয়োগশালায় মাত্র সে চার ফুট কি ছ'ফুট নীচেয় লাফিয়ে পড়ে, কিন্তু ক্যামেরা কৌশলে এমনভাবে ছবি নেওয়া হয় যে দর্শকেরা দেখে সে একতলা থেকে দোতলায় লাফিয়ে পড়লো! পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই দু' একখানা বরগা, খানিকটা কার্ণিশ এক আধখানা টালি খানিকটা চূণ বালি যেন খসে পড়ল এই স্বাভাবিকতাটুকু দেখাতে ষ্টুডিয়োসহকারীর অদৃশ্য হস্ত সেই মেঝের গর্ত্ত দিয়ে তৎপরতার সঙ্গে সেগুলি ফেলে দেয়। কাজেই, ছবিতে দৃশ্যটি একেবারে সত্য ও বাস্তব ঘটনা ব'লে মনে হয়।

অনেক সময় ছবিতে দেখা যায় মোটর নিয়ে ছুটে পালাচ্ছে কেউ, আর কেউ তার পশ্চাদ্ধাবন ক'রছে আর একখানি মোটরে। দু'খানি গাড়ীই এমন বিদ্যুৎবেগে ছুট্‌ছে যে

আশে পাশের দৃশ্য যেন চক্ষের পলকে মিলিয়ে যাচ্ছে! ছোটারও তাদের অন্ত নেই! ছুটছে দুখানা গাড়ী বেশ দেখা যায় কিন্তু কোথা দিয়ে যে ছুটছে বোঝা যায় না! এ ক্ষেত্রে প্রায়ই প্রয়োগশালায় একটি চক্রাকার পাটাতন নির্ম্মাণ করা হয়। তার উপর দু'খানি গাড়ী চড়িয়ে দিয়ে বেগে চক্রটি ঘোরানো হয়—ক্যামেরা স্থির হ'য়ে তার ছবি নেয়। অভিনেতারা গাড়ীর মধ্যে ব'সে খুব জোরে গাড়ী চালানোর অভিনয় করে মাত্র! যে চিত্রে পথের দুধারের দৃশ্য গাড়ী চলার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের ভাল করে দেখাবার প্রয়োজন থাকে সে স্থলে একখানি মোটরের সঙ্গে আর একখানি মোটর এমনভাবে দড়ী বা চেন দিয়ে বাঁধা হয় যাতে ক্যামেরার চক্ষে সেই বন্ধনরজ্জু অদৃশ্য থাকে। সামনের গাড়ীখানিতে ক্যামেরা নিয়ে ছায়াধর যন্ত্রী থাকেন হুডের দিকে মুখকরে পিছনের গাড়ীর ছবি নেবার জন্য; পিছনের গাড়ীখানিকে সেইসময় সামনের গাড়ীখানি পথ দিয়ে টেনে নিয়ে যেতে থাকে।

রেল ও মোটর সংঘর্ষ যা দেখে দর্শকের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, তাতে ব্যবহার করা হয় একখানি বাতিল গাড়ী ও কয়েকটি নকল মানুষ! গাড়ীখানিকে এমন সময় চালিয়ে রেলের উপর ছেড়ে দেওয়া হয় যে ট্রেনের ইঞ্জিন ঠিক সময়ে এসে তার উপর ধাক্কা মেরে চূর্ণ ক'রে দিয়ে যায়! ইঞ্জিন চালকের সঙ্গে অবশ্য পূর্ব্ব হ'তেই বন্দোবস্ত থাকে! গাড়ীখানি যখন রেললাইনের নিকটস্থ পথ দিয়ে চলতে থাকে তখন সে গাড়ীতে সত্যকার লোকজন থাকে, তারপর গাড়ী যখন ক্রমশঃ রেললাইনের কাছে গিয়ে পড়ছে এবং দূরে ট্রেণ আস্‌ছে দেখা যাচ্ছে—তখন ক্যামেরা থামিয়ে লোকজনেরা নেমে পড়ে এবং নকল মানুষগুলিকে তাদের আসনে সেইভাবে বসিয়ে দিয়ে গাড়ী ছেড়ে দেয়—ক্যামেরাও চলতে থাকে। তারপর—গাড়ীর সঙ্গে ট্রেণের সংঘর্ষ হবার ফলে—গাড়ী চুরমার হয়ে গেলে তখন আবার ক্যামেরা থামিয়ে নকল লোকগুলোকে সরিয়ে ফেলে আসল মানুষেরা গিয়ে কেউ চাকার তলায়, কেউ বা হুডের নীচেয়, কেউবা র‍্যাডিয়েটারের পাশে, কেউ বা সীটের ভিতর—কেউ বা ষ্টীয়ারিং হুইল ধ'রে মৃত ও অর্দ্ধমৃত এবং ক্ষতবিক্ষত ও রুধিরাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে! তখন ক্যামেরা আবার চলতে সুরু হয় এবং এদের অবস্থা ও দূরে ট্রেণখানি বেরিয়ে যাচ্ছে দেখা যায়! দর্শকের চক্ষে তখন এই ট্রেণ-কলিসন্' প্রত্যক্ষ সত্য হয়ে ওঠে!

ছবিতে কারাকক্ষের মোটা মোটা লৌহদণ্ড ভীম বলে বেঁকিয়ে ফেলে দুর্দ্দান্ত দস্যু যখন পলায়ন করে তখন দর্শকেরা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না যে সেগুলো নীরেট ষ্টীল্‌রড্‌ নয়—টিনের ফাঁপা নল মাত্র। গ্যাসপোষ্ট্ যখন ধাক্কা খেয়ে আধখানা ভেঙে ঝুলে পড়ে তখন দর্শকের মনে এ সন্দেহ হয় না যে ওটা তৈরী হয়েছিল ঐরকম মধ্যে কব্জা দিয়ে দু'ভাগ করে!

কাগজের শিশি-বোতল, কাগজের ডিশ বাটি; ন্যাকড়ার মুগুর, পিসবোর্ডের বর্ম্ম চর্ম্ম, রাংতার ছোরা ছুরি, টিনের তরবারি, কাঠের কামান প্রভৃতি রঙ্গমঞ্চের অনেক নকল সরঞ্জাম নকলহীরা মুক্তায় তৈরী জড়োওয়ার অলঙ্কার, স্বর্ণমুকুট, সিংহাসন প্রভৃতি বহু আসবাব প্রয়োজন মত চলচ্চিত্রে চলেছে!

একটা শহরের বা পল্লীর সম্পূর্ণ রূপ সুদক্ষ শিল্পী দৃশ্যপটের উপর এমন সুন্দর এঁকে দেয় যে

আলোকচিত্র গ্রহণের কৌশলে পর্দ্দার উপর তা হুবহু সত্য হ'য়ে ওঠে! বিশতলা একবাড়ীর ছাদের উপর থেকে আর একবাড়ীর ছাদের উপর লাফিয়ে যাওয়া—এক পর্ব্বতশৃঙ্গ হ'তে আর এক পর্ব্বতশৃঙ্গে খরস্রোতা নদী লঙ্ঘন করে পৌঁছানো এ সমস্তই চিত্রগড়ের চত্বরে বিছানো নকল দৃশ্যপটের উপর নিরাপদ অভিনয় মাত্র! ছায়াধরযন্ত্রে মাথার উপর দিক থেকে এর ছবি নেওয়া হয়। এমনিতর অসংখ্য চাতুরী চলচ্চিত্রের দর্শককে প্রতি চিত্রেই প্রতারিত করে।

কৌতুক চিত্র

চলচ্চিত্রে যে সজীব 'কার্টুন' বা কৌতুকচিত্র আজকাল দর্শকদের বিশেষ উপভোগ্য হ'য়ে উঠেছে সেই 'মিকী মাউস্' জাতীয় কার্টুন ছবি একখানি তৈরী করবার জন্য শিল্পীকে হাজার হাজার চিত্র আঁকতে হয়। তার প্রত্যেকখানিই বিভিন্ন ভঙ্গীর পৃথক পৃথক ছবি হওয়া চাই। সেইগুলিকে নিয়ে একটির পর একটি আবার ক্যামেরার সামনে সাজিয়ে একখানি ছায়াপত্রীতে পরের পর তুলে নিতে হয়। এইভাবে একখানি সজীব কৌতুক-চিত্র তৈরী করতে অটুট ধৈর্য্য, দীর্ঘ সময় এবং বহু পরিশ্রমের প্রয়োজন। কিন্তু, ছবিখানি যখন পর্দ্দার উপর দেখানো হয় তখন মাত্র পনেরো কুড়ি মিনিটের বেশী সময় লাগে না।

কৌতুকচিত্রের একটা আদ্যোপান্ত ঘটনাবলী মাথায় আনতে পারলেই ছবি আঁকা অনেক সহজ হয়ে যায়। সর্ব্বাগ্রে চাই চিত্রকরের উর্ব্বর মস্তিষ্কের এই পরিকল্পনা!—যেখানে তাঁর ধ্যানদৃষ্টির সম্মুখে পরের পর অসংখ্য ছায়া ফেলে উদয় হবে একটি যোগসূত্র অবলম্বনে একখানি অখণ্ড ছবি! ব্যঙ্গ-পটের একটা পরিকল্পনা মাথায় এলেই শিল্পী কাজ সুরু করে দেন। সে কাজ একেবারে বিধি-নির্দ্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ। কেবল মাঝে মাঝে শিল্পীকে মাথা ঘামাতে হয় যদি কোনো উপায়ে ছবির সংখ্যা কমিয়ে পরিশ্রম লাঘব করা যায় বা কোনো নূতন প্যাঁচ কোথাও ঢুকিয়ে দিয়ে ছবিখানিকে অধিকতর চিত্তাকর্ষক ক'রে তোলা যায়!

শিল্পীর ছবি আঁকা শেষ হ'লে তখন ছায়াধর যন্ত্রীর হাতে গিয়ে পড়ে সেগুলি। পূর্ব্বেই বলেছি একখানি সজীব ব্যঙ্গ-পটের জন্য শিল্পীকে হাজার হাজার ছবি আঁকতে হয়, কারণ প্রথমতঃ গল্পটি তাঁকে ছবিতে বোঝাতে হয় বলে গল্পের পরের পর বিবিধ ঘটনার পৃথক পৃথক অনেক ছবি আঁকতে হয় তাঁকে, তারপর আবার সেই প্রত্যেক ঘটনার প্রত্যেক চিত্রগুলিকে সজীব করে তোলবার জন্য গতি-ভঙ্গীর ক্রমানুসারে—অর্থাৎ, ছবির প্রত্যেক পাত্র পাত্রীর নড়াচড়া, ওঠা, বসা, ছোটা, হাঁটা, নাচা, হাতপা নাড়া, মুখভঙ্গী, চোখের ইসারা প্রভৃতি জীবন্ত দেখাবার জন্য ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে সেই চিত্রিত মূর্ত্তিগুলির ক্রমিক সূক্ষ্ম-পরিবর্ত্তন জ্ঞাপক অসংখ্য চিত্র আঁকতে হয়। নইলে তা' চলচ্চিত্র হওয়া সম্ভব নয়।

এই যে ছবিখানিকে সজীব দেখাবার জন্য চিত্রের প্রত্যেক জীবের বিভিন্ন গতির একটা ক্রমিক সূক্ষ্ম পরিবর্ত্তন পরের পর এঁকে দেখাতে হয় এটা একজন ওস্তাদ শিল্পী যার গতি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে একটু ধারণা আছে তাকেই দেওয়া হয়, কারণ এতে শিল্পীর জানা থাকা দরকার যে এতগুলো ছবিতে এতদূর পর্য্যন্ত চ'লে বেড়াচ্ছে দেখানো যায়, এবং তাতে এতবার দক্ষিণ ও বামপদ পরের পর এত ডিগ্রী থেকে এত ডিগ্রী পর্য্যন্ত ক্রমশ উঠছে ও ক্রমশ নামছে দেখানো চাই। ছবি বেশী এঁকে ফেললে পর্দ্দায় সে লোকের গতি অত্যন্ত মন্থর হয়ে যাবে, আবার ছবি

কম আঁকা হ'লে পর্দ্দায় সে লোক ঝাঁকুনী খেয়ে চলছে দেখাবে! একটা লোক ছুটছে দেখাতে হ'লে কতগুলো ছবির দরকার—সাঁতার কাটছে দেখাতে হ'লে সেইভাবে বিভিন্ন অঙ্গের কতবার আক্ষেপ ও প্রক্ষেপের ছবি এঁকে দেখাতে হবে ইত্যাদি সঠিক না জানলে বিভ্রাট ঘটবে! এই অতি জটিল ও কঠিন কাজের ভার পড়ে তাই একজন দক্ষ ও নিপুণ চিত্রকরের উপর। তিনি কেবল প্রত্যেক মূর্ত্তির প্রয়োজনানুপাতে পরের পর বিভিন্ন ভঙ্গীর ভিন্ন ভিন্ন আদ্‌রাটুকু দেগে ছেড়ে দেন, তারপর, তাঁর সহকারী শিল্পীরা সকলে মিলে সেই চিত্রগুলিকে রেখা ও রঙে ভরিয়ে সুসম্পূর্ণ করেন।

কৌতুকচিত্রে পশ্চাদ্‌ভূমির পরিবর্ত্তন নিতান্ত প্রয়োজন না হ'লে আর করা হয় না। কারণ প্রত্যেকবার প্রতি ছবিতে পশ্চাদ্‌ভূমির দৃশ্য পরিবর্ত্তন দেখাতে হ'লে বহু পরিশ্রম ক'রতে হয়। কাজেই, এই অকারণ শ্রম লাঘবের জন্য পটভূমির এমন একটা পরিকল্পনা পূর্ব্ব হ'তেই ক'রে রাখা হয়—যাতে সমগ্র ছবিখানিতেই সেই পটভূমি ব্যবহার করা যেতে পারে এবং সে পটভূমি যেন কোথাও না অসঙ্গত বা বেমানান দেখায়। যেমন—সমস্ত ঘটনাই একটি ক্রিকেট খেলার মাঠে বা গল্‌ফ খেলার ময়দানে, কিম্বা স্কেটিং রিঙ্কের মধ্যে অথবা ইস্কুলের ক্লাশে ঘটে গেল দেখাতে পারলে একই পশ্চাদ্‌ভূমি সমস্ত ছবিগুলিতে ব্যবহার করা চলে! কখন কখন কৌতুকচিত্রে কোনো পশ্চাদ্‌ভূমি একেবারে আঁকাই হয় না। ছায়াপত্রীই সে ছবিতে পশ্চাদ্‌পটের কাজ করে! কখনও বা কেবলমাত্র একটি ভূমি রেখা বা দিগন্ত সীমা মাত্র দেখিয়ে পটভূমির নির্দ্দেশ সম্পন্ন করা হয়। কোনো কোনো চিত্রে মেঘ, জলের ঢেউ, ধোঁয়া, ঝর্‌ণা, নদী, গাছ—এসব কেবল ছবি হিসাবেই আঁকা হয়। পটভূমি রূপে এসব ব্যবহার করা হয় না। এ বিড়ম্বনা—যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ।

ছবি আঁকবার সময় শিল্পীর সর্ব্বদা সতর্ক থাকা দরকার যাতে দর্শকেরা সে চিত্র সহজেই বুঝতে পারে। ছবিতে যে ঘটনাটুকু প্রধান আকর্ষণ, মাত্র সেইটুকুতে তুলির জোর দিয়ে পারিপার্শ্বিক ঘটনা সব দাবিয়ে রাখাই দক্ষশিল্পীর কাজ। ধরুন ছবিতে আছে—একটা ফানুসে গ্যাস পুরে ছেড়ে দেওয়ার আগে সেই ফানুসের তলায় বেঁধে দেওয়া হ'ল একটা বেড়াল ছানাকে! ফানুসটা যেই উপরদিকে উঠতে আরম্ভ হ'ল সেই বেড়াল ছানাটা নিয়ে তখন সমস্ত দর্শকের উৎসুক দৃষ্টি সেই ফানুস ও বেড়াল ছানার দিকে আকর্ষণ করবার জন্য যারা ফানুস ছাড়লে তাদের একেবারে অবহেলা করতে হবে। তারা আর তখন মোটেই নড়বে না চড়বে না বা কোনো কাজ করবে না, কেবল হাঁ করে আকাশের দিকে মুখ তুলে চেয়ে থাকবে।

কৌতুকচিত্রের আর একটা প্রধান লক্ষ্য রাখবার দিক হ'চ্ছে ছবিগুলির ছক্‌ বা ঘরের ক্রমানুপাত (Register) যাতে সম্পূর্ণ নিভু'ল হয়। কারণ সেই ছোট্ট ছবিগুলি যখন প্রক্ষেপন যন্ত্রের ভিতর দিয়ে বহুগুণ বর্দ্ধিত হয়ে পর্দ্দার উপর এসে পড়ে, তখন ছবির এতটুকু গলদ থাকলেই তা প্রকাণ্ড হ'য়ে চখের সামনে উপস্থিত হয়। ছবির ক্রমানুপাত ঠিক না থাকলে নির্দ্দিষ্ট ষোলখানি হিসাবে ছবি প্রতি সেকেণ্ডে দেখালেও পর্দ্দার উপর সে ছবি এমন লম্ফ-ঝম্ফ সুরু করে দেবে যে দর্শকদের তা' চক্ষুপীড়াদায়ক হয়ে উঠবে। কাজেই

চলচ্ছায়ায় কার্টুন শিল্পীকে ছবির এই ছক্ বা ঘরের ক্রমানুপাত সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত হ'তে হবে। এই ক্রমানুপাত নির্ভুল হওয়া খুব কঠিন নয় যদি শিল্পী ছবি আঁকবার সময় একটা নির্দ্দিষ্ট ছকের উপর ফেলে আঁকেন এবং আলোকচিত্র নেবার সময় সেই ছবিগুলিকে যদি অবিকল আবার সেই অনুপাতের ছকে সাজিয়ে ফটো নেওয়া হয়।

কার্টুন ছবির প্রথম যুগে একজন শিল্পীই সব ছবিগুলিকে আগাগোড়া শেষ ক'রতেন; ফলে, ছবি তৈরী হ'তে অত্যন্ত বিলম্ব হ'ত। আজকাল একখানি ছবি শেষ করবার জন্য অনেকগুলি শিল্পীকে নিয়োগ করা হয়, কাজেই ছবি তৈরী হ'তে আর বিলম্ব হয় না। পূর্ব্বেই বলেছি—ছবিখানি যিনি কল্পনা করেন সেই প্রধান শিল্পী প্রত্যেক ছবির কবল আকৃতি রেখাটুকু মাত্র দেগে ছেড়ে দেন, তারপর অন্যান্য শিল্পীরা সেগুলিকে সম্পূর্ণ করেন!

ছবিতে মূর্ত্তি যত কম থাকে ততই ভাল। সে ছবি চট্‌পট হয়ে যায় এবং শিল্পীদেরও আঁকবার সময় কোনো গোলে পড়তে হয় না! কিন্তু, অনেকগুলি মূর্ত্তি যদি প্রত্যেক দৃশ্যে একসঙ্গে উপস্থিত আছে দেখাতে হয় তাহ'লেই একটু মুস্কিল বাধে। এই ভীড়ের ছবি আঁকায় যেমনি ঝঞ্ঝাট তেমনি বিরক্তিকর খাটুনি ও বিলম্ব হয়। একজন শিল্পী যদি খুব চট্‌পট্ আঁকতে পারে তাহ'লে সপ্তাহে ১০০ ফুট ফিল্‌মের মত অর্থাৎ ১৬০০ ছবির বেশী এঁকে উঠতে পারে না।

ছবি আঁকা শেষ হয়ে গেলে তারপর সেগুলিকে ক্যামেরার সামনে ফেলে একে একে ছায়াপত্রীতে তুলে নেওয়া হয়। ব্যাপারটা তেমন কিছু কঠিন নয়। একটি গতিচিত্রধর ক্যামেরাকে আগে কাঠের মাচার উপর নীচুদিকে মুখ করে বসানো হয়। তারপর সেই ছায়াধর যন্ত্রের সমুখে টেবিলের উপর শিল্পীর আঁকা ছবির ঘরের ক্রমানুপাত অনুযায়িক একটি ছক এঁটে নেওয়া হয়। সেই ছকের দু'ধারে দুটি 'পারদ বাষ্প-বর্ত্তিকা' (Mercury Vapor Lamp) সংলগ্ন থাকে, চিত্রগুলিতে প্রয়োজনমত আলোকপাত করবার জন্য। এক্ষেত্রে ক্যামেরার ফোকাস বা লক্ষ্যসন্ধান সুনির্দ্দিষ্ট করা থাকে। ছায়াধর যন্ত্রী কেবল একটি বৈদ্যুতিক বোতাম টেপবামাত্র তাড়িতশক্তির প্রভাবে ক্যামেরার কাজ স্বতঃই নিষ্পন্ন হয়। কারণ ছায়াধর যন্ত্রী এ স্থলে ক্যামেরার কাছে থাকেন না। তিনি থাকেন সেই টেবিলের ধারে বসে। সেইখান থেকেই প্রয়োজনমত প্রতিবার সেই টেবিলে সংলগ্ন বোতাম টিপে বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে ক্যামেরা পরিচালিত করেন।

শিল্পীর আঁকা ছবি ও তার পটভূমির চিত্রগুলিকে আগে—পরের পর মিলিয়ে নম্বর দিয়ে সাজিয়ে নিয়ে তার পর ক্যামেরার সামনে ফেলে ছায়াধর যন্ত্রী একটি একটি করে তার আলোকচিত্র ছায়াপত্রীর উপর তুলে নেন। মুখর কৌতুকপট প্রচলিত হবার পর থেকে এই ছবি নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাতে আনুষঙ্গিক কথা গান এবং সুর ও শব্দ আরোপিত করা হয়। একে বলে dubbing বা আরোপন। আজকাল একাধিক মুখরচিত্রের বহু শব্দাংশ ছবিতোলার পর এই পদ্ধতিতে আরোপিত ক'রে নেওয়া হয়।

পূর্ব্বেই ব'লেছি একখানি একরীলের কৌতুকচিত্র তুলতে হ'লে ১৬.০০ হাজার চিত্র অঙ্কিত করা প্রয়োজন। কারণ, একফুট ছায়াপত্রীতে ১৬খানি ছবি লাগে। একরীলে

অর্থাৎ একটি কাঠিমে থাকে হাজার ফুট ছায়াপত্রী, কাজেই ১৬০০০ ছবি চাই। তবে, যিনি চতুর শিল্পী তিনি অতি সুকৌশলে চিত্রখানিকে ক্ষুণ্ণ না ক'রে ছবির সংখ্যা প্রায় অর্দ্ধেকের চেয়েও কমিয়ে ফেলেন। যেমন ধরুণ কোনো ছবিতে আছে "একটা বোকা লোক কাঠ কাটতে গিয়ে যে ডালে দাঁড়িয়েছিল সেই ডালই কাটতে সুরু করে ছিল, ফলে ডাল কাটার সঙ্গে সঙ্গে জলে পড়লো! জল থেকে সাঁতরে উঠলো রেল লাইনের ধারে। সেই সময় একখানা ট্রেণ চলে গেল তার মাথার উপর দিয়ে ইত্যাদি—" চতুর চিত্রকর এর গোড়ার দিকের ডালকাটার ছবি এক ফুটের একটা সেট্ অর্থাৎ ১৬খানি মাত্র এঁকে আলোকচিত্রকরকে সাঙ্কেতিক নির্দ্দেশ দিয়ে রাখেন যে এই সেট্‌টি অন্ততঃ একশ' ফুট ধ'রে বারম্বার নিতে হবে। কেবল মধ্যে মধ্যে গাছ কাটা কতটা অগ্রসর হয়েছে তাই দেখাবার জন্য প্রথমটা সিকিভাগ কাটা হ'য়েছে, তারপর অর্দ্ধেক কাটা হয়েছে, তারপর আরও সিকিভাগ—ইত্যাদি ক্রমিক কর্ত্তণের ক' খ' গ' ক্রমে এক একখানি ছবি দশ বার ফুট অন্তর নেওয়া দরকার! জলে যখন সাঁতার কাটছে ও হাবুডুবু খাচ্ছে তারও এক এক সেট মাত্র এঁকে দিয়ে নির্দ্দেশ দেন একশ', বা দেড়-শ'বার প্রত্যেকখানি তোলা হবে! যখন ট্রেণের ছবি আঁকতে হয় তখনও মাত্র একসেট্ ইঞ্জিন, একসেট্ গার্ডের ভ্যান ও একসেট্ ট্রেলার গাড়ী এঁকে ছেড়েদেন। ইঞ্জিন ও গার্ডের ভ্যানের ও তার মাঝে ট্রেলার গাড়ীর সেট্‌টি প্রত্যেকখানি অন্ততঃ একশ'বার পুনরাবৃত্তির নির্দ্দেশ দিয়ে রাখেন, ফলে অতি অল্প পরিশ্রমেই সুদীর্ঘ একখানি ট্রেণ চলে আসার ছবি হ'য়ে যায়। এমনি ক'রে চতুর শিল্পীরা বুদ্ধি কৌশলে চিত্রাঙ্কনের শ্রম অনেকখানি লাঘব করে ফেলেছেন, কিন্তু এর সঙ্গে শব্দ সংযোজনা প্রচলিত হওয়ায় পটুয়ার পরিশ্রম আবার অন্যদিক দিয়ে খানিকটা বেড়েও গেছে! আগে সঙ্গীত ও সুর স্থির ক'রে নিয়ে—ঠিক তদনুকুল ছবির মুখের ভাব ও তার অঙ্গভঙ্গী বা দেহ সঞ্চালন আঁকতে হয়।

চলচ্চিত্রে পুতুল নাচ এই কৌতুক চিত্রের কলা কৌশল অবলম্বনেই দেখানো হয়। কাঁচা মাটির অথবা নরম মোমের পুতুল নিয়ে ক্যামেরার সামনে প্রতিবার সেগুলির অবস্থানের প্রয়োজনমত ক্রমিক পরিবর্ত্তন সাধন ক'রে পরেরপর পুতুলের চলচ্চিত্র নিতে হয়।

চলচ্চিত্রের প্রয়োগশালা

বছর তিরিশ আগে চলচ্চিত্র লোকে প্রয়োগশালা ব'লে কিছু ছিলনা। সে সময় হোটেলের ছাদে, থিয়েটারের প্রাঙ্গণে, খেলার মাঠে যেখানে সুবিধা পাওয়া যেত' সেইখানে ক্যামেরা ও লোকজন নিয়ে গিয়ে ছবি তোলা হ'ত। প্রয়োগশালা (studio) স্থাপন করা বলতে—আমেরিকায় এডিসন কোম্পানী ১৯০৫ সালে যে একটা ঘর খাড়া করেছিলেন, সেইটেকেই ওদেশের প্রথম চেষ্টা বলা যেতে পারে। ঘরখানি মাত্র কুড়ি ফুট চওড়া আর পঁচিশ ফুট লম্বা। মাথার উপর আলকাতরা মাখানো কাগজের ত্রিপল ঢাকা দিয়ে ছাদ করা হয়েছিল। তবে, ঘরখানি তৈরি করা হয়েছিল একটি ঘূর্ণী মঞ্চের উপর, যাতে সে ঘর প্রয়োজনমত সূর্য্যের আলোর দিকে ঘুরিয়ে নেওয়া চলে। ঘূর্ণী মঞ্চটি আবার এমনভাবে একটি চাকা সংযুক্ত শকটে সংস্থাপিত ছিল, যাতে ইচ্ছামত ঘরখানিকে স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়া যায়। এর পর দ্বিতীয় প্রয়োগশালা নির্ম্মাণ করেছিলেন ফরাসী যাদুকর মেলিজ (M. Melies) এঁর ভোজবাজীর ছবি য়ুরোপে বিশেষ জনপ্রিয় হওয়ায় তার চাহিদা খুব বেড়ে ওঠে, তখন মেলিজকে ম্যাজিকের ছবি তোলবার জন্য পৃথক প্রয়োগশালা তৈরী ক'রতে হয়েছিল।

ভিটাগ্রাফ কোম্পনী নিউইয়র্কের এক অফিস ঘরের ছাদের উপর প্রথম একটু উন্নত ধরণের এক প্রয়োগশালা খাড়া করেছিলেন, আকাশ বেশ পরিষ্কার থাকলে প্রতিদিন তাঁদের সেখানেই ছবি তোলা হ'ত। হাতে আঁকা দৃশ্যপট দিয়ে ছাদের একটি কোণ ঘিরে নেওয়া হ'লে, সেই কোণে গিয়ে নট-নটীরা অভিনয় ক'রতেন এবং সূর্য্যালোকের সাহায্যে ক্যামেরায় সেই অভিনয়ের ছবি তুলে নিয়ে চলচ্চিত্র তৈরী হ'ত। সে যুগে প্রয়োগশালাকে প্রদীপ্ত ক'রে তোলবার একমাত্র উপায় ছিল সূর্য্যালোক। কাজেই প্রয়োগশালা নির্ম্মাণের পক্ষে রৌদ্রোজ্জ্বল ছাদের চেয়ে উপযোগী স্থান আর কিছু হতে পারেনা—এই ধারণাই তখন ছিল।

ক্রমে অন্যান্য কোম্পানীর আরও পাঁচ সাতটি প্রয়োগশালা গ'ড়ে উঠেছিল, তার মধ্যে দু'একটিকে একটু অধিকতর উন্নত রকমের ক'রে তোলবার প্রচেষ্টায়—তার সঙ্গে দৃশ্যপট অঙ্কনে সুদক্ষ শিল্পীর এক কারখানা, আলোকচিত্রকরের আঁধার-কক্ষস্থ রসায়নাগার, পোষাক-পরিচ্ছদ বিভাগ; সাজ-সরঞ্জাম প্রভৃতি রাখবার ঘর, নট-নটীদের সাজঘর এবং কোম্পানীর কর্ত্তাদের অফিস ঘর ইত্যাদি সংলগ্ন ক'রে নেওয়া হ'য়েছিল। তবে, সে সময় ছবি শেষ হবার কোনো নির্দ্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা ক'রতে হ'তনা বলে সেখানে প্রতিদিন কাজ হ'তনা, কেবল মালিকের আর্থিক সচ্ছলতা অনুযায়ী এবং আকাশ যেদিন পরিষ্কার পাওয়া যেত সেদিনই হ'ত। বর্ষাকালে ও গরমের দিন প্রয়োগশালার কাজ একেবারে বন্ধই রাখা হ'ত। কোনো তাড়া ছিল না তাদের। কিন্তু, ছবির চাহিদা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এবং চলচ্চিত্র

ব্যবসায়ে প্রবল প্রতিযোগীতা সুরু হওয়ায় প্রতিমাসে এমন কি প্রতিসপ্তাহেও নূতন ছবি সরবরাহ করা প্রত্যেক কোম্পানীর পক্ষেই অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে উঠলো! তখন, কেবলমাত্র সূর্য্যালোকের ভরসায় দিনগুণে বসে থাকা অসম্ভব হ'য়ে উঠলো। প্রয়োগশালায় কৃত্রিম আলোর ব্যবস্থা ক'রে এবং শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সকল সময় যাতে অবাধে ছবি তোলার কাজ অগ্রসর হ'তে পারে এমনভাবে প্রয়োগশালাগুলিকে ভেঙে চুরে বড় ক'রে গড়া হ'ল। এইভাবে প্রয়োজনের তাগিদে একটু একটু করে বাড়তে বাড়তে ক্রমে এক একটি বিশাল প্রয়োগশালাকে কেন্দ্র করে আজ এক একটি সুবিস্তীর্ণ চলচ্চিত্র-পল্লী ও বৃহৎ সিনেমা-সহর গড়ে উঠেছে।

পর্দ্দার উপর ভাল ভাল সব ছবি দেখে সিনেমা দর্শকদের মধ্যে অনেকরই মনে 'ষ্টুডিয়ো' বা চলচ্চিত্রের প্রয়োগশালা দেখে আসবার একটা প্রবল আগ্রহ জেগে ওঠে। অনেকে পরিচিত কোনো লোকের সুপারিশ ধ'রে একদিন ছবি তোলা দেখবার জন্য প্রয়োগশালায় ছুটে আসেন। কিন্তু, প্রয়োগশালা সম্বন্ধে যে ধারণা নিয়ে অর্থাৎ যেমনটি দেখবার আশা ক'রে তাঁরা আসেন তা' দেখতে না পেয়ে নিতান্ত হতাশ হ'য়ে পড়েন। প্রয়োগশালা সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা—না জানি সে কোন স্বর্গের নন্দন-কানন বা ইন্দ্রভূবন! কল্পনার রাজ্য সে! স্বপ্নের পুরী! আনন্দ বিলাস ও আরামের আদর্শ নিকেতন! কিন্তু, সেখানে ঢুকে যখন দেখেন যে সেটা নেহাৎই একটা প্রকাণ্ড কারখানা বাড়ী ছাড়া আর কিছু নয়, তখন একেবারে দমে যান! চারিধারে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা তারই মাঝখানে করোগেট টিন, কাঠ ও কাঁচের প্রাচীরে তৈরী এক বিশাল আটচালা। আটচালার মাথা একেবারে চারতলার সমান উঁচু! এই আটচালার ভিতর খানিক খানিক জমীতে এক একদিকে এক এক রকম দৃশ্যপট সাজানো রয়েছে বটে - কিন্তু, তার সবই ফাঁকি! কেবল সামনেটুকু সুন্দর রঙচঙ্ করা কিন্তু, আশে পাশে ও পিছনে দড়ি দড়া বাঁশ বাখারি টিন কাঠ ন্যাকড়া পেরেক সব যেন দাঁত বার ক'রে দর্শককে উপহাস ক'রছে! ঘরের মেঝেয় পা বাড়াবার জো নেই। মোটা মোটা রবার পাইপে ঢাকা বৈদ্যুতিক তার চারিদিকে ছড়ানো। তা'ছাড়া মাঝখানে এক প্রকাণ্ড চৌবাচ্ছা। মাটির মধ্যে আবার সুড়ঙ্গ করাও রয়েছে! রবারটায়ার চাকার উপর দাঁড় করাণো বড় বড় সব হাতীর মত ক্যামেরা এখানে ওখানে বসানো! সুদীর্ঘ ডাণ্ডা বাহু বিস্তার করে একাধিক মাইক্রোফোন্ বা অনুশ্রুতি যন্ত্র সেই দৃশ্যপটের উপর ঝুলছে রয়েছে। আশে পাশে চোখ ঝল্‌সে যাওয়া রাক্ষুসে সব প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক আলো দাঁড় ক'রানো। আটচালার মাথার উপরও ভিতর দিকে অসংখ্য বড় বড় সব আলো কপিকল ও তারের দড়িতে ঝুলছে। একধারে শব্দযন্ত্রীর টেবিল ও টেলিফোন্। অভিনেতৃদের স্মরণ শক্তিকে সাহায্য করবার জন্য বড় বড় ভূমিকা বোর্ড! একদিকে 'চিত্রগুপ্তের' টেবিল, ঘণ্টা, মেগাফোন্। কোথাও দৃশ্যপটের অংশ ও নানা সাজ সরঞ্জাম হাতের কাছে জড় করা রয়েছে। নট-নটীরা সেজেগুজে একধারে অপেক্ষা ক'রছে। তাদের মধ্যে জনকতককে নিয়ে পরিচালক ব্যস্ত রয়েছেন! সুর ও সঙ্গীতের সম্প্রদায় তাদের যন্ত্রপাতি নিয়ে একদিকে উপস্থিত র'য়েছে। পরিচালকের আদেশ ও ইঙ্গিতের অপেক্ষায় সকলে সতর্ক হয়ে প্রতীক্ষা

ক'রছে। পরিচালক ও অভিনেতৃবর্গ ছাড়া আরও অনেকে তার মধ্যে ব্যস্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মোটা মোটা ভারী কম্বল মুড়ি দিয়ে আলেকচিত্র-শিল্পীরা বারবার ক্যামেরার মধ্যে মাথা ঢোকাচ্ছেন এবং বার ক'রছেন। প্রয়োগশালায় ঢুকে ছবি তোলার এই সব ঢিলে ব্যবস্থা দেখে অনেকে অবাক হ'য়ে ভাবেন এর মধ্যে অমন সুন্দর চিত্র কেমন ক'রে তোলা সম্ভব হয় ?

কেমন ক'রে যে হয় সেটা জানতে হ'লে একদিন কয়েক ঘণ্টা মাত্র ষ্টুডিয়োতে ঘুরে বেড়ালে হবেনা। একখানি ছবি তোলা গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত দেখা চাই। চলচ্চিত্রের যে কোনো আধুনিক প্রয়োগশালায় এখন পৃথিবীর সকল দেশের সব কিছু খুঁজলে পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই ব'লেছি প্রথমে কেবলমাত্র আভ্যন্তরীণ দৃশ্যের ছবি প্রয়োগশালায় তোলা হ'ত, আর বহির্দৃশ্যের যা'কিছু চিত্র সব অনুকূল স্থান বেছে নিয়ে সেখানে গিয়ে তোলা হ'ত। কিন্তু, তাতে ব্যয় ও সময় দুইই বেশী লেগে যেতো, তাই বহির্দৃশ্যও আজকাল প্রয়োগশালার প্রাঙ্গণে সাজিয়ে নিয়ে তোলা হয়। কাজেই প্রয়োগশালার প্রধান বিভাগ হ'চ্ছে এখন শিল্পকলা বিভাগ। সে এক বিস্তৃত অদ্ভূত কারখানা যেখানে জগতের এমন কিছু নেই যা আদেশমাত্র তৈরী হয়না। তারপরই হ'চ্ছে প্রয়োগশালার মালখানা (Property room) এখানে পৌরাণিক ঐতিহাসিক ও আধুনিক সকল যুগের সকল রকম সরঞ্জাম ও তৈজসপত্র সংগ্রহ করা আছে। কি আছে না আছে পরিচালক যাতে অনায়াসে জানতে পারেন এজন্য প্রত্যেক জিনিসের ফটো তুলে নম্বর দিয়ে তালিকা পুস্তক রাখা হয়। তার পর দর্জ্জি বিভাগ। এখানে প্রত্যেক চিত্রের প্রয়োজনমত নূতন সাজ পোষাক তৈরী হয়। তার পর অলঙ্কার বিভাগ,—এখানে মতির মালা, মাণিক দুল, হীরের মুকুট, জড়োয়া নেকলেস্, জহরতের আংটি, যখন যেমনটি প্রয়োজন ঠিক্ তেমনিটি নকল তৈরী হয়ে যাচ্ছে। কামার-শালায় তৈরী হ'চ্ছে নকল ছুরি ছোরা বর্শা তরবারী কামান বন্দুক বর্ম্ম চর্ম্ম হাতিয়ার কত কি ! কুমোরশালায় তৈরি হচ্ছে নানা প্রতিমূর্ত্তি ও তাঁর ছাচ। আলোকচিত্র বিভাগে শুধু ক্যামেরাই থাকেনা, আছে তার সঙ্গে রসায়নাগার, পরিস্ফুটনাগার, মূদ্রণ বিভাগ, হাফ্‌টোন ব্লক ও ত্রিবর্ণচিত্র এবং রঙীন লিথো ছবি আঁকা ও ছাপার ব্যবস্থাও আছে। প্রচার বিভাগকে এঁরা রীতিমত সাহায্য করেন। প্রচার বিভাগে ছাপার সরঞ্জাম আছে সমস্তই উৎকৃষ্ট ও প্রথম শ্রেণীর। তার পর আলোক বিভাগ ও শব্দ বিভাগ দুইই বৈদ্যুতিক ব্যাপার এবং বিরাট ব্যাপারও। সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকেরা এ বিভাগের ভার নিয়ে থাকেন।

দৃশ্যপট অঙ্কন প্রয়োগশালার আর একটি বড় বিভাগ। কারখানায় কাঠের ফ্রেমের উপর কাঁটা পেরেক মেরে সাদা কাপড় এঁটে দৃশ্যপটের প্রয়োজনীয় অংশগুলি তৈরী হয়ে পটুয়াদের বিভাগে চলে যায়। সেখানে রং ও তুলির সাহায্যে পটুয়ারা সেই সাদা পট ভূমিকে প্রয়োজনীয় দৃশ্যে রূপান্তরিত করেন। এসব দৃশ্যপট যে কেবলমাত্র চিত্রের আভ্যন্তরীণ দৃশ্যাভিনয়ের জন্যই প্রস্তুত হয় তা' নয়; বহির্দৃশ্যের পট ভূমিও অনেক সময় পটুয়াদেরই আঁকতে হয়। কত পাহাড় পর্ব্বত অরণ্যভূমি সমুদ্রতীর মেঘবিচিত্র

আকাশপট যা আমরা ছবিতে দেখে সত্য স্বরূপ মনে করি তা' ক্যামেরার চক্ষে পটুয়াদের সুপটু তুলির বিভ্রম মাত্র!

পূর্ব্বেই বলেছি প্রয়োগশালার প্রাঙ্গণেই তৈরি ক'রে নেওয়া হয় য়ুরোপের এশিয়ার আফ্রিকার আমেরিকার যে কোনো প্রসিদ্ধ সহরের পরিচিত রাজপথ, বাজার, হোটেল, চাঁদনীচক্, নিভৃত পল্লী, নিবিড় অরণ্য, পর্ব্বত গুহা, সরোবর, তুষারাচ্ছন্ন মেরু প্রদেশ, আগ্নেয় গিরি বিধ্বস্ত নগর, দুর্গ পরিখা, উদ্যান বাটিকা, সাঁতার ক্লাব, থিয়েটার বা রঙ্গালয়ের মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহ, সার্কাসের তাঁবু ইত্যাদি ইত্যাদি। কাজেই প্রয়োগশালার প্রাঙ্গণে কৃত্রিম পর্ব্বত, বৃহৎ পুষ্করিণী, প্রশস্ত খাল, দীর্ঘ সেতু, রঙ্গ প্রেক্ষাগৃহ, রেলপথ, রাজপথ, উদ্যান প্রভৃতি তৈরি করাই থাকে। পরিচালকের প্রয়োজন হ'লে অবিলম্বে তিনি প্রয়োগশালার মধ্যেই তাঁর চিত্রের জন্য অনুকূল স্থান নির্ম্মাণ করিয়ে নিতে পারেন।

ছবির জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছু বিভাগের সঙ্গেই আজকাল প্রয়োগশালার মধ্যে লাইব্রেরী বা গ্রন্থশালা, আলোচনাগার, মিউজিয়ম, মহলা সভা, নৃত্য সভা, চিত্রকুঠি, অনুশীলনাগার, (Research Room) প্রচার কক্ষ, প্রদর্শনী (Exhibition Room) পুরুষ ও মহিলাদের পৃথক পৃথক সাজঘর, ম্যানেজারের অফিস, পরিচালকদের বিশ্রাম কক্ষ, হাসপাতাল ও ঔষধালয়, ডাক্তারের ঘর, অগ্নিবারণ বিভাগ (Fire Frigade) লোকজনের ঘর (Servants Quarter) একাধিক সৌখীন বাথরুম ও সাধারণ শৌচাগার প্রভৃতি অসংখ্য ব্যবস্থা করা থাকে। চিত্রে ব্যবহারের জন্য আজকাল অনেকরকম গৃহপালিত পশু পক্ষীও প্রয়োগশালায় পালন করা হয়। এই পশু বিভাগকে একটি ছোটখাটো চড়িয়াখানাও (Zoo) বলা চলে!

চলচ্চিত্রের প্রয়োগশালায় একত্রে মিলিত হন—নানাদেশের নানাজাতের সাহিত্যিক, ঐতিহাসি, বৈজ্ঞানিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, রাসায়নিক, চিত্রকর, ভাস্কার, স্থপিত, গায়ক, বাদক, নর্ত্তক, নট নটী, রণকুশলীসেনাধ্যক্ষ,বহুবিধ খেলোয়াড়, নানা কলা কুশলী শিল্পী, যন্ত্র ও কলকব্জা বিদ্, শ্রেষ্ঠ কারিগর, সাংবাদিক (Journalist) ও সন্দেশগ্রাহী (Reporters) এবং আরও বহু জ্ঞানী, গুণী, সুধী, ব্যবসায়ী, দালাল, কৌতুহলী দর্শক ও অনুরাগী বন্ধুর দল! এক কথায় বর্ত্তমান চলচ্চিত্রের প্রয়োগশালাকে 'মহামানবতীর্থ' বলা যায়!

চলচ্চিত্রে বর্ণ-বিন্যাস

আলোক-চিত্র এতদিন শুধু আলো-ছায়ার প্রতীক্ স্বরূপ সাদা ও কালোয় দেখা যেতো। কিন্তু, আজকাল বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির ফলে রঙীণ ছবি তোলাও সম্ভব হ'য়েছে। এটা কি ক'রে সম্ভব হ'ল জানতে হ'লে প্রথমে জানা দরকার 'রং' ব্যাপারটা কি? আলোক-বিজ্ঞান থেকে জানা যায় যে আলোক হচ্ছে ঈথারের উপর একটা তাড়িত-চৌম্বুক (Electro-magnetic) তরঙ্গ-প্রবাহ। আলোকের এই তরঙ্গ বাহু (Wave-Length) অগণিত ও অনন্ত-প্রসারিত। এবং এর স্পন্দন হিল্লোলের গতিও অগণিত এবং অন্তহীন। ঠিক্ যেমন বেতার-স্বর-তরঙ্গপ্রবাহ—অনেকটা সেই রকমই; কেবল আলোকের তরঙ্গ-বাহু স্বর-বাহুর চেয়ে অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব এবং এর স্পন্দন-হিল্লোল বেতার স্বর-স্পন্দন অপেক্ষা বহুগুণ বেশী। এই আলোক-তরঙ্গের স্পন্দন-হিল্লোলের বিভিন্ন গতি ও তরঙ্গ-বাহুর প্রসার ভেদে আমাদের দৃষ্টিপথে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের উদয় হয়। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, রংয়ের এই প্রকার ভেদ বা পার্থক্য অসংখ্য রকম হ'তে পারে। আমরা যখন সাদা আলো দেখি—যেমন সূর্য্য কিরণ, তখন বুঝতে হবে যে সেটা হচ্ছে তাড়িত-চৌম্বুক-প্রবাহের সবরকম তরঙ্গ-ভেদ ও স্পন্দন-বেগের সম্পূর্ণ সংমিশ্রণ। কিন্তু সেই আলো যখন অন্য কোনো বস্তুর ভিতর দিয়ে প্রতিফলিত হয় তখন তার স্পন্দন-বেগ ও তরঙ্গ-ভেদের একাধিক অভাব ঘটে। যেমন একটি লাল গোলাপ ফুল আলোকের কেবলমাত্র সেই তরঙ্গটুকুই প্রতিফলিত করে যা আমাদের দৃষ্টিতে রক্তাভ দেখায়। আলোকের অন্যান্য তরঙ্গ-স্পন্দন তার মধ্যে নিঃশেষে বিলুপ্ত হ'য়ে যায়। তেমনি গাছের সবুজ পাতা কেবলমাত্র সেই তরঙ্গ-স্পন্দনটুকুই প্রতিফলিত করে যা আমাদের দৃষ্টিতে 'সবুজ' রং বলে প্রতিভাত হয়। অন্যান্য তরঙ্গ-স্পন্দন তার মধ্যে নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে যায়। সমস্ত বিভিন্ন রংই এইভাবে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। কেবল, যখন আমরা কোনো কিছু 'কালো' দেখি তখন বুঝতে হবে যে আলোকের সর্ব্ববিধ তরঙ্গ-স্পন্দন তার মধ্যে নিঃশেষে বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে—কোনো কিছুই আর প্রতিফলিত হ'চ্ছে না—সবরকম আলোর অভাবে যেমন জগতে অন্ধকার নেমে আসে! অন্ধকারের রংও সেইজন্যই 'কালো'।

বৈজ্ঞানিকেরা তাঁদের দীর্ঘকাল গবেষণার ফলে আবিষ্কার করেছেন যে 'সাদা' রংকে এমন তিনটি প্রধান রংয়ে বিভক্ত ক'রে ফেলা যায়, যে তিনটি রংয়ের পরস্পর সংমিশ্রণ-ভেদে সবরকম ভিন্ন ভিন্ন রংই উৎপন্ন ক'রতে পারা যায়। এই প্রধান তিনটি রং হ'চ্ছে লাল, নীল ও হ'লদে। (পক্ষান্তরে—সবুজ) এই তিনটি রং যদি ঠিক যথাযথভাবে সংমিশ্রিত হয় তাহলে আমাদের দৃষ্টিপথে তা 'সাদা' হ'য়ে দেখা দেবে। আর যদি এ তিনটি রং একটু কম-বেশী করে পরস্পরের সঙ্গে সংমিশ্রিত করা হয় তাহলে আমরা ভিন্ন ভিন্ন রং দেখতে পাবো।

কারণ, আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের স্নায়বিক-শৃঙ্খলার সূত্রও (Optic Nervous system) এই তিনটি প্রধান রংয়ের সঙ্গেই সমতালে বাঁধা। যখন যে রং‍টার সংমিশ্রণ আমাদের চ'খে প্রতিফলিত হ'য়ে দর্শনেন্দ্রিয়ের তদনুকূল স্নায়বিক শৃঙ্খলাকে উত্তেজিত করে, আমরা তখন সেই সেই রংই দেখতে পাই। সুতরাং কোনো কিছুর আমরা যদি তিনখানি পৃথক্ পৃথক্ আলোক-চিত্র গ্রহণ করি, এবং প্রত্যেকখানি ছবি নেবার সময় যদি তার মধ্যে প্রতিফলিত প্রধান প্রধান আলোক-তরঙ্গকে এমনভাবে ছেঁকে নিই যাতে আলোক তরঙ্গের বিভিন্ন স্পন্দনের অনুপাত অনুসারে ওই তিনটি প্রধান রংয়ের পৃথক্ পৃথক্ ছাপ ওঠে, এবং তারপরে যদি সেই তিনখানি পৃথক ছবিকে কোনোরকমে একত্র মিলিয়ে একখানি ছবিতে পরিণত করতে পারি তাহ'লে হুবহু সেই বস্তুর স্বাভাবিক রংটি ছবিতে ধরা পড়ে। মাসিকপত্রে যে সব তিন রংয়ের 'হাফটোন' ছবি ছাপা হয় সে সব ঠিক এই নিয়মেই মুদ্রিত হওয়া সম্ভব হয়েছে।

রঙীন ছবি তোলার দু-রকম পদ্ধতি আছে। একটাকে বলে 'যৌগিক' (Additive) অন্যটা হচ্ছে 'ব্যবচ্ছেদক' (subtractive)। যৌগিক পদ্ধতিতে যে রঙীন ছবি তোলা হয় ছায়াপত্রীতে তার কোনো রং দেখতে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু বিশেষভাবে আলোক-তরঙ্গের বিভিন্ন স্পন্দনের অনুপাতে বর্ণশোধকের (Filters) সংযোগে তোলা ব'লে বর্ণচ্ছটা তার মধ্যে অদৃশ্যভাবে নিহিত থাকে। সেই ছায়াপত্রী যখন আবার বিশেষভাবে 'বর্ণশোধক' (Filters) সংযুক্ত প্রক্ষেপন যন্ত্রের ভিতর দিয়ে পর্দ্দার উপর গিয়ে পড়ে তখন তার বিভিন্ন বর্ণ আমাদের দৃষ্টিপথে পরিদৃশ্যমান হ'য়ে ওঠে। 'ব্যবচ্ছেদক' পদ্ধতিতে যে ছবি তোলা হয় বর্ণ সে ছায়াপত্রীতেই সুস্পষ্ট মুদ্রিত হ'য়ে যায়, কাজেই সে ছবি পর্দ্দার উপর দেখাবার সময় প্রক্ষেপন-যন্ত্রের সঙ্গে কোন বর্ণশোধক ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু, ছবি নেবার সময় বিশেষভাবে নির্ম্মিত বর্ণগ্রাহী ছায়াধর যন্ত্র ব্যবহার করতে হয় এবং বর্ণচ্ছটাযুক্ত ছায়াপত্রী মুদ্রণেরও বিশেষ একটি নির্দ্দিষ্ট রাসায়নিক প্রণালী অনুসরণ করতে হয়। ব্যবসায়ের দিক দিয়ে 'ব্যবচ্ছেদক' প্রণালীতে তোলা রঙীন ছবির একটা মস্ত সুবিধা এই যে সে ছবি যে কোনো ছবি-ঘরের সাধারণ প্রক্ষেপন-যন্ত্রে দেখানো চলে।

১৮৯৫ সালে মিঃ জেঙ্কিন্স্ (Mr. Jenkins) যে রঙীন ছবি দেখিয়েছিলেন ছবির ইতিহাসে সেই হ'চ্ছে প্রথম রঙীন ছবি। মিঃ বয়ইস্ (Mr. Boyce) নামে একজন শিল্পী এ ছবিখানি আগাগোড়া তুলি দিয়ে হাতে রং ক'রেছিলেন। তার পরবৎসর মিঃ রবার্ট পল "The miracle" নামে যে রঙীন ছবি দেখিয়েছিলেন—সেখানিরও আদ্যোপান্ত অর্থাৎ সাত রীলের প্রায় ১,১২০০০ খানি ছবি সমস্তই হাতে রং করিয়েছিলেন কিন্তু, এতে যে অমানুষিক পরিশ্রম ও দীর্ঘ সময় লাগ্‌লো তাতে ব্যবসা চলে না। তখন যান্ত্রিক উপায়ে অর্থাৎ কলে রং করা যেতে পারে কিনা তারি চেষ্টা চ'লতে লাগলো। ফলে 'Pathe-color' ছবি সৃষ্টি হ'ল। এ ছবি চিত্রানুযায়ী একটা কোনো কঠিন পাতের উপর খাদ্‌রি কেটে (Stencil process) সেই পাতটি ছবির উপর ফেলে রং করা হ'তো। আরও দুবছর পরে 'যৌগিক' পদ্ধতিতে স্বাভাবিক রংয়েই ছবি তোলা সম্ভব হ'ল। মিঃ ফ্রাইজ্ গ্রীন্ (Mr. Friese Greene) এই পদ্ধতির উদ্ভাবক। কিন্তু এ ছবি প্রক্ষেপন-যন্ত্রে দেখাবার অসুবিধা একটু বেশীরকম

থাকায় ব্যবসায়ের দিক দিয়ে সাফল্য লাভ ক'রতে পারলে না। তারপর এলো 'Kinema color'—রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের 'করোণেশন' এবং 'দিল্লী দরবার' প্রভৃতি ছবি এই পদ্ধতিতেই তোলা ও দেখানো হয়েছিল। কিন্তু এরও দেখাবার একাধিক অসুবিধা থাকায় বেশীদিন চললো না। প্রসিদ্ধ ফরাসী চলচ্চিত্র-বিশেষজ্ঞ M. Leon Gaumont এই সময় রঙীন ছবি তোলার আর এক উপায় আবিষ্কার করেন। কিন্তু, সেও দেখাবার জন্য বিশেষ যন্ত্রপাতির দরকার ব'লে সার্ব্বজনীন হ'য়ে উঠতে পারলো না। তারপর, বিখ্যাত ফিল্ম-ব্যবসায়ী 'ইষ্টম্যান্' কোম্পানীরা 'Kodachrome' প্রণালীতে রঙীন চিত্র সৃষ্টি করলেন। ব্যবসায়ের দিক দিয়ে এ পদ্ধতি অনেকটা সাফল্য লাভ ক'রতে পেরেছে, কারণ এ ছবি তোলবার ও ছাপবার জন্য বিশেষ যন্ত্রপাতি দরকার হ'লেও—দেখাবার জন্য সাধারণ প্রক্ষেপন-যন্ত্রেই কাজ চলে। সার্ব্ববর্ণিক ছায়াপত্রী (Panchromatic Film) এঁরাই প্রথম সৃষ্টি করেছেন। তারপর দেখা দিলে 'প্রীজ্মা' (Prizma) রঙীন ছবি। ১৯১৭ সাল থেকে ১৯২১ সাল পর্য্যন্ত 'প্রীজ্মা' খুব চলেছিল। গ্রিফীথ্, হিউগো বলীন্, কমোডোর ব্ল্যাকটন, ফেমাস্ প্লেয়ার্স কোম্পানী প্রভৃতিরা 'প্রীজ্মা' পদ্ধতির ভয়ানক ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু 'প্রীজ্মা'কে বিবর্ণ করে দিয়ে ফুটে উঠ্লো—বর্ণকলা (Technicolor) পদ্ধতি। এ ঠিক্ তিন রঙা ছবি ছাপার মতই তিন রংয়ের তিনখানি পৃথক্ ফিল্ম্ তুলে তারপর একখানিতে সেই তিনখানি ছবি পরের পর ছেপে নিয়ে তিনরঙা একখানি ছবি তৈরী করা।

আজকাল সর্ব্বত্র এই 'বর্ণকলা' পদ্ধতিরই (Technicolor) জয় জয়কার চ'লছে বটে, কিন্তু এর এক অপরাজেয় প্রতিদ্বন্দ্বী ইতিমধ্যে চিত্রজগতে দেখা দিয়েছে। পৃথিবীর সমস্ত চিত্র প্রতিষ্ঠান উৎসুক আগ্রহে তার অভিযান লক্ষ্য ক'রছে। সেটি হ'চ্ছে 'বহুবর্ণ' (Multi-color) চিত্রপদ্ধতি। এই পদ্ধতি অনুসারে রঙীন ছবি তোলবার জন্য বিশেষ ভাবে প্রস্তুত ছায়াধর-যন্ত্র, বিশেষ ভাবে নির্ম্মিত প্রক্ষেপন-যন্ত্র, অধিক আলোক সঞ্চারণ প্রভৃতির প্রয়োজন হয় না। Multi-color কেম্পানী এক রকম সপ্তবর্ণের সম ও বিষম ছায়াপত্রী (Rainbow Positive Negative Film) উদ্ভাবন করেছেন। 'ব্যবচ্ছেদক' প্রণালী অনুসারে এই সপ্তবর্ণ চিত্রপত্রীর সঙ্গে একখানি সার্ব্ববর্ণিক (Panchromatic) ছায়াপত্রী ব্যবহার করাতে অতি সহজেই নানা বর্ণের সঠিক আলোক-চিত্র তোলা সম্ভব হয়েছে। এই অভিনব পদ্ধতি অনুসারে তোলা যুগল ছায়াপত্রীর জন্য কেবল একটি নূতন ধরণের যুগ্ম-পত্রী কৌটা (Double Magazine) ছায়াধরযন্ত্রে সংলগ্ন ক'রে নিয়ে এবং দু'খানি ছায়াপত্রী যাতে একসঙ্গে যাতায়াত ক'রতে পারে [কারণ, পূর্ব্বেই বলেছি এই বহুবর্ণ-চিত্র-পদ্ধতি অনুসারে একসঙ্গে একই ছায়াধর-যন্ত্রে দু'খানি বিষম ছবি (Negative) নিতে হয়; পরে তার রাসায়নিক পরিস্ফুটনের সময় একই (Positive) সমপত্রীর দু'পিঠে দু'খানি ছাপা হয়। এই সমপত্রী বহুবর্ণ-চিত্র ছাপবার জন্য বিশেষ ভাবে তৈরি। এর দু'পিঠেই ছবি ছাপা চলে!] এমনভাবে ছায়াধর যন্ত্রে ছায়াপত্রীর প্রবেশ-পথ (Camera Gate) একটু বাড়িয়ে নিতে পারলেই এই নবাগত 'বহুবর্ণ' চিত্রপদ্ধতি বিশ্বের চিত্র-জগতে যে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার ক'রতে পারবে সে বিষয়ে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

'সেন্সার্'

ফিল্‌ম শিল্পের সবচেয়ে বড় শত্রু হ'য়ে উঠেছেন 'সেন্সার্' কর্তৃপক্ষ। সরকারি ও বেসরকারি জনকয়েক সদস্য নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। তাঁদের উপর গভর্মেণ্ট্ চিত্রশাসনের ভার অর্পণ করেন। এঁরা অনুমোদন না করলে কোনো চলচ্চিত্র কোম্পানীর কোনো ছবিই সাধারণ্যে প্রকাশের অধিকার থাকেনা। এই চিত্রশাসকসমিতিই 'সেন্সার্' নামে অভিহিত হ'ন। একই ছবি বিভিন্ন দেশের সেন্সার্ কর্তৃপক্ষের খেয়াল ও খুশীমত ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ ক'রতে বাধ্য হ'য়েছে। বার্লিনে যে ছবির অংশবিশেষ হয়ত' সবচেয়ে বেশী প্রশংসা অর্জ্জন কোর্‌ছে, লণ্ডনে সে ছবির ঠিক্ সেই অংশটুকুই হয়ত সেন্সার্ প্রভুদের কৃপায় ছবি থেকে একেবারে কেটে বাদ দিয়ে দেখাতে হ'চ্ছে! এতে যে ছবির সুষমা ও সৌষ্ঠবের কতখানি ক্ষতি হ'চ্ছে সেদিকে তাঁদের কারুর দৃষ্টি থাকে না। এই উপদ্রবের হাত থেকে ফিল্‌ম শিল্পকে রক্ষা ক'রতে হ'লে বিভিন্ন দেশের 'সেন্সার' কর্তৃপক্ষদের একত্র ক'রে একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়ম কানুন বিধিবদ্ধ করা প্রয়োজন, কারণ, তাহ'লে কোম্পানীরা একটা সঠিক্ হদিশ পেতে পারে, যে তাঁদের ছবিতে কী থাকা উচিত নয়, বা কী থাকলে তা 'সেন্সার' কর্তৃপক্ষের মনোনীত হবেনা। উপস্থিত ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের সেন্সার্ কর্তৃপক্ষের ভিন্ন ভিন্ন রুচি ও নীতিজ্ঞানের উৎপাতে এক একখানি ছবির সম্বন্ধে রকম রকম আপত্তি উত্থাপিত হ'তে দেখা যায়। অনেক সময় এইসব আপত্তি একান্ত অর্থহীন এবং হাস্যকর বলেও মনে হয়। যেমন দৃষ্টান্ত স্বরূপ সুইডিশ্ ছবি "নিরানন্দপথের" (Joyless Street) উল্লেখ করা যেতে পারে। 'সেন্সার্' প্রভুদের অনুগ্রহে অনেক ভালো ভালো ফিল্‌ম যেমন তাঁদের অভিরুচিমত ছাঁটকাট হয়ে নষ্ট হ'য়ে যায়, "নিরানন্দপথ" ছবিখানিরও ঠিক সেই দশা হয়েছিল। প্রতিদিন ষোলো ঘণ্টা ক'রে খেটে চৌত্রিশদিনে এই ছবি শেষ হ'য়েছিল। ছবিখানি আসলে দশ হাজার ফুট লম্বা ছিল, যেমন 'বেন্‌হুর্' কিম্বা 'বিগ্‌প্যারেড্'। প্যারিসের সেন্সার প্রভুরা এর দু'হাজার ফুট ছেঁটে দিলেন এবং যতগুলি 'পথের' দৃশ্য ছিল প্রত্যেকটি বাদ দিয়ে দিলেন। ভীয়েনায় দেখাবার সময় 'কসাইয়ের যতগুলি দৃশ্য ছিল সব 'কাটা' পড়েছিল। অথচ এই 'কসাইয়ের ভূমিকায় বিখ্যাত জার্ম্মান নট হ্বার্ণার ক্রাস্ (Werner Krauss) অভিনয় করেছিলেন। রাশিয়া এই ছবির মার্কিন 'সৈনিক'কে 'ডাক্তার' করে নিলে এবং যে মেয়েটি খুন ক'রেছিল, তাকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে কসাইকেই খুনি ক'রে নিলে। জার্ম্মানীতে এ ছবিখানি এক বছর চলবার পর হঠাৎ এই সেন্সার্ প্রভুদের কোপ দৃষ্টিতে পড়েছিল। আমেরিকায় এ ছবিখানি দেখানোই হ'লনা মোটে। ইংলণ্ডেও সেন্সার্ কর্তৃপক্ষরা এ ছবিখানি পাশ করেনি। শুধু "ফিল্‌ম সোসাইটির" সভ্যগণের সামনে একবার মাত্র দেখানো হয়েছিল। অথচ, চিত্রকলা, অভিনয় নৈপুণ্য, প্রয়োগ-কৌশল প্রভৃতি সকল দিক দিয়েই এ ছবিখানি হয়েছিল একটি নূতন সৃষ্টি। "আউয়ার্ ড্যান্সিং ডটার্স" (আমাদের নৃত্যকুশলা কন্যারা) এবং "হট্ ফর প্যারিস্" (প্যারিসের পক্ষেও অসহ্য) ছবি দু'খানির মত অত বেশী নোংরাও নয় এ ছবি। তবু অরসিক সেন্সার্ কমিটি ও দু'খানি ছবি পাশ করেছিলেন, কিন্তু "নিরানন্দ

সুনয়না মার্ণালস ২৩৪

সুন্দরী ক্লডিট্‌ কোলবার্ট্‌ ২৩০

আমাদের দল (Ourgang)   ১৩৫

জ্যাকী কুপার   ২৪৪

পথ" তাঁদের হাতে নির্ম্মমভাবে নিহত হ'য়েছিল। সুতরাং ওঁদের বিচার-বিবেচনার উপর একটুও নির্ভর করা চলেনা। আমাদের দেশেও এই "সেন্সারের" উৎপাত সুরু হয়েছে। এখন থেকে চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীরা সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে এর কোনো প্রতিবিধান না করলে পরে এঁদের হাতে হয়ত' অনেক লাঞ্ছনাই সইতে হবে।

চলচ্চিত্রে শিশু অভিনেতৃ

এদের অভিনয় সম্বন্ধে কিছু না ব'ললে সিনেমার কথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে ব'লে মনে করি। যতদূর মনে পড়ে শিশুদের মধ্যে চলচ্চিত্রে প্রথম দর্শকদের চিত্তাকর্ষণ করেছিল শিশু অভিনেতা Bob (Robert); আদর ক'রে একে সবাই ব'লতো 'ববি'। তারপর এসেছিল ওস্তাদ্ ছেলে 'জ্যাকী কুগান' পর্দ্দার উপর অভিনয় ক'রতে। এই শিশুর সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় দীর্ঘকাল সকলকে প্রীত ও চমৎকৃত করেছে। আজকাল জ্যাকী কুগানকেও অভিনয় নৈপুণ্যে অতিক্রম ক'রে গেছে—প্রতিভাশালী শিশু নট 'জ্যাকী কুপার'। শিশু অভিনেত্রীদের মধ্যে বোধহয় 'বেবি পেগীর' কৃতিত্ব আজও কেউ ম্লান ক'রতে পারেনি। পূর্ব্বে রঙ্গমঞ্চ বা চলচ্চিত্রের জন্য একটি শিশু, অভিনেতা বা অভিনেত্রী সংগ্রহ করা একরকম প্রায় দুঃসাধ্য ছিল। আজকাল কিন্তু তা সহজ ও সুলভ হ'য়ে পড়েছে। শিশুদের নিয়ে হাস্য-রস-প্রধান চিত্র ও করুণ-রসাত্মক চিত্র যে অতি অপূর্ব্ব ও উপভোগ্য ক'রে তোলা যায় মেট্রো গোল্ড্‌উইন্ মেয়ার কোম্পানী সে সন্ধান জানতে পেরে একেবারে 'আমাদের দল' (Our Gang) নাম দিয়ে একটি শিশু-অভিনেতৃ-বাহিনী গঠন ক'রে রেখেছিলেন। এদের নিয়ে তাঁরা একাধিক উপভোগ্য চিত্র তুলে দর্শকদের আনন্দ দিতে পেরেছিলেন। এই শিশু-চমূ চিত্রপ্রিয়দের সকলেরই কাছে বিশেষ সুপরিচিত। চার্লি চ্যাপলীনের "বাচ্ছা" (The Kid) ছবিতে জ্যাকী কুগানের অভিনয় যাঁরা দেখেছেন তাঁরা সহজে তাকে ভুলতে পারবেন না। 'হেলেনের ছেলেরা' (Helen's Babies) চিত্রে 'বেবি পেগীর' অভিনয়-নৈপুণ্য তাকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। শিশু 'স্কিপী'র (Skippy) ভূমিকায় সম্প্রতি 'জ্যাকী কুপার' যে অদ্ভুত অভিনয়-চাতুর্য্য প্রকাশ করেছে তা' বহু পরিণত বয়স্ক অভিনেতার মধ্যেও দেখা যায়না। জনী, লুসী, রবি, মেরী, জেন, ফ্র্যাঙ্ক্ প্রভৃতি আরও অনেকগুলি ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে চলচ্চিত্রে অভিনয় ক'রে বেশ সুনাম অর্জ্জন ক'রতে পেরেছিল। ছবির মধ্যে উপযুক্ত স্থানে ও আবশ্যকীয় অবস্থায় একটু বুদ্ধি-বিবেচনার সঙ্গে ও সুকৌশলে যে পরিচালক ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের ব্যবহার ক'রতে পারেন তাঁর ছবি লোকপ্রিয় না হ'য়েই পারেনা। দেশী ছবিতে এখানকার পরিচালকেরা বড় বড় অভিনেতাদেরই ভালো ক'রে চালাতে পারেন না। শিশুদের চালানা তার চেয়েও ঢের বেশী কঠিন। তাই, মাত্র দু' একখানি দেশী ফিল্মে ছোট ছেলে মেয়েদের নামাতে দেখা গেছে। তার মধ্যে সুপরিচালক শ্রীযুক্ত চারু রায় তাঁর 'বিগ্রহ' ছবিতে একটি শিশুকে অতি চমৎকার সুকৌশলে ব্যবহার করেছেন। এইখানে শিল্পীর কলা ও কল্পনা দর্শকদের হৃদয় সহজেই জয় করতে পেরেছে।

উপসংহার

চলচ্চিত্র সম্বন্ধে প্রায় সকল কথারই আলোচনা বিশদভাবে করা হ'ল। এ বিষয়ে যা কিছু জানবার ও বুঝবার আছে সমস্তই একে একে বলা হয়েছে। এর প্রথম উদ্ভাবন থেকে ক্রমোন্নতি, প্রসার, পরিণতি ও প্রভাব সম্বন্ধে আমরা সবিস্তারে আলোচনা করেছি। চলচ্চিত্রের ব্যবসায়ের দিক, তার বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক দিক এবং সৌন্দর্য্যের দিকেরও সম্পূর্ণ আলোচনা হ'য়েছে। চলচ্চিত্রের দৃশ্যরচন-রীতি, আলোক-রহস্য, রূপসজ্জা, বাক্-সন্নিবেশ, চিত্র-নাট্য, চিত্রাভিনয়, ও চিত্র-গ্রহণ প্রভৃতি এ বিষয়ের প্রত্যেক প্রয়োজনীয় ও অতি আবশ্যকীয় বিভাগগুলির সকল জ্ঞাতব্য তথ্যই এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। উপসংহারে কেবল সামান্য কয়েকটি খুঁটিনাটি ব্যাপারের উল্লেখ করেই শেষ করবো।

চলচ্চিত্র (Cinematograph)—পূর্ব্বেই বলেছি যে চলচ্চিত্র আর কিছুই নয়, স্থির আলোক-চিত্রেরই একটা বিশেষ রূপ। আলোক-চিত্রের ভিত্তির উপরই এর অবস্থান। 'আলোক-চিত্র' এই নাম থেকেই বোঝা যায় যে এ ছবি আলোর তুলিতে আঁকা হয়। অর্থাৎ, আলোক-প্রতিহত কোনো বস্তু বা ব্যক্তির আকৃতি অনুযায়ী প্রতিবিম্বিত আলোকরশ্মিগুলি সংহত ক'রে এমন কোনো একটি জিনিসের উপর ধরা—যার বুকে সেই বস্তু বা ব্যক্তির আকৃতি হ'তে প্রতিফলিত আলোক-প্রতিকৃতিটি স্থায়ীভাবে লিপিবদ্ধ হ'য়ে যায়! সেই হ'য়ে ওঠে—আলোক-চিত্র! যেমন জলের উপর আমাদের যে আলোক-প্রতিবিম্ব পড়ে বা মুকুরে আমাদের যে ছায়া প্রতিফলিত হয়, আলোক প্রতিহত সেই প্রতিকৃতি যদি স্থায়ীভাবে ধ'রে রাখতে পারা যায় তাহ'লেই আমাদের ছবি পাওয়া যাবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে চলচ্চিত্রের ভিত্তি যে আলোক-চিত্র, তার গোড়ার কথা হ'চ্ছে—আলোক-বিজ্ঞান, যা' সম্যকরূপে অনুশীলন ক'রলে ইচ্ছামত ছবি সৃষ্টি করা ও তা' প্রকৃষ্টরূপে লিপিবদ্ধ করার কৌশল সহজেই আয়ত্ত হ'তে পারে।

ছায়াধর-যন্ত্র (Camera)—চলচ্চিত্রের জন্য যে ছায়াধর-যন্ত্র ব্যবহার হয় সাধারণ ছায়াধর-যন্ত্র অপেক্ষা তার কলকব্জা মাত্র দু'চারটে বেশী। সাধারণ ছায়াধর-যন্ত্রের প্রধান কলকব্জা হ'চ্ছে তিনটি; ১। আলোক বিরোধী পত্রীকৌটা (Light proof box or magazine) যার মধ্যে অগ্রাহিত বিষম-ছায়াপত্রী (Unexposed Negative film) থাকে। ২। মণিমুকুর (Lens) যার সাহায্যে কোনও বস্তু বা ব্যক্তির আলোক-প্রতিহত-প্রতিকৃতি সংহত হ'য়ে উক্ত ছায়াপত্রী উপর প্রতিফলিত ও লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। ৩। ঢাকনা (shutter) যা' মণিমুকুরে প্রতিফলিত আলোক-রশ্মিকে ছায়াপত্রীরসম্মুখ থেকে ইচ্ছামত আড়াল ক'রে রাখতে পারে। চলচ্চিত্রের ছায়াধর-যন্ত্রে এ তিনটি ব্যবস্থা ত' আছেই, তা'

জ্যাকী সেরার্ল ও মিজি গ্রীণ (Skippy চিত্রে) ২৯৫

জ্যাকী কুগান্
(Kid চিত্রে)
২৩৭
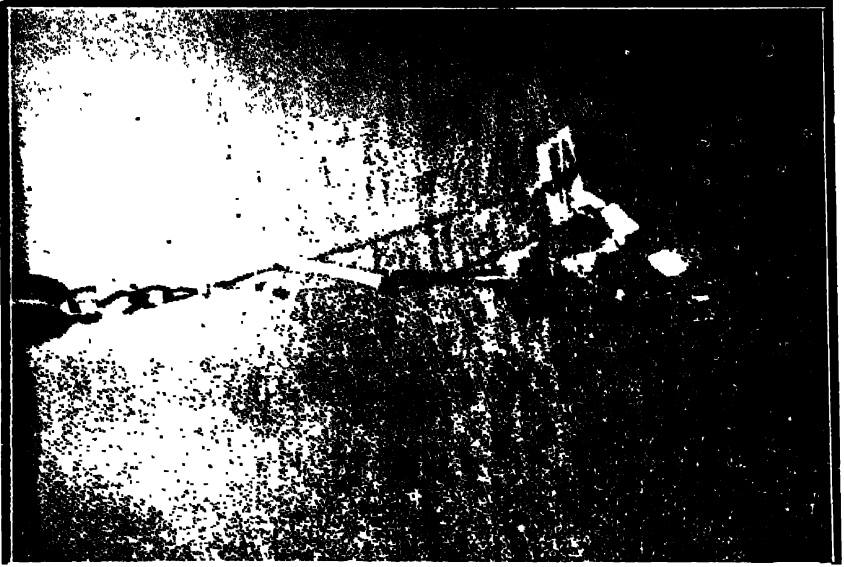
সামুদ্রিক ক্যামেরা—(সমুদ্রের তলদেশের ছবি নেবার জন্য ডুবুরীর পোষাক পরে ওয়াটার্ প্রুফ্ ক্যামেরা নিয়ে আলোকচিত্রকর সাগরগর্ভে প্রবেশ করছেন।) ২৮৬
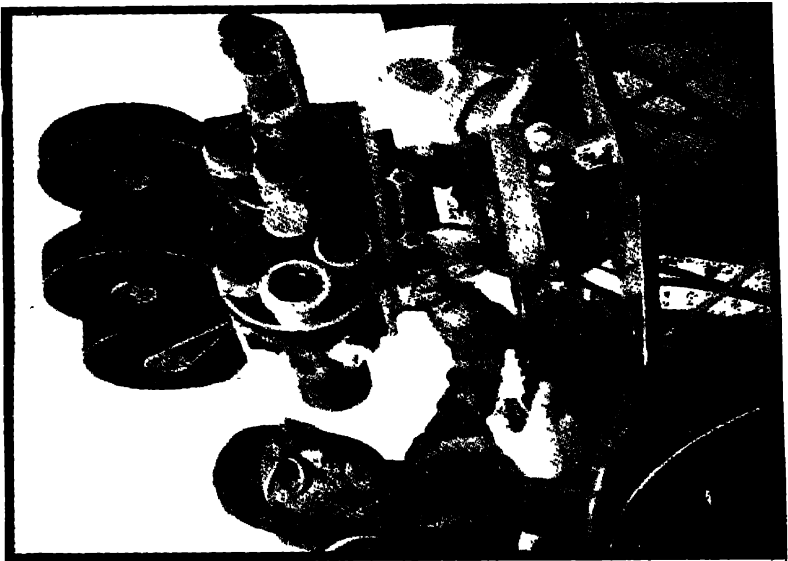
বৈমানিক ক্যামেরা (আকাশে উঠে ব্যোমযান ও বিমানপোতের ছবি নেওয়ার জন্য।) ২৪৭

ছাড়া আরও আছে চিত্রপত্রীকে গতিশীল করবার জন্য একটা অতিরিক্ত ব্যবস্থা এবং সেই ছায়াপত্রীর গতির সঙ্গে সমতালে মণিমুকুরের আলোর ঢাকনাটিও খোলা ও বন্ধ হওয়ার কৌশল। স্থিরচিত্রের ছায়াপত্রী অপেক্ষা চলচ্চিত্রের ছায়াপত্রী দৈর্ঘ্যে শতগুণ বেশী বলে তার পত্রীকৌটা তদনুসারে পরিবর্ত্তিত হয়েছে। এ ছাড়া ছোটখাটো খুচরো কলকব্জা চলচ্চিত্রের' ছায়াধর-যন্ত্রে আরও অনেক রকম আছে।

ছবি তোলা (Shooting)—অভিজ্ঞ আলোক চিত্র-শিল্পী মাত্রেই একটু যত্ন ও চেষ্টা করলেই সহজে চলচ্চিত্রে ছবি তুলতে সক্ষম হবেন। চলচ্চিত্রে ছবি তোলবার সময় কোন্ কোন্ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার তা পূর্ব্বেই বর্ণিত হ'য়েছে। তার মধ্যে প্রধান বিষয় হ'চ্ছে আলোক (light) এবং চিত্রের লক্ষ্য-নির্ণয় বা ছায়া সন্ধান। (focussing) আলো মোটামুটি দুরকম। চড়া আলো (Hard light) আর নরম আলো (soft light)। সূর্য্যকরোজ্জ্বল দিনের আলো হ'চ্ছে চড়া, আর মেঘলা দিনের মৃদু আলো হচ্ছে নরম. এই দুরকম আলোয় ছবি তুললে ছবিও হয় দুরকম। চড়া আলোর ছবি হয় একটু কড়া গোছের। কারণ তা'তে ছায়া (shade) পড়ে বেশ ঘন কালো হ'য়ে এবং আকৃতির কোনাচে বাঁক (angular curves) গুলোর রেখা বড্ড বেশী স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। নরম আলোয় ছবি হ'য়ে যায় পানসে! (flat) কারণ ছায়া পড়ে না বলে আলো-ছায়ার বৈষম্য থাকে না, এবং আকৃতির কোনাচে বাঁকগুলোর রেখা হয়ে যায় একেবারে কোমল! এ ছাড়া কোনো বস্তু বা ব্যক্তির উপর বিভিন্ন দিক থেকে আলো প'ড়লে তার ছবিও ওঠে ভিন্ন ভিন্ন ধরণের। সাধারণতঃ চিত্রেয় বস্তু বা ব্যক্তির উপর আলো এসে প'ড়তে পারে পাঁচটি বিভিন্ন দিক থেকে। পিছন থেকে, সামনে থেকে, দক্ষিণ-পার্শ্ব থেকে, বাম-পার্শ্ব থেকে, এবং মাথার উপর থেকে। স্থিরচিত্রে আলো যাতে ক্যামেরার পিছন থেকে এসে পড়ে সেই দিকেই লক্ষ্য রাখতে হয়, কিন্তু চলচ্চিত্রে সব সময় তা করলে হবে না ; চলচ্চিত্রে আলো প্রথমটা যাতে কোনো একটা পাশ থেকে এসে পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। কারণ, তাতে আলো-ছায়ার বৈষম্য খোলে এবং আকৃতি বেশ স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। তার উপর যদি আবার পিছনে এমন ভাবে আলোর ব্যবস্থা করা যায় যা সামনে থেকে ক্যামেরার চোখে এসে লাগবে না অথচ পাশ থেকে ফুটে বেরুবে, তাহ'লে সে ছবি হ'য়ে উঠবে ঠিক চিত্রকরের তুলিতে আঁকা অপরূপ প্রতিকৃতি! আলো-ছায়ার তারতম্য ক'রতে জানার উপরই আলোক-চিত্রকরের কলা-নৈপুণ্য নির্ভর করে। একটা হিসাব জেনে রাখলেই সকল সময় ছবি বেশ নির্দ্দোষ হ'য়ে উঠবে ; সেটা হ'চ্ছে এই যে—চিত্রেয় বস্তু বা ব্যক্তির যে দিকটায় অন্ধকার বা ছায়া দেখানো হবে সেদিকে যে পরিমাণ আলো ফেলা হবে—ঠিক তার দ্বিগুণ আলো ফেলতে হবে ছবির যেদিকটা আলোকিত বা উজ্জ্বল রাখা হবে—সেদিকে। আলোকচিত্রে লক্ষ্য-নির্ণয় বা ছায়া-সন্ধান (focussing) আজকাল খুব সহজ হ'য়ে গেছে, কারণ ছায়াধর-যন্ত্রের সঙ্গেই চিত্রের লক্ষ্যভেদে সাহায্যকারী কলকব্জা সংযুক্ত থাকে। ছবি তোলবার সময় দু'রকম অবস্থানে ক্যামেরা রেখে ব্যবহার করা চলে। এক রকম হ'চ্ছে—ক্যামেরা আলোক-চিত্র-শিল্পীর চোখের সমান উঁচু ক'রে রেখে, আর এক রকম হ'চ্ছে—ক্যামেরা তাঁর কটিদেশের সমান নীচু ক'রে রেখে। এ

দু'য়ের মধ্যে ক্যামেরা চোখের সমান উঁচু ক'রে রেখে ছবি তোলাটাই সব দিক দিয়ে সুবিধাজনক। আর একটা কথা—ক্যামেরার আসন (base) সকল সময় অটল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা চাই, তবে, প্রয়োজনমত 'পর্য্যবেক্ষণ-চিত্র' 'দোলন-পট' প্রভৃতি তোলবার সময় আসন ঠিক রেখে কেবলমাত্র ছায়াধর-যন্ত্রটিকে ঘোরানো-ফেরানো (Tilting) চলতে পারে।

পারম্পর্য্য (Continuity)—ছবি তোলবার সময় আলোক চিত্রকরের লক্ষ্য রাখা উচিত যে গল্পানুযায়ী অভিনয়ের পারম্পর্য্য ঠিক রক্ষিত হ'চ্ছে কিনা। ধরুন যদি কোনো গল্পে থাকে গৃহকর্ত্তা মাতাল। মদ আর জীবনে কখন ছোঁবেন না বলে প্রতিজ্ঞা ক'রেছেন, কিন্তু না খেয়েও থাকতে পারছেন না। অস্থির হ'য়ে কর্ত্তা ঘর থেকে বেরিয়ে প'ড়লেন গলির মোড়ের শুঁড়ির দোকান থেকে মদ আনতে। তিনি যদি ঘরের বামদিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে ক্যামেরার সামনে দিয়ে হেঁটে ডানদিকে চলতে সুরু করেন তাহ'লে বরাবর তাঁকে সেই দক্ষিণমুখেই চ'ল্‌তে হবে যতক্ষণ না শুঁড়ির দোকানে গিয়ে পৌঁছবেন। তাঁর ভাই যদি তাঁকে নিষেধ করবার জন্য পেছু নেন তাহ'লে তাঁকেও আসতে হবে সেই বামদিক থেকে দক্ষিণ দিকে। কিন্তু যদি তাঁর কোনো বন্ধু তাঁকে দেখতে পেয়ে পথের মাঝখানে নিবারণ ক'রতে আসেন, তাঁকে আসতে হবে দক্ষিণ দিক থেকে বামদিকে বরাবর। তাঁর কথা শুনে কর্ত্তা যদি ফেরেন তাহলে তাঁকে আসতে হবে তখন দক্ষিণ দিক থেকে বামদিকে ফিরে। এ ত গেলো গতির পারম্পর্য্য ; তারপর আছে ঘটনার পারম্পর্য্য। যে দৃশ্যে যে ব্যাপার ঘ'টছে ঠিক তার আগের দৃশ্যে যাতে সেই ঘটনার পূর্ব্ব সূচনার ছবি থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা চাই, এই যোগ-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে না পারলে পারম্পর্য্য রক্ষিত হবে না। দর্শকদের কাছেও ব্যাপারটা গোঁজামেলে ঠেকবে।

সঙ্গতি (Tempo)—ছবিতে পারম্পর্য্য রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে গতি ও ঘটনার সঙ্গতি এবং সময়ের সমতা যাতে ঠিক বজায় থাকে সেদিকেও সবিশেষ লক্ষ্যরাখা দরকার। ধরুন, যদি পূর্ব্বোক্ত মাতাল কর্ত্তাটি ছবিতে যে দৃশ্যে বাড়ী থেকে বেরুলেন ধীর মন্থরপদে, পরের দৃশ্যে তাঁকে যদি হঠাৎ দেখি ছুটতে এবং তার পরের দৃশ্যে দেখি হন্ হন করে চলতে তা'হলে সে গতির মাত্রা বিপর্য্যয় ঘটবে। কিন্তু, তিন দৃশ্যে তাঁর এই তিন রকম গতিরই মাত্রা বজায় থাকতে পারে যদি আমরা এই পার্থক্যের যুক্তিযুক্ত কারণও সঙ্গে সঙ্গে দেখাতে পারি। যেমন ধরুন, কর্ত্তা শুঁড়ির দোকানে যাচ্ছেন দেখে ভাই যদি তাঁকে তেড়ে ধরতে যায় তিনি টের পেয়ে ছুটতে পারেন, কিম্বা কেউ তাঁর পিছু নিয়েছে বুঝতে পেরে তিনি হন্ হন্ ক'রে জোরে হাঁটতে পারেন, তা'হলে আর ছবির মাত্রা-বিপর্য্যয় ঘটবেনা। 'কুইক্ টেম্পো' বা 'শ্লো-টেম্পা' কোনোটাই দোষের হয়না, যদি—সেটা ঘটনার সঙ্গতি এবং সময়ের সমতা রক্ষার অনুকূল হয়। এ ছাড়া মূল ছবিতে দু'টি পর পর দৃশ্যে বিপরীত ঘটনা ঘটলে মাত্রা-বিপর্য্যয় অবশ্যম্ভাবী ; কিন্তু, এ রকম ঘটনার ব্যাপারেও এই সঙ্গতি বজায় রাখা সম্ভব হয় যদি ওই দুটি ঘটনার মাঝখানে দেশ-কালের ব্যবধানজনিত পরিবর্ত্তনেরও ইঙ্গিত করা থাকে। সকল দিক দিয়ে ছবির এই মাত্রা বা সঙ্গতি (Tempo) যাতে পরের পর আগাগোড়া বজায় থাকে সেদিকে পরিচালক এবং আলোক-চিত্র শিল্পী উভয়েরই অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য।

[illegible] চিত্র (Wing's ছবিতে চিত্রগড়ে তৈরী রণক্ষেত্রের দৃশ্য
হতাহত মৃত ব্যক্তিগণ ও দগ্ধ বৃক্ষগুলি কৃত্রিম।) ২৫৯

উপচিত্র—(The Black Pirate ছবিতে চিত্রগড়ে তৈরী মরুদ্বীপের দৃশ্য
তরু, লতা, পর্ব্বত ও সমুদ্র সমস্তই Studio Set) ২৪৮

শিক্ষাচিত্র—(The Frogs ছবির একটি দৃশ্যে ব্যাঙাচির ব্যাপার) ২৫০

"বোগ্‌দাদের দস্যু" চিত্রে পক্ষীরাজ অশ্বপৃষ্ঠে ডগ্‌লাস ফেয়ারব্যাঙ্ক্‌স্‌ ২৫২

"লিট্‌ল লর্ড ফন্ট্‌লেরয়" নাটকে মেরী পিকফোর্ড্‌ নিজেকেই নিজে আলিঙ্গন করছেন। ২৫১
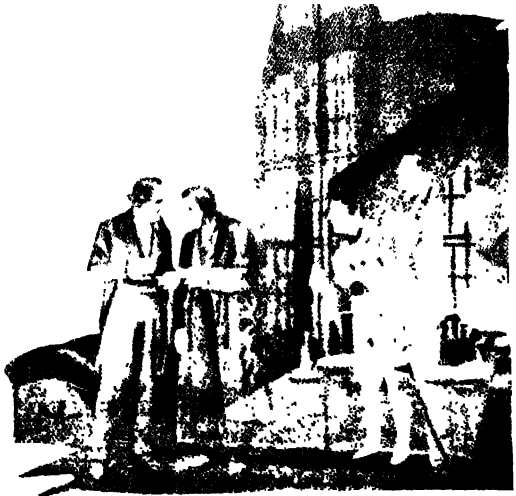
"ব্যো ব্রামেল্‌" নাটকে প্রেতযোনির দৃশ্য ২৫৩

অদৃশ্যলোকের চলচ্চিত্র—পানাপুকুরের এক ফোঁটা জলে কি আছে আমরা কেউ চোখে তা' দেখতে পাইনি, কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্র যখন সেই একফোঁটা জলের মধ্যে অসংখ্য জীবের অস্তিত্ব আমাদের চোখের সামনে মেলে ধরে তখন আমাদের বিস্ময়ের আর অবধি থাকে না ! অণুবীক্ষণ যে অদৃশ্যলোকের রহস্য উদ্ঘাটিত ক'রে লোক-লোচনের গোচর করেছে চলচ্চিত্র তার সুযোগ নিয়ে সাধারণ মানুষের কৌতূহল ও বিস্ময় এ বিষয়ে আরও অনেকখানি বাড়িয়ে তুলেছে।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের যে ছিদ্রপথে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বৈজ্ঞানিক তার অনুশীলনাগারে নিত্য নব নব প্রাকৃতিক প্রহেলিকার সমাধান ক'রছিলেন, চলচ্চিত্র ক্যামেরা গিয়ে সে ছিদ্রপথেই উঁকি মেরে অণুবীক্ষণের সাহায্যে অদৃশ্যলোকের জীবন্ত চিত্র তুলে এনে পর্দ্দার উপর ফেলে আজ তা' জনসাধারণের দৃষ্টিগম্য করেছে। অবশ্য একথা বলাই বাহুল্য যে মানুষের চোখের জন্য অণুবীক্ষণ যন্ত্রে যে পরকলা (Eyepiece) থাকে ক্যামেরার চোখের জন্য তা' চলে না ; ক্যামেরার মণিমুকুর এবং অণুবীক্ষণের পরকলা দুইই খুলে নেওয়া হয় এবং তার প্রতিক্ষেপক দর্পণটিও (Reflex Mirror) সরিয়ে এমন কোনো উজ্জ্বলতম দীপের ব্যবস্থা করা হয়, যার আলোক-রশ্মী ইচ্ছামত ঘনীভূত ও সংহত ক'রে নেওয়া যায়।

মানুষের দেহের মধ্যে কি আছে মানুষ তা' চোখে দেখতে পায় না—কিন্তু রঞ্জন-রশ্মীপাতে (X'ray) তা ক্যামেরার দৃষ্টিগোচর হয়। যা ক্যামেরা দেখে নিতে পারে তা' সে চলচ্চিত্রে সর্ব্বলোককে দেখাতেও পারে।

বিশাল সাগরতলে কত কি রহস্য গোপন রয়েছে ! শুধু যে নানা বিচিত্র সামুদ্রিক মৎস্য ও জীবজন্তু তাই নয়,—সমুদ্র রত্নগর্ভা নামেও খ্যাত ! সেই সমুদ্রগর্ভের বিচিত্র চিত্র—সেই অতলতলের গোপন রহস্য আজ চলচ্চিত্র টেনে এনে তুলে ধ'রেছে সকলের চোখের সামনে। অবশ্য আকাশের রহস্যভেদের জন্য যেমন 'বৈমানিক-ক্যামেরা' সৃষ্টি হয়েছে ; সিন্ধুগর্ভের জন্য তেমনি 'সামুদ্রিক ক্যামেরাও' তৈরী হ'য়েছে এবং ডুবুরীর মত আলোক চিত্র-শিল্পীরা সাগরতলে ডুব দিয়ে তার চলচ্চিত্র তুলেও আনছেন, কিন্তু সাগর চিত্রের অধিকাংশই তোলা হয়, সাগরতীরস্থ 'এ্যাকোয়েরিয়ম্' বা 'জলজীবাগারে'। এই জলজীবাগারে বড় বড় কাচের জলাধারের মধ্যে নানা বিচিত্র সামুদ্রিক প্রাণীকে অতি যত্নে পালন করা হয়। চলচ্চিত্রের ক্যামেরা সেখানে ঢুকে তীব্র আলোক সম্পাতের কৌশলে সেই জলাধারাস্থ জীবদের এমন সুন্দর চলচ্চিত্র তুলে এনে দেখায় যে আমরা মনে করি—সমুদ্রগর্ভেই এ ছবি তোলা হয়েছে !

চিত্রগুপ্ত (Script-Clerk)—প্রত্যেক চিত্র-প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মীদের মধ্যে এমন একজন থাকেন যাঁর কাজ হ'চ্ছে শুধু ছবির প্রত্যেক দৃশ্যের প্রত্যেক খুটিনাটির একটি নির্ভুল হিসাব রাখা। এই লোকটির নাম দেওয়া যায়, চিত্রগুপ্ত। এ কাজটি যেমনি কঠিন তেমনি অত্যাবশ্যকীয়। কারণ, পূর্ব্বেই বলেছি, ছবি যখন তোলা হয় তখন চিত্রনাট্য অনুযায়ী ঠিক পরের পর দৃশ্যগুলি তোলা হয়না। অন্দরের দৃশ্য—(Interior scenes) এবং বহির্দৃশ্য (Exterior-scenes) গুলি পৃথক ক'রে বেছে নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন সময় তোলা হয়। ধরুন,

আজ হয়ত' তোলা হ'লো—নায়ক বিদেশে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে সেজে-গুজে ঘর থেকে বেরুলেন। তারপর হয়ত পনেরো দিন পরে তোলা হবে তিনি বাড়ী থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সীতে উঠ্‌ছেন ট্রেন ধরতে ষ্টেশনে যাবার জন্য। এখানে 'চিত্রগুপ্ত' যদি তাঁর 'নোটবই' হাতে শ্যেন-দৃষ্টি নিয়ে প্রত্যেক খুটি-নাটির হিসাবটি না টুকে রাখেন তাহ'লে এমনতর ভুল হ'তে পারে যে নায়ক ঘর থেকে বেরুচ্ছিলেন 'স্যুট' পরে; কিন্তু ট্যাক্সীতে ওঠবার সময় দেখলুম তাঁকে ধুতি চাদর পরা! চিত্রগুপ্তের কাজ হ'চ্ছে তাঁর নোট বই দেখে সেই নায়ককে বলে দেওয়া যে সেদিন সে দৃশ্যে তার পরিধানে কী পোষাক ছিল। কোন্ রংয়ের কি ফ্যাশানের জামা। পায়ে মোজা ছিল কিনা; কি রকম জুতো ছিল তার পায়ে। হাতে 'রিষ্ট্‌ওয়াচ' বাঁধা ছিল কিনা। মাথার চুল কি ভাবে আঁচড়ানো ছিল। হাতে ছড়ি ছিল না ছাতা ছিল ইত্যাদি। কারণ, সেদিনের ঠিক সেই বেশেই তাঁকে বাড়ী থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সীতে উঠতে হবে যে! চিত্রগুপ্তের এই হিসাব ছবির প্রত্যেক দৃশ্যের 'আগম' 'নির্গমের' (Exit & Entrance) ধারা বজায় রাখারও সাহায্য করে এবং চিত্র-সম্পাদন (Editing) ও পরিচয়লিপি (Titles) সংযোগ করবার সময়ও বিশেষ কাজে লাগে। ছবির নক্সায় (shooting Script) প্রত্যেক দৃশ্যের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করা থাকে। ছবি তোলবার সময় সেই সংখ্যাটিও প্রত্যেক দৃশ্যের আলোক-চিত্রের উপর তুলে নেওয়া হয়। সংখ্যার ছবি নেওয়া হয় একখানি শ্লেটের বা বোর্ডের সাহায্যে। শ্লেটের উপর বা বোর্ডের উপর সংখ্যাটি লিখে শ্লেটখানি বা বোর্ডখানি ক্যামেরার সামনে ধরা হয় এই উপায়ে ছবির নাম, পরিচালকের নাম, চিত্র-শিল্পীর নাম, অভিনেতৃবর্গের নাম, এমন কি চিত্র-পরিচয়ও ক্যামেরার ভিতর দিয়ে চিত্রপত্রীর উপর তুলে নেওয়া চলে।

সম্পাদন (Editing)—চিত্র-সম্পাদনের উপর যে ছবির সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে এ কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হ'য়েছে। তার কারণ, চিত্র-সম্পাদনার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে ছবিতে গল্পটিকে গুছিয়ে বলা এবং চিত্তাকর্ষক ক'রে চোখের সামনে তুলে ধরা। সুতরাং সম্পাদকের কাজ হ'চ্ছে ছবির অবান্তর ও অপ্রয়োজনীয় অংশ কেটে বাদ দেওয়া। ছবি যাতে কোথাও এক-ঘেয়ে না লাগে, এবং বিরক্তিকর বলে মনে না হয় তেমনি করে দৃশ্যগুলি সাজানো এবং জোড়া দেওয়া। চিত্রের সৌন্দর্য্যের দিক বা কলা-নৈপুণ্যের বৈশিষ্ট্য যাতে বেশ ফুটে ওঠে সেদিকে যত্নবান হওয়া। ভাবপ্রকাশের সৌকুমার্য্য অক্ষুণ্ন রাখা, ছবির পারম্পর্য্য, ঘটনার সঙ্গতি, অভিনয়ের ঔৎকর্ষ, ও সমস্ত ছবিখানির মাত্রা বা সঙ্গতি ঠিক রাখাও অনেকখানি নির্ভর করে ছবির সুসম্পাদনার উপর।

চিত্র-নাট্য, ছবির নক্সা ও চিত্রগুপ্তের নোট-বই নিয়ে সম্পাদক প্রত্যেক দৃশ্যের সংখ্যা মিলিয়ে চিত্রধারা (Sequence) অনুযায়ী বিভিন্ন দৃশ্যের আনুসঙ্গিক ছবিগুলি পরের পর কেটে কেটে পৃথক করে নেন। প্রত্যেক দৃশ্যের ছবিগুলি এক একটি পৃথক লাটাইয়ে (spool) গুটিয়ে রেখে এক-টুক্‌রো কাগজে তার হদিশ লিখে এঁটে রাখেন। এক রকমের বা একই দৃশ্যের যত ছবি সব একত্র জড়ো করা হয়। তারপর ছবিখানিকে মোটামুটি সাজিয়ে ফেলে জোড়া হয় এবং লাটাইয়ে গোটানো হয়। তার আগে অবশ্য ছবির যত কিছু অভিনয় ও আলোক-চিত্র

সংক্রান্ত দোষ ত্রুটী সব ছেঁটে বাদ দিয়ে ফেলা হয়। আসল সম্পাদনার কাজ তারপরই সুরু হয়, অর্থাৎ প্রক্ষেপন যন্ত্রের সাহায্যে ছবিখানি পর্দ্দায় ফেলে কলা-সৌন্দর্য্যের দিক থেকে তার কোথায় কি অদল-বদল করতে হবে, বাদসাদ দিতে হবে, কোন্ দৃশ্যের পর কোন্ দৃশ্য দিলে গল্প জমে উঠ্‌বে ও ছবি চিত্তাকর্ষক হবে, সন্নিধচিত্র (close ups) গুলি ঠিক কোন্ জায়গায় দিতে পারলে বেশ লাগসই হবে, পরিচয় লিপি কোথায় কোথায় দেওয়া দরকার, এই সমস্ত স্থির ক'রে ফেলেন এবং তদনুসারে ছবিখানিকে সাজিয়ে সুসম্পূর্ণ ক'রে ফেলেন। অনেক সময় ছবির সৌন্দর্য্য ও সৌষ্ঠব বাড়াবার জন্য তাঁরা ভাঁড়ার (stock) থেকে কোনো পুরাতন ভালো ছবির কেটে-রাখা অতিরিক্ত অংশ নূতন ছবির সঙ্গে জুড়ে দেন। এটা প্রায়ই প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্পর্কে করা হয়, যেমন সূর্য্যাস্ত বা পর্ব্বত চূড়ায় সাগর-কূলে চন্দ্রোদয় কিম্বা মেঘাচ্ছন্ন ও বিদ্যুৎ-বিকীর্ণ আকাশ—ইত্যাদি। এ-ছাড়া ছবির সৌন্দর্য্য বাড়াবার জন্য সাম্পাদকেরা অনেক সময় রংয়ের সাহায্যও নেন (Tinting & Toning) যেমন জঙ্গলের দৃশ্যগুলি সেপীয়ায় (sepia) ছাপলে ভালো হয়; তুষার, মেঘ, বা সমুদ্রের দৃশ্য নীলে ছাপলে ভাল হয়; আলোকোজ্জ্বল গৃহের অভ্যন্তর-দৃশ্য এ্যাম্বারে (amber) রং করলে খোলে; শশ্য-ক্ষেত্র বা উদ্যানের দৃশ্য সবুজ রং করলে মানায়; আগুনের রং লাল ক'রলে ভাল হয়। ইত্যাদি।

সমাপ্ত
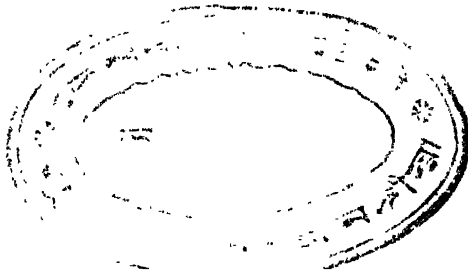
চলচ্চিত্রসংক্রান্ত বিশেষার্থবাচক শব্দের বাঙ্‌লা পরিভাষা

Abstract Art	অবিমিশ্র কলা	পৃঃ ৩৫
Abstract Film	নিছক ছায়া ছবি	৬৯
Accompaniment	সঙ্গত্	৭৭
Acting	অভিনয়	৩২
Action	অঙ্গভঙ্গী, নটনটীর কার্য্যকলাপ	৮৬
Additive process	যৌগিক প্রণালী	১৩৮
Adhesive Tape	আঠাযুক্ত ফিতা	৫৯
Aerial Camera	বৈমানিক ছায়াধর	১৪৫
Akelev Shot	অস্থির চিত্র, ধাবমান ছবি	৯৩
All-Star Film	নায়কনির্ব্বিশেষ চিত্র	৪৬
Amplifier	শব্দবর্দ্ধনী	৬১, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ১০৫
Angle	পাশের দিক, কোণ	৪৪
Angle Shot	বাঁকা ছবি, কোণাকোণি তোলা	৯০
Animated Gazette	মূর্ত্ত সংবাদ	২৯
Animal Series.	প্রাণী চিত্র	১০৪
Aperture	গবাক্ষ, ক্যামেরার মুখ	২৭
Apparatus	যন্ত্র, যন্ত্রপাতি	২২
Art	চারুকলা, শিল্প	৩০, ৩৫
Artist	অভিনেতা	১০৫
Art Director	কলানায়ক, সৌন্দর্য্যনায়ক	৪০, ৪৫, ৭১, ১১৭
Artistic Direction.	কলাসম্মত পরিচালন	৫৬, ৬০
Art Film	কলাপ্রধান ছায়াচিত্র	৭০
Art Production.	কলাসম্মত প্রযোজনা	৩৪, ৩৫
Arc-Lamp	আর্ক ল্যাম্প, দীপ্ত দীপ	৪৩
Architect	পট স্থপতি	৭১
Assistant Recordist	সহকারী ধ্বনিধর	৬৩
Atmosphere	আবহ	৪৮
Audion	শ্রবণী যন্ত্র	৬১
Automatic	স্বতক্রিয়	২৭
Automatic Action	স্বতক্রিয়া	২৭
Automatic Dissovle	স্বতর্লোপ	২৪
Back Ground	পটভূমি, পশ্চাদ্‌দৃশ্য	৪৫, ৯০, ১৩০
Back Light	পিছনের আলো	৪৯
Balance	মাত্রা, মান	৩৭
Ballad Film	গীতি চিত্র	৬৯
Big Close-up	বৃহত্তর বা অতি-সন্নিধ-চিত্র	৯০
Biograph	জীবালেখ্য	৯
Bioscope	জীববীক্ষণ যন্ত্র	৭
Board of Film Censor	চলচ্চিত্র শাসক সমিতি	১৪০

Booth	কুঠ্‌রি, ছই	৭৭
Business	নটাচরণ, অভিনয় নির্দ্দেশ	৯০, ৯২
Camera	ছায়াধর	২৪, ১৪২
Camera Angle	ছায়াধর-দৃষ্টি	১৪৪
Camera Booth	ছায়াধর-মণ্ডপ, ছায়াধর ছই	৪৪
Camera Gate	পত্রী-প্রবেশ পথ	১৩৯
Camera Man	ছায়া শিল্পী, ছায়াধর যন্ত্রী	২৮, ৪৫,৯২, ১১৫
Cameraphone	ছায়াস্বরধর, ছায়াবাণী যন্ত্র	৬০
Camera Tricks	ক্যামেরার কারচুপি	১২১
Caption	ব্যাখ্যান, ছেদপূরণ	৮৫
Cartoon Film	কৌতুক চিত্র	৩১, ৭০, ১৩৭, ১২৯
Cast	ভূমিকা লিপি	৮৯
Censorship	চিত্রশাসন	১৯, ১৪০
Censor	চিত্রশাসক	২০, ১৪০
Centre	কেন্দ্রস্থল, মধ্যভূমি	৯০
Centre Lamp	কেন্দ্রদীপ	৪৩
Centre Light	মাঝের আলো	৪৪
Centre Piece	মাঝের আস্‌বাব	৪৪
Central Figure	প্রধান চরিত্র	৮৯
Characters	পাত্রপাত্রী	৮৯
Character Part	বিশেষ ভূমিকা, (শ্রেষ্ঠ প্রকৃতির)	৫৪
Chief Recording Engineer	প্রধান ধ্বনিধর যন্ত্রী	৬৩
Church Film	ধর্ম্ম চিত্র	৭০
Cine	চলৎ	১০
Cinema } Cinematograph }	চলচ্চিত্র	১, ২৫, ১৪২
Cine-Classic	শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র	৭০
Cine-Drama	নাট্য চলচ্চিত্র	৬৯
Cine Farce	হাস্য-চলচ্চিত্র	৬৯
Cine Fiction	কথা-চলচ্চিত্র	৬৯
Cinema Hall	ছবিঘর	২, ৮
Cinema Sense	চিত্রবোধ	৭৩
Cine-Pœm	কাব্য-চলচ্চিত্র	৬৯
Cine Organisation	চলচ্চিত্র সংগঠন	৭০, ৭১
Circuit		১৩
Circuit Holder	চিত্রমণ্ডলাধিকারী। যাঁদের একখানি ছবি নিয়ে অনেকগুলি ছবিঘরে ঘুরিয়ে দেখাবার সুযোগ আছে।	১৩
Climax	চরমোৎকর্ষ,	৮৯, ১০৩
Close up	সন্নিধ চিত্র	৩১, ৬৬, ৯০, ১৪৬
Coloured Film	রঙ্গীন চলচ্ছবি	২৩
Comic Film	রসচিত্র	৬৯
Composition	সংযুতি, দৃশ্যরচন	৩৭
Composite Shot	একাধিক সংযুক্ত চিত্র	৯৪
Continuity	যোগশৃঙ্খলা, পারম্পর্য্য	৮৫, ১৪৪
Contract	চুক্তিপত্র	৪৭
Contrast	বৈসাদৃশ্য	৪৫
Conventional Shot	সাধারণ চিত্র	১৪৫
Conversation	আলাপ	৮৫

Dynamic Symmetry	গতিক সাম্য	৪১
Edit	সম্পাদন	৬৮, ১৪৫
Editing	সম্পাদনা	৩৪, ৭১, ১৪৪
Electric Waves	তড়িৎ তরঙ্গ	৬৫
Electro Magnetic	তাড়িত চৌম্বুক	১৩৭
Enlargement	বিবর্দ্ধন	৪০
Entrance	আগম	১৪৫
Epic Film	মহতী চিত্র	৭০
Exciting Lamp	উত্তেজক দীপ	৬৫
Exit	নির্গম	১৪৫
Exposure	ছায়াগ্রাহ	১২৪
Exposed Film	ছায়াগ্রাহিত-পত্রী	১২৪
Expressionism	অনুভাবন পদ্ধতি	৩৪
Exterior Scenes	বহির্দৃশ্য, সদর	৩৯, ১৪৫, ১১৮
Extra	ফালতো, নগণ্যলোক	১০৫, ১১৪
Eeybrow Pencil	ভ্রূ-লেখনী	৫৩
Fade in	বিকাশ	৮, ২৭, ৯৪
Fade out	বিলোপ, অন্তর্দ্ধান	২৭, ৯৫
Fantasy Film	উপচিত্র	৭০
Feature Film	বৈশিষ্ট্যময় চিত্র	১০
Film	ছায়াপত্রী, চিত্র	৬, ২২, ২৪,
Film Censor	চলচ্চিত্র শাসক	১৯, ২০
Film Magazine	পত্রী-কৌটা	২৭
Film Record	চিত্রলেখ	৬৭
Film Right	ছায়াস্বত্ব	৩২
Filmstar	চিত্র চূড়ামণি	১২
Filters	বর্ণশোধক	১৩৮
Fire-Proof	দহন-বিমুখ, অগ্নি-সহ	২৩
Fire-proof Film	অদাহ্য পত্রী	২৩
Fixing Bath	সংলগ্নক দ্রব, আবদ্ধিকাপ্রলেপ	১৩৯
Flat	দৃশ্যাংশ বিশেষ, বিশেষত্ববিহীন, পান্‌সে	১৪৩
Flash Light	চমক দীপ	১১৭
Flash Shot	চমক-চিত্র	৯৪
Focus	ছায়া-সন্ধান, চিত্রলক্ষ্য	২৭, ৯৪, ১১৫
Fore Ground	পুরোভূমি	৪৫, ৯০
Front Light	সামনের আলো, পুরোদীপ	১৪৩, ৪৯
Frame	বেষ্টনী, বন্ধনী, বিশেষ আকার, ছক্, ঘর,	৪০, ১৩০
Futurist Art	উত্তরকলা পদ্ধতি	৩৪
Gauze Matte	সচ্ছ সূক্ষ্ম জালি কাপড়	৪৮, ৯৬
Glass Shot	শিশ্‌পট, আয়না চিত্র	৯৪
Gramophone	স্বরলেখন যন্ত্র, বাণীবীণা	৬০, ৬৫
Grand Title	মূল পরিচয়	৭২, ৯৬
Grease paint	তেলা রং	৫৩
Hard light	চড়া আলো	৪৮, ১৪৩
Harmony	সৌসাম্য	৪১
Hazy	আব্‌ছা, অস্পষ্ট	৪-
High-light make up	তীব্রালোকসজ্জা	৫৫, ৫৬
Horizontal line	শায়িত রেখা, লম্বালম্বি	৪১

Mechanical Engineer	যন্ত্রশিল্পী	২৮
Medium Close-up	মধ্যম সন্নিধচিত্র	৯০
Medium long shot	মধ্যম দূরব্যাপক চিত্র	৯০
Medium Mid Shot	মধ্যম অর্দ্ধাংশব্যাপক চিত্র	৯০
Medium Shot	মধ্যম ব্যাপক চিত্র	৯০
Midshot	অর্দ্ধাংশব্যাপক চিত্র	৬৬, ৭১, ৯০
Mercury-Vapor Lamp	পারদ বাষ্পবর্ত্তিকা	১৩১
Merge	মজ্জন	৬০—৬৮
Merged	মজ্জিত	” ”
Merger	মজ্জনক	” ”
Merging	ডোবানো	” ”
Middle Ground	মধ্যভূমি	৪৫
Microphone	অণুশ্রুতি যন্ত্র	৬৪, ৬৬
Mike	মাইক্রোফোন	৬৪
Minor Climax	মধ্যমোৎকর্ষ	৮৯
Mix,	মিশ্রণ	৯৪
Mixer	স্বর সমন্বয়ক	৬৪, ৬৭
Mixing	স্বর সমন্বয়ন	৬৭
Mix Shot	বিলয়ন চিত্র	৯৪
Model	আদ্‌রা	১২৯—৩২
Montage	প্রযুতি	৭০
Motion Picture	গতিচিত্র	১—৫
Movie	চলচ্ছবি	১—৫
Movie Star	চলচ্চিত্র চূড়ামণি	৪, ৩২
Multicolor	বহুবর্ণ	১৩৯
Multiple Exposure	বহুপাতন চিত্র	২৮
Music	সঙ্গীত	৮৯
Negative Plate	বিষম ছায়াফলক	২২, ২৬
Negative Film	বিষম ছায়াপত্রী	২২, ২৩, ১৩৯
Net	জাল	৪৮
News Film	সংবাদ চিত্র	২৩
News Reel	সংবাদ চিত্র-পত্রী	৬৩
Nickelodion	আনি-ছবিঘর	৯
Noiseless	নীরব	২৬
Non-flamable	অদাহ্য	২৩
Non-flexible	অনমনীয়	৫৮
Nosepaste	প্রসাধনপঙ্ক	৫৬, ৫৭
Operator	চিত্রক্ষেপক	২, ৮
Optic	দৃক্	১৩৮
Orthocromatic	বর্ণভেদক	৫২
Outline	আকৃতিরেখা	৪৫, ১৩০
Over Exposure	অতিগ্রাহ	৫২
Pallophotophone	চিত্রবাণী চক্র, স্বরচিত্রচক্র	৬২
Panchromatic Film	সার্ব্ববর্ণিক পত্রী	২৩, ৫২, ১৩৫
Panchromatic Make-up	সর্ব্ববর্ণাত্মক রূপসজ্জা	৫২
Panoram, (Pan)	পরিবীক্ষণ	৯৫
Panoram down	নিম্ন পরিবীক্ষণ	৯৫
Panoram left	বাম পরিবীক্ষণ	৯৫

Reel	নাটাই,	৩, ৮, ১২৬
Recording	শব্দ লেখন	৬৩
Re-recording	পুনর্শব্দ লেখন	৬৪, ৬৮
Recording Machine	শব্দ লেখন যন্ত্র	৬৩
Recording Superviser	শব্দ লেখ পরিদর্শক	৬৩
Recordist	ধ্বনিধর	৬৩
Reflection Shot	প্রতিবিম্ব চিত্র	৯৪
Reflector	প্রতিফলক	৪৯
Reflex	প্রতিক্ষেপক	২৩—২৯, ১৪৫
Register	ক্রমানুপাত	১৩০
Regulate	নিয়ন্ত্রণ	৬৭
Release	মুক্তি	৬৭
Reproducer	পুনর্ণাদক	৬৫
Reproduction	পুনর্নাদন	৬৫
Resound	অনুনাদ	৬৫
Rocking Scene	দোলন-দৃশ্যাভিনয়	৯৫
Rocking Set	দোলন-দৃশ্যপট	৯৫
Rocking Shot	দোলন চিত্র	৯৫
Rouge	লালিমা	৫৯
Roundness	ঘের, গড়নের পূর্ণতা	৪৩, ৪৬
Safety Film	অগ্নিসহ পত্রী	২৩
Scenario	চিত্রনাটা, চিত্রগাথা	২, ৩৪, ৭৩, ৮৪ ৯৫,
Scenario Plan	চিত্রনাট্যের নক্সা	৭১, ৮৯,
Scene	দৃশ্যাভিনয়	৯৫,
Script Clerk	চিত্রগুপ্ত	১৪৫
Scoring	স্বরনিবেশ	৬৭
Scientific Film	বৈজ্ঞানিক চিত্র	৭০, ১৪৫
Sensitive	আগ্রাহী	৬৪
Sensitometry	আগ্রাহিতা নিরূপণ	৬৪
Sequences	ক্রম, ধারা,	৯৫, ১৪৬
Set	দৃশ্যপট, অভিনয় মণ্ডপ	৩৮, ৬৬, ৮৯, ১১৭
Setting	দৃশ্যসংস্থাপন	৮৯
Sex Appeal	যৌন আবেদন	৩৩
Sexy	কামোদ্দীপক	৩৩
Shot	চিত্র	৮৯, ৯০
Shooting	চিত্রগ্রাহ, ছবি তোলা	৭১, ৯৬, ১৪৩
Shooting Hall	চিত্র চত্বর	১১৮
Shooting Script	চিত্র কোষ্ঠী, ব্যাখ্যান গ্রাহ	৭১, ৮৯, ৯৬, ১৪৫
Shooting Plan		
Shade Light	আলোছায়া	৩৭
Shutter	রোধক, অর্গলিকা	২৬, ১৪২
Silent Picture	মৌনচিত্র	২০
Situation	পরিস্থিতি, ঘটনা সমাবেশ	২৬, ৮৬
Silhouette	ছায়ালেখ্য	৪৫, ৪৬, ৯৭
Side Light	পাশের আলো	১৪৩
Slow Shot	মন্থর চিত্রগ্রাহ	৯৬,
Slow Motion Picture	মন্থর চলচ্চিত্র	২৬,
Smoked pape	ভূসো কাগজ	৬০

Tachometer	গতিবেগ নিরূপণ যন্ত্র	২৮
Talkie	মুখর চিত্র	১৯, ২৬, ৬৬
Ta'kie Film	সবাক্ চিত্রপত্রী	১৯, ৬৫
Taking	ছবি তোলা	৭১, ৯৬
Technicolor	বর্ণকলা	১৩৮
Technichian	কলা কুশলী	১১৭
Technique	কলাকৌশল	১:৭
Technical Director	কলা-কৌশল পরিচালক, কলানায়ক	১১৭
Telephone	দূঃস্বরা, দূরালাপী	৬১
Telephotography	দূরালোকচিত্র	৬২
Telivision	দূরাবলোকন, দূরদৃশ্য	২০,
Tempo	সঙ্গতি,	৪, ৮৫, ১১৪
Theme	প্রতিপাদ্য বিষয়	৮৮
Theatregraph	অভিনয়চিত্র	১
Throw	প্রক্ষেপ দূরত্ব	"
Tilting Camera	সর্ব্বতোমুখী বা ঘূর্ণী ছায়াধর	১৪৪
Titles	পরিচয়	৮, ৪৭, ৭২, ৯৬, ১৪৫
Tinting & Toning	রঞ্জন	১৪৬
Tooth Enamel	দন্তরঞ্জিনী	৫৯
Topical	সাময়িক,	২৯,
Topical Budget	চল্‌তি খবর	২৯,
Transposition	বিপর্য্যয়	৩০
Trpod	ত্রিপদ	৩০
Transmitter	প্রেরণীযন্ত্র	৬৪
Treatment	সংগঠন, ব্যবহার .	৮৮, ৯৫, ৯২
Truck Shot	অনুধাবন চিত্র	৭১, ৯৬,
Two element Vacuum Tube	দ্বৈতপ্রকৃতি নির্বায়ু নল	৬১
Type	বিশেষ প্রকৃতি	৫৪, ৫৬
Type part	বিশেষ ভূমিকা (নিকৃষ্ট প্রকৃতির)	৫৪, ৫৬
Unexposed Film	অগ্রাহিত পত্রী	২৪২
Under Exposure	ঊনগ্রাহ	৪৯
Universal Appeal	সার্ব্বজনীন আবেদন	৮৭
Unconventional Shot	বিশেষ চিত্র	৮৭
Vacuum Globe	নিবাত গোলক	৬১
Variable Density Recording	ধ্বনির বিভিন্ন-ঘনত্বের অনুপাতে শব্দ লেখন	৬৫
Variable Area Recording	ধ্বনির বিভিন্ন প্রসারানুপাতে শব্দ লেখন	৬৫
Variation	পার্থক্য	৬৭
Vertical line	ঋজুরেখা	৪১
Vignetting	প্রান্তবিলয়ন	২৮, ৯৬,
Vignette Shot	প্রান্তবিলোপী চিত্র	৯৬
Visual Image	দৃক্‌প্রতিরূপ	৯৬
Vitascope	জীববীক্ষণ যন্ত্র	৭
Voice Current	স্বর প্রবাহ	৬৩
Watt	তাড়িতাঙ্ক	৬২
Wave Length	তরঙ্গবাহ	১৩৭
Wavy Lines	কম্পন রেখা	৬০
X'ray	রঞ্জন রশ্মি	১৫৫